এই উপন্যাসের ভিত্তিতে ইতিহাস, বিস্তারের কল্পনা।

—লেখক

রচনা কাল—১৩৬৬, আশ্বিন

দাম : চার টাকা

ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও মহাবাণী প্রেস, ১৫৬, তারক প্রামাণিক রোড কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীগৌর চন্দ্র ভুক্ত কর্তৃক মুদ্রিত।

এখনকার মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, মানভূম, সিংভূম প্রভৃতি জেলাকে এককালে বলা হ'ত জংগল মহল। ইংরেজ শাসনের সুরুতেও এই জংগল-মহল ছিল একটি পৃথক জেলা। দুর্গম অরণ্যই ছিল এর বৈশিষ্ট্য। আর ছিল অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু ও চরম দারিদ্র্য। সৌখীন মুসলমান শাসকেরা তাই এই অঞ্চলে পদার্পণ করার চেষ্টা করেনি। যার জন্যে মুসলমান সভ্যতাও কখনো স্পর্শ করেনি একে। কতকগুলি অর্ধস্বাধীন রাজ্য নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছিল বহুদিন পর্যন্ত। ইতিহাস এদেরও রয়েছে—কিন্তু সে ইতিহাস ঠিকভাবে রচিত হয়নি এখনো। তবু তারই এক টুক্‌রোকে নিয়ে আমার এই উপন্যাস রচনার প্রয়াস। সার্থকতার বিচারের ভার পাঠকের ওপর।

শ্রীপারাবত

এই লেখকের

আমি সিরাজের বেগম

অকৃত্রিম সুহৃদ

কৃষ্ণধর

কবিবরেষু—

কিতাগড়ের আবহাওয়া থমথমে।

রাজা হেমৎ সিং ভুঁইয়ার অবস্থা সংকটজনক।

গড়ের যে-প্রকোষ্ঠে শুয়ে রয়েছেন তিনি, তারই দরজায় সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান সতেরখানি তরফের চার-সর্দার। প্রিয় রাজার জন্যে তারা উদ্বেগাকুল।

ঘরের মধ্যে রাজা ছাড়া রয়েছেন মাত্র তুটি প্রাণী। শয্যার ওপর উপবিষ্ট তাঁর স্ত্রী—সতেরখানি তরফের রাণী। আর রয়েছেন বৃদ্ধ বৈদ্য রাজু পাঁওলিয়া। সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী তিনি—সবাই জানে সেকথা। তিনি যদি অভয় দেন, চোয়াড়-সর্দাররা নিশ্চিন্ত মনে ফিরে যেতে পারে আপন আপন কাজে। কিন্তু উঁকি দিয়ে দেখেছে তারা, তাঁর মুখও গম্ভীর—বিষণ্ণ। রাণী সে মুখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন। তাতে আশ্বাসের কোন চিহ্ন খুঁজে না পেয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে সুরু করেছেন। সর্দারদের চওড়া বুক কয়টি কেঁপে উঠছে কান্নার আওয়াজ শুনে।

তবু ক্ষীণ আশা রয়েছে এখনো। রাজু পাঁওলিয়া তাঁর মুখ খোলেন নি। কোনরকম মন্তব্য এ-পর্যন্ত করেননি তিনি। কান্নার মধ্যেও রাণীর দৃষ্টি তাই নিষ্পলক। সর্দাররাও তাই বাইরে দাঁড়িয়ে এখনো।

বৈদ্য যদি শুধু বলেন,—চেষ্টা করব, তাহলেও বুকে পাওয়া যায় অসীম বল। এই কথাটুকু শুনলেও রাণীর মুখে হাসি দেখা দেবে।

বাইরে সূর্য ডুবছে। কিছুক্ষণ পরেই শ্রীশ্রীকালাচাঁদ জিউর মন্দিরের ঘণ্টা বেজে উঠবে কিশোর পুরোহিতের বলিষ্ঠ হাতে। বৃদ্ধ পুরোহিত নরহরি বাবাজী বরাহভূমের রাজদরবারে গিয়েছেন পনেরো দিন আগে। মন্দিরের পুজোর ভার তাই গোবিন্দর ওপর। সুষ্ঠুভাবে সে-কাজ করে চলেছে গোবিন্দ।

পাশেই কিতাডুংরি পাহাড়ের ওপর কিতাপাটের পীঠস্থান। সেখান

থেকে ভেসে আসছে 'টামাক' আর 'পেপড়েৎ'-এর আওয়াজ। সেখানেও পূজো হয় প্রতিদিন। শ্রাবণে সেখানে হয় উৎসব। রাজা নিজে গিয়ে পূজো দেন সেদিন।

সর্দাররা ভাবে, কালও এমনি সূর্য ডুববে—মন্দিরে মন্দিরে ঘণ্টা বেজে উঠবে—সবই হবে। অথচ তাদের প্রিয় রাজা হয়ত থাকবেন না তাদের মধ্যে। ভাবতে গিয়ে তারা চমকে ওঠে। এ যে অকল্পনীয়! কে নেবে তাদের ভার—সমস্ত সতেরখানি তরফের ভার? ত্রিভনসিং? সে তো বলতে গেলে কিশোর। তাছাড়া রাজোচিত কোন গুণও এপর্যন্ত তার মধ্যে দেখতে পায়নি কেউ। সে কেবল বাঁশী বাজায়। দৃঢ়হস্তে সমস্যাসংকুল এই তরফকে বাঁচিয়ে নিয়ে চলার ক্ষমতা তার নেই।

সর্দারদের চিন্তাধারা একই খাদে প্রবাহিত হচ্ছিল। তাই একই সময়ে সবাই পরস্পরের মুখের দিকে চায়। সে মুখে নেই কোন আশার আলো।

ঘরের ভেতরে শব্দ হয়।

বৈদ্য রাজু পাঁওলিয়া পালংক থেকে নেমেছেন। সর্দাররা নড়েচড়ে ওঠে।

দরজার দিকে এগিয়ে আসেন বৈদ্য। রাণী তাঁর পেছনে পেছনে পাগলের মত দুচার পা ছুটে আসেন। শেষে ভূলুণ্ঠিত হন। জবাব পেয়ে গিয়েছেন তিনি। বৈদ্যের শুষ্ক মুখের প্রতিটি রেখায় লেখা রয়েছে সেই নিষ্করুণ জবাব।

চোয়াড়ি সর্দারেরা চঞ্চল হয়ে ওঠে। সর্দার সারিমুর্মু এগিয়ে যায় বৈদ্যের দিকে।

রাজু পাঁওলিয়া কিছুক্ষণ স্থিরভাবে চেয়ে থাকেন সারিমুর্মুর মুখের দিকে। শেষে ধীরে ধীরে স্পষ্ট উচ্চারণ করেন,—অহই বাঞ্চাওলেনা।

কেঁপে ওঠে সবাই। জানত তারা। তবু এমন নির্মম ভাবে শোনার জন্যে প্রস্তুত ছিলনা কেউ। মাথায় করাঘাত করে তারা। সর্দার ডুইঃটুডু কেঁদে ফেলে। সতেরখানি তরফের বলিষ্ঠতম কালো কুচকুচে চারটে বুক হাপরের মত ওঠানামা করে। বাঘের সংগে লড়াই-করা বুকে অনুভব করে শিশুর অসহায়তা। অজগর সাপের গলা-টিপে-ধরা পেশী-বহুল হাতগুলো শরীরের দুপাশে ঝুলে পড়ে নিঃশ্বাস-রুদ্ধ মৃত অজগরের মত।

বহুক্ষণ শব্দ হয়না কোন, হৃদ্‌স্পন্দনও যেন থেমে গিয়েছে সবার। শেষে সর্দার বুধকিস্‌কু অস্ফুটস্বরে বলে ওঠে,—মারাংবুরু।

সবারই মনে হয়েছে সেকথা। মারাংবুরু। কিন্তু বলতে সাহস পায়নি কেউ। বুধকিস্‌কু বলেছে বটে, তবে কেমন ভাঙা ভাঙা। কাউকে শোনাবার উদ্দেশ্যে বলেনি সে। নিজের ভারাক্রান্ত মনের চিন্তা সহসা কথায় রূপ পেয়েছে মাত্র। বলে ফেলেই সে ভয় পেয়ে যায়।

সবাই শুনল। মারাংবুরু। চোখে চোখে চকিতে দৃষ্টি বিনিময় হল। সবগুলি চোখেই সমর্থন।

সাহস পেয়ে সারিমুর্মু বলে,—মারাংবুরুর অভিশাপ।

চোয়াড় সর্দাররা চঞ্চল হয়। তাদের খোদাই করা হাতগুলো বুকের ওপর ভাঁজ হয়ে পড়ে।

ভয়ংকর দেবতা মারাংবুরু। খাঁড়ি পাহাড়িতে আস্তানা তাঁর। তাঁকে ভয় না ক'রে, সমীহ না ক'রে উপায় নেই।

রাজা হেমৎসিংও তাঁকে অবহেলা করেন নি কখনো। তবু গতকাল তিনি হঠাৎ ভুল করে বসলেন।

খাঁড়ি পাহাড়ির ওপরে মন্দির প্রতিষ্ঠার বাসনা হয়েছিল তাঁর। ভুঁইয়া বংশের প্রথম রাজা খাঁড়ে পাথরের নামে এই পাহাড়। তাই রাজার বাসনা অস্বাভাবিক নয়। পাহাড়ের ওপরে স্থান নির্বাচনের জন্যে সর্দারদেরও সংগে নিলেন তিনি। যাবার পথে মারাংবুরুর আস্তানা। সেখানে রক্তস্রোত দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন রাজা। অসংখ্য কুকুর বলি দেওয়া হয়েছে দেবতার সন্তুষ্টির জন্যে। চঞ্চল হয়ে ওঠেন রাজা। অথচ এ-সমস্ত তাঁর অজানা নয়। দিকুরা প্রায়ই এসে এমন বলি দিয়ে যায়। আগে তিনি নিজেও দাঁড়িয়ে থেকে কতবার এসব দেখেছেন। কিন্তু কিছুদিন থেকে তাঁর ভেতরে একটা পরিবর্তন দেখা দিচ্ছিল, রক্ত সহ্য করতে পারছিলেন না। মাংস খাওয়াও ছেড়ে দিয়েছিলেন।

সর্দাররা জানত, সবই নরহরি বাবাজীর প্রভাব। ভাল লাগেনি তাদের। রাজা বৈষ্ণব আছেন—থাকুন! কিন্তু বাড়াবাড়ি হলে রাজ্য চালানো মুশকিল। নদের মানুষ নরহরি বাবাজী শাকপাতা খেয়েও জীবন কাটাতে পারেন। কিন্তু জংগল মহলের এক তরফের রাজা হয়ে

হেমৎ সিং ভুঁইয়ার পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। তাতে তরফেরই অমংগল ডেকে আনে।

মুখে অবশ্য তারা কিছুই বলেনি। রাজাকে তারা ভালবাসে। রাজা যে তাদের প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন।

স্কন্ধচ্যুত কুকুরের দেহগুলো অতিক্রম করে রাজা পূজারীর সামনে গিয়ে বলেছিলেন—অনর্থক এত রক্তপাত কেন?

—অনর্থক? এই তো সার্থক। ফুল দিয়ে পূজো হয় গংগার পলি-মাটিতে, জংগল মহলের পাথুরে মাটির ওপর নয়। এখানে ফুল রাখার সংগে সংগেই উত্তাপে কুঁকড়ে শুকিয়ে যাবে। তাই রক্তের প্রয়োজন।

রাজার চোখ দুটো নিমেষের তরে জ্বলে উঠেছিল। এমন উদ্ধত জবাব তিনি প্রত্যাশা করেননি। তিনি জানতেন না যে মারাংবুরুর পূজারী মংগল হেম্বরম্ বহুদিন থেকেই চটে আছেন তাঁর ওপর, আর তাঁর কুল-দেবতা কালাচাঁদ জিউর ওপর।

—তবু আমি বলছি এই রক্তপাত যাতে কম হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।

—সম্ভব নয়। মারাংবুরু স্বপ্নে কাকে কি আদেশ দেন, আমি তা কি করে জানব? রক্তের তৃষ্ণা যদি জাগে তাঁর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তা ঠেকাতে পারবে না।

—তাহ'লে আমাকেই হস্তক্ষেপ করতে হবে।

—আপনি? বন্ধ করবেন?

—হ্যাঁ।

ঠিক সেই সময় বিকট শব্দে একটা কুকুর ডেকে ওঠে মারাংবুরুর গুহার ভেতর থেকে।

—শুনলেন? ও চেষ্টা করবেন না। সর্বনাশ হবে আপনার। মংগল হেম্বরম্ হো হো করে হেসে ওঠে! রাজার হুকুম যেন ছেলেমানুষের আবদার।

—হোক্। বলি বন্ধ করতেই হবে।

—চেষ্টা করুন। হেম্বরমের কথায় বিদ্রূপের খোঁচা।

রাজা খাঁড়ি পাহাড়িতে ওঠেন। সর্দারদের বুক দুরুদুরু করছিল। সাংঘাতিক লোক এই মংগল হেম্বরম্। রাজা তাঁকে এমনভাবে না বললেই

ভাল করতেন। অনেক দিকু এই পূজারীকেই সাক্ষাৎ মারাংবুরু বলে ভাবে। বলির সংগে সংগে যেভাবে তিনি কুকুরের রক্ত পান করেন তাতে না ভেবে উপায়ও নেই। আগুনে সেদ্ধ করে কুকুরের মাংস সবাই খায়। কিন্তু কাঁচা মাংস চামড়া সমেত কামড়ে ধরার কথা ভাবা যায় না। পূজারী আর এই দেবতার পক্ষেই তা সম্ভব।

এই সব অমংগল চিন্তায় সর্দারদের বুক যখন কাঁপছিল, ঠিক তখনি ঘটল দুর্ঘটনা। পাহাড়ে ওঠার পথে একটা বড় পাথর গড়িয়ে পড়ল রাজার মাথার ওপর। মুখ থুবড়ে পড়ে যান তিনি। ধরাধরি করে তাঁকে কিতাগড়ে নিয়ে এল সর্দাররা। সেই থেকে তিনি অজ্ঞান।

রাজু পাঁওলিয়া শেষ জবাব দিয়ে গেলেন—অহ্ই বাঞ্চাওলেনা—রাজা বাঁচবেন না।

রাণী ভূলুণ্ঠিত—অচৈতন্য। শয্যার ওপর রাজা শায়িত।

সারিমুর্মু ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় ঘরের ভেতরে। পেছনে যায় বুধকিস্কু, ডুইঃ টুডু আর বাঘরায় সোরেণ। এ-সময়ে লজ্জা সরমের কথা ভাবতে গেলে চলে না। রাণীর মর্যাদার অবমাননা তারা করছে না। শেষ সময়ে রাজার পাশে দাঁড়াতেই হবে তরফের সর্দারদের। সেটাই নিয়ম।

হেমৎ সিং-এর শিয়রের কাছে এসে দাঁড়ায় তারা। প্রদীপ নিভু নিভু। তবু যদি শেষ মুহূর্তে একবার দপ করে জ্বলে ওঠে। অন্তিম বাসনা যদি কিছু থেকে থাকে রাজার।

ত্রিভন কোথায়? যুবরাজ ত্রিভন সিং? এতক্ষণে সর্দারদের মনে পড়ে যায় তার কথা। এই সময়েও কি সে বসে রয়েছে কোন শালবনের নীচে অথবা নির্জন কোন ঝরণার ধারে! এখনো কি সে তন্ময় হয়ে বাঁশী বাজিয়ে চলেছে? বাবার এ-অবস্থা দেখেও কেমন করে অনুপস্থিত থাকতে পারে সে, ভেবে পায় না কেউ। বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে অতগুলো মন—সতেরখানি তরফের মাথা। চিন্তায় কপাল কুঁচকে ওঠে তাদের।

অন্য তিন তরফ সতেরখানিকে এবারে অনেক পেছনে ফেলে যাবে। এগিয়ে যাবে পাঁচ সর্দারী—তিনসওয়া—ধাদকা। বরাহভূমের রাজদরবার

থেকে সতেরখানির রাজার কাছে আসবে না আর মর্যাদার আমন্ত্রণ। বিপদের সময়ে এ-রাজ্যের গুরুত্ব আর বুঝবেন না বরাহভূমের মহারাজা। পঞ্চ খুঁটের সভার এক খুঁট অনাদৃতই থেকে যাবে। জংগল মহলের ভাগ্যবিধাতা এবার থেকে এক খুঁটকে বাদ দিয়ে চার খুঁট। রাজধানী বাটালুকা গ্রাম এখন থেকে শালবনের অন্ধকারে পচে পচে মরবে। মরবে কিতাগড়—আর প্রজারা। সতেরখানির রাজার হাতে আর শোভা পাবে না তারওয়াড়ী—কাপি—আঃ—ফিরি। বাঁশী—বাঁশী থাকবে রাজার হাতে। কর্মের অভাবে প্রজাদের পেশী যাবে ঢিলে হয়ে। উদ্দীপনা আর বীরত্বের অভাবে তাদের বুক যাবে ধ্বসে। বহিঃশত্রুর আক্রমণে পাহাড়ে পাহাড়ে আগুণ জ্বলবে—আর রাজা বাঁশী বাজিয়ে পাখীদের মন ভোলাবেন। চার সর্দার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে—বাঁশী-ওয়ালাকে রাজা করবে না তারা।

প্রদীপ সত্যিই জ্বলে উঠল শেষ বারের মত। সর্দাররা এক সাথে ঝুঁকে পড়ে শয্যার ওপর। রাজা চোখ মেলেন। কাকে যেন খোঁজেন তিনি।

রাণীর তখনো মূর্ছা ভাঙেনি।

—কাকে চান রাজা? আমরা সবাই আছি। কিছু বলবেন? ডুইঃ টুডুর গলার স্বর কেঁপে ওঠে। সে-ই সর্বকনিষ্ঠ সর্দার। বাঘরায় সোরেণ তার চেয়ে সামান্য বড়।

—ত্রিভু—। রাজা অনেক কষ্টে উচ্চারণ করেন।

সর্দাররা চুপ।

—নেই? বাঁশী বাজায়? রাজার মুখের ওপর অপূর্ব স্নেহের হাসি চকিতে খেলে গিয়ে আবার মিলিয়ে যায়।

—যুবরাজ ছেলেমানুষ রাজা। সর্দাররা সাহস পায় রাজার হাসি দেখে।

একটু চুপ করে থাকেন রাজা। বোঝা যায় শক্তি সঞ্চয় করছেন তিনি। শেষে বলেন—ওকেই রাজা করবে?

—আপনার হুকুম! সর্দারদের প্রতিজ্ঞা যেন জ্বলে ওঠে এর মধ্যেই।

—না। তোমাদের পছন্দ। রাজার ছেলে হলেই রাজা হওয়া যায় না।

যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে থেমে যান রাজা। চোখ বন্ধ করেন তিনি। প্রদীপ বোধ হয় এবারে নিভবে। সর্দাররা নির্বাক। নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তারা। রাণীর দেহ তখনও নিশ্চল।

কালাচাঁদ জিউএর মন্দিরের ঘণ্টা এইমাত্র থামল। সমস্ত বাটালুকা গ্রাম জুড়ে নেমে এসেছে অন্ধকার। শালবনের ছায়ায় সে অন্ধকার আরও গাঢ়—আরও ভয়ংকর। সেই অন্ধকারকে সামান্য আলোকিত করে তুলতে অসংখ্য বাকৃজুমু ব্যর্থ প্রয়াসে ঘুরে ঘুরে মরছে। ঘরের ভেতরে বাতি এনে রেখে যায় একজন দাসী। সেই আলোতে চার সর্দারের দীর্ঘ ছায়া পড়ে পেছনের দেয়ালে।

রাজা আবার চোখ মেলেন। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয় তাঁর। তবু কি যেন বলতে চান।

—আপনি কথা বলবেন না রাজা। কষ্ট হবে। সারিমুর্ বলে।

—একটু! ত্রিভুকে গড়ে তোলো। ঠকবে না।

—আমরা জানি রাজা। আপনার রক্ত তার শরীরে। তাই হবে—তাই হবে। বুধ কিস্‌কু ব্যস্ত হয়ে বলে।

—সব শরীরেই এক রক্ত বুধ। মানুষের রক্ত।

—এবারে চুপ করুন রাজা। বাঘরায় সোরেণ এতক্ষণে মুখ খোলে। সে সভয়ে চেয়ে দেখে রাজার মাথার একপাশ দিয়ে নতুন রক্ত গড়িয়ে পড়ছে—তাজা টাটকা রক্ত। মারাংবুরুর ঠাঁই-এর দৃশ্য তার মনে পড়ে। এমন রক্ত সেখানে দেখেছিল সে।

স্নুবর্ণরেখা নদীর তীরে দাহকার্য সমাপ্ত হল। ত্রিভনসিংহ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে তারই অতি পরিচিত মানুষটি ধীরে ধীরে কেমন ভস্মীভূত হয়ে যায়। তার একমাত্র বন্ধু আর পৃথিবীতে নেই। তার একাকীত্বের একমাত্র সাথী ছিলেন রাজা হেমৎ সিং। পুত্রের মন একা তিনিই চিনতেন। আর সবাই তার বিরুদ্ধে—পছন্দ করে'না কেউ। এমন কি তার নিজের মাকেও ফেলা যায় সে দলে। নিজের ছেলেকে কখনো কাছে ডাকেন নি তিনি—কোনদিন দুটো মিষ্টি কথাও বলেন নি ভুলে।

শুধু ধর্ম—নরহরি দাস আর কালাচাঁদ জিউ। পৃথিবীর সংগে আর কোন সম্পর্ক নেই তাঁর। শেষের দিকে অবশ্য রাজাকে পছন্দ করতে সুরু করেছিলেন। কারণ রাজাও তাঁরই মত খাঁটি বৈষ্ণব হয়ে উঠেছিলেন। মায়ের কথা ভেবে চোখে জল আসে ত্রিভনের। অন্যের মায়েদেরও তো সে দেখে।

সর্দারদের মনেও স্থান নেই ত্রিভনের। তারা বলে সে নাকি ভুঁইয়া বংশের কলংক। তারা চায় তাদের সংগে ঘুরে ঘুরে সে-ও শিকার করুক, তীর ধনুক ছুঁড়ুক। বনে জংগলে সে ঘোরে, সর্দারদের চেয়ে বেশীই ঘোরে। তবে একা একা। আর তীর ধনুকে সে যে কতখানি সিদ্ধহস্ত সে-খবর রাখতেন শুধু তার বাবা। কিতাডুংরি পাহাড়ে কিতাপাটের মন্দিরের পাশে দাঁড়িয়ে রাজা হেমৎসিং-এর কাছে বহুবার সে পরীক্ষা দিয়েছে। প্রতিবারই বিস্মিত হয়েছেন রাজা পুত্রের অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ দেখে। তাই ত্রিভন পাগলের মত বাঁশী নিয়ে ঘুরে বেড়ালেও তিনি বলতেন না কিছু। হাসতেন।

চিতাভস্ম থেকে রাজার অস্থি সংগ্রহ করে অনুষ্ঠান সৎকারে রাখা হয় রাজ পরিবারের অস্থিশালায়। বিরাট এক পাথর চাপানো হয় তার ওপর। সতেরখানি তরফের প্রথম রাজা খাঁড়ে পাথর, তৎপুত্র যুঝার সিং ভুঁইয়া—তাঁরই পাথরের পাশে রাখা হল হেমৎ সিং ভুঁইয়ার অস্থি। ত্রিভন মনে মনে ভাবে, যদি কোনরকম অঘটন না ঘটে তবে এরপর স্থান পাবে তারই অস্থি।

পিতার সমাধির দিকে চেয়ে তন্ময় হয়ে পড়েছিল ত্রিভন। ঠিক সেইসময় একখানা বলিষ্ঠ হাতের স্পর্শ কাঁধের ওপর অনুভব করে সে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখে বৃদ্ধ সর্দার সারিমুর্মু চেয়ে রয়েছে তার দিকে।

—কি সর্দার?

—জরুরী কথা রয়েছে।

—বলুন।

—বাইরে আসতে হবে একটু। অন্য সবাই অপেক্ষা করছে সেখানে।

তিন সর্দার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। ত্রিভন লক্ষ্য করে, রাজার মৃত্যুতে সবাই তারা শোকাহত। অথচ কিসের চিন্তায় যেন অস্থির।

ডুইঃ টুডু ধীরে ধীরে বলে—সতেরখানি তরফের রাজাকে আমরা হারিয়েছি ত্রিভন সিং। সিংহাসন শূন্য। কিন্তু বেশীদিন তো এভাবে ফেলে রাখা যায় না। সমাজের গোলমাল রয়েছে, বাইরের বিপদও আছে। আমরা, সর্দাররা চাই, একজন যোগ্য ব্যক্তি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সিংহাসনে বসে আমাদের নিশ্চিন্ত করুন। রাজার মৃত্যুতে আমরা মর্মাহত। তবু আপনাকে ডাকতে হল শুধু এইজন্যেই।

ডুইঃ খুব সুন্দর ভাবেই কথাগুলো উচ্চারণ করল। অন্যান্য সর্দাররা মনে মনে প্রশংসা না করে পারে না। তারা ভেবে উঠতে পারছিল না, আজকের দিনেই কিভাবে ত্রিভনকে কথাগুলো বলা যায়। ডুইঃ-এর গান-বাঁধা সার্থক। কথার যাদু সত্যিই তার আয়ত্তে।

নিজের অজ্ঞাতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ত্রিভন। শেষে বলে—কি করতে হবে আমাকে?

—পরীক্ষা দিতে হবে আপনাকে। প্রমাণ করতে হবে যে সতেরখানি তরফের রাজা হবার উপযুক্ত আপনি। সারিমুর্মু এবারে পরিষ্কার করে বলে।

—বেশ। পরীক্ষা নিন। আমি প্রস্তুত।

—অত সহজ নয় ত্রিভন সিং। দুমাস সময় দিলাম। আমরাই শিক্ষা দেব এই দুমাস। তবে ওই বাঁশী ছাড়তে হবে আপনাকে।

ত্রিভনের চোখে মুখে দৃঢ়তার ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে বলে—বাঁশী আমি ছাড়ব না। যে পরীক্ষা করতে চান আপনারা এখনি করতে পারেন।

সর্দাররা পরস্পরের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে। রাজা হেমৎ সিং-এর শেষ কথা তাদের কানে বাজে। তাঁর অন্তরের বাসনা ছিল, ত্রিভনই সিংহাসনে বসুক। সর্দাররাও চায় তাই। রাজাকে তারা ভালবাসত। কিন্তু অবাচীন কিশোরের হঠকারিতায় সে সুযোগ বুঝি নষ্ট হয়।

ডুইঃ টুডু সামনে এগিয়ে এসে তর্জনী তুলে বলে—ত্রিভনসিং! খেয়ালের বশে এতদিন চলেছেন। আর তা সম্ভব নয়। আমরা যা বলছি, সেই অনুযায়ী কাজ করুন। খাঁড়ে পাথরের বংশের মর্যাদাই রক্ষিত হবে তাতে।

জ্বলে ওঠে ত্রিভন সিং। কঠোর দৃষ্টিতে সর্দারদের দিকে চেয়ে বলে—

খাঁড়ে পাথরের বংশের মর্যাদা আপনারাই রাখছেন না সর্দার। পরীক্ষার জন্যে তাই দুই মাস সময় দিচ্ছেন। ওপর থেকে একথা শুনে খাঁড়ে পাথর লজ্জায় মুখ ঢাকছেন। মুখ ঢাকছেন সদ্য লোকান্তরিত রাজা হেমৎ সিং। আপনারা তাঁর যোগ্য সর্দার বলে বড়াই করেন? ছি ছি।

চোয়াড় সর্দারদের মুখগুলো হয় পাণ্ডুর। যৌবনের পদপ্রান্তে এগিয়ে আসা এক কিশোর বংশীবাদকের কাছ থেকে এমন কঠিন ভাষা তারা প্রত্যাশা করেনি। মনে হল যেন হেমৎসিং নিজেই সেই কথার চাবুক চালাচ্ছেন তাদের ওপর। এমন কথা বলা কোথায় শিখল ছেলেটা? সে তো চুপ করেই থাকে সারাদিন।

সারিমুর্মু, বুধকিস্কু, বাঘরায় সোরেণ, ডুইঃ টুডু—সবাই চেয়ে থাকে ব্যক্তিত্ব-পূর্ণ এক কচিমুখের দিকে—যে মুখে এতদিন ভাবাবেগ আর তন্ময়তা ছাড়া কিছুই নজরে পড়েনি তাদের।

সূর্য তখন মাথার ওপরে। শালবনের পাতার ফাঁক দিয়ে রশ্মি চুইয়ে বাটালুকা গ্রামের মাটিতে আলোর আলপনা এঁকে দিয়েছে। অদূরে কিতাডুংরি অতীতের বহু ঘটনার মত আজকের ঘটনারও নীরব সাক্ষী।

—আপনারা কি ক্লীব হ'য়ে গেলেন সর্দার? অমন চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন? গ্রামে গ্রামে ঢাউরার ব্যবস্থা করুন। এখনি—এই মুহূর্তে কিতাপাটের মন্দিরের পাশের শালগাছের সবচেয়ে ভাল ডাল কেটে নিয়ে ছয়জন লোক ঘুরে আসুক সতেরখানি তরফের প্রতিটি গ্রামে। ঢাউরা শুনে লোক এসে জড়ো হোক কাল এখানে। তাদের সামনে আমার পরীক্ষা হবে।

সারিমুর্মু মুখ খোলে এবারে। বলে—অত লোকের প্রয়োজন নেই। আমরা তাদের প্রতিনিধি। আমাদের সামনে দিলেই চলবে।

—বেশ। তবে এখনি হোক। বলুন কি করতে হবে।

—আজ আপনি সুস্থ নন। মন খারাপ আপনার। কালকে ব্যবস্থা করলেই চলবে।

—আবার ভুল করলেন সর্দার। মৃত্যুতে যত দুঃখই থাকুক না কেন, সতেরখানির লোকেরা তাতে চঞ্চল হয় না। প্রতি পদে তারা দেখতে পায় মৃত্যুর হাতছানি। বৃদ্ধ হয়েছেন আপনি। তাই এত ভুল। আপনার সংগে যুদ্ধযাত্রা নিরাপদ নয়।

সারিমুর্মু'র মাথা ঝিম্‌ঝিম করে ওঠে। রাগে না লজ্জায় বুঝতে পারেনা সে। এভাবে অপদস্থ হবার কথা স্বপ্নেও ভাবেনি। এতখানি বয়স হল, কেউ কখনো এভাবে বলেনি তাকে। প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে হয় তার। মৃত রাজার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে মনে মনে,—পারলাম না রাজা তোমার আদেশ মানতে। দায়ী তোমার ছেলেই।

একটা ধনুক আর তীর এনে ত্রিভনের সামনে রাখে সারিমুর্মু।

—কি করতে হবে? ত্রিভন প্রশ্ন করে।

—ওই যে মুন্‌গা গাছ দেখছেন, অতদূর আপনার তীর পৌঁছবে কি?

—চেষ্টা করতে পারি।

—যদি পৌঁছোয় তবে গাছের গোড়াটাকে লক্ষ্য করে মারুন।

মুহূর্তের জন্যে ত্রিভন কাপলের ওপর বাঁ হাতখানা আড়াল দিয়ে গাছটাকে লক্ষ্য করে। তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হ'য়ে ওঠে। মুখে ভেসে ওঠে মৃদু হাসির তরংগ। সর্দারদের দিকে চেয়ে সে বলে—গাছের ডালে একটা পোতাম বসে আছে না?

চার-সর্দার চেয়ে থাকে বহুক্ষণ। শেষে দেখতে পায় পোতামটিকে। একমনে ডেকে চলেছে সে।

—কিন্তু ওটাকে তো মারা সম্ভব নয় ত্রিভন সিং। বাঘরায় বলে ওঠে।

—আমি ওটাকেই মেরে দিচ্ছি। নিয়ে এসো তোমরা। গম্ভীর গলায় ত্রিভন কথা বলে। সর্দারদের প্রথম 'তুমি' বলে সম্বোধন করে তীরধনুক হাতে তুলে নেয় সে।

রাগে কেঁপে ওঠে সর্দাররা। বিদ্রূপ করছে হেমৎ সিং-এর পুত্র। মাটির দিকে চেয়ে তারা পাথরের ওপর ঘন ঘন পা ঘসে।

—গেলে না? সতেরখানি তরফের সর্দাররা কি আজকাল নিজেদেরই রাজা বলে ভাবতে সুরু করেছে।

—পোতামকে মারা কখনই সম্ভব নয়। ঠাট্টা করছেন আপনি। ফল পেতে হবে। চীৎকার করে ওঠে বুধ কিস্‌কু।

—চুপ। তর্ক শিখেছে সর্দাররা। এগিয়ে যাও তুমি বুধ কিস্‌কু। হ্যাঁ, তোমাকেই বলছি। নিয়ে এসো মৃত পোতামকে।

দাঁতে দাঁত চেপে মুহূর্তের জন্যে স্থির দৃষ্টিতে চায় বুধ উদ্ধত যুবকের

দিকে। শেষে ছুটে যায় মুন্‌গা গাছের দিকে। সেই সংগে ছোটে ত্রিভনের তীর।

সর্দাররা দেখে ঠিক জায়গাতেই পৌঁছেচে তীর। তবে পাখীটা মরেছে কিনা ঠাহর করতে পারেনা। তবু তারা অবাক হয় ত্রিভনের ধনুকের হাত দেখে।

একটু পরেই তারা দেখে বিহ্বল বুধকিস্‌কুকে—রক্তমাখা পোতাম তার হাতে। ভয়ে কাঁপতে থাকে তারাই। কে এই অদ্ভুত যুবক? এ তো সেই বাঁশীওলা নয়—এর মুখ চোখের কঠোরতা আর ব্যক্তিত্ব যে মৃত রাজাকেও হার মানায়।

—আর কিছু পরীক্ষা করতে চাও?

—আমাদের ক্ষমা করুন রাজা। ডুইঃ টুডু এগিয়ে গিয়ে তার হাতের তারওয়ারী রাজার পায়ের সামনে সমর্পণ করে। বাঘরায় সোরেণ রাখে তার কাপি। সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় সতেরখানির চার-সর্দার।

বাঁ-হাতের আগুনে-পোড়া জাতি-চিহ্ন 'সিকে'র ওপর ডান হাত স্পর্শ করে সারিমুর্মু'র সংগে সংগে তারা সবাই এক সংগে উচ্চারণ করে—আমরা আমাদের 'সিক' স্পর্শ করে ঘোষণা করছি, রাজা হেমৎ সিং ভুইঁয়ার মৃত্যুর পর তাঁর যোগ্যপুত্র ত্রিভন সিং ভুইঁয়াকে সতেরখানি তরফের রাজা নির্বাচিত করা হল। আমরা, সতেরখানি তরফের সমস্ত অধিবাসী, তাঁর প্রতি আজীবন বিশ্বস্ত থাকব।

—সর্দার সারিমুর্মু, বুধকিস্‌কু, ডুইঃ টুডু, বাঘরায় সোরেণ, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, সতেরখানির মর্যাদা আমি প্রাণ দিয়ে রক্ষা করার চেষ্টা করব।

চার সর্দার রাজার সামনে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে।

—তবে একটা কথা সর্দার, বাঁশি আমি বাজাব।

—নিশ্চয়ই বাজাবেন। ডুইঃ টুডু বলে উঠে। সে নিজে গান বাঁধে। শেষ রাতে যে সর্দাররা শিশুর মত কেঁদেছিল সুবর্ণরেখা নদীর তীরে, মধ্যাহ্নের শেষ প্রহরে তারাই আবার প্রাণখোলা হাসি হেসে ওঠে হো হো করে।

কাঁটারাঙ্গা পাহাড়ের উচ্চতা যেখানে সমতলে এসে মিশেছে, সেখানে ছিয়ানব্বই বছরের বৃদ্ধ পারাউ মুর্মু'র কুঁড়েঘর। রাজা খাঁড়ে পাথরের

জীবনের শেষ দুবছর এই বৃদ্ধকে চার তরফের সমস্ত অধিবাসীই চিনত। সে সময়ে খাঁড়ে পাথরের ডান হাত ছিল সর্দার পারাউ মুর্মু। সর্দারের নেতৃত্বে সতেরখানির চোয়াড় বাহিনী সুদূর ধলভূম পর্যন্ত আক্রমণ করে জংগলমহলকে দিয়েছিল এক প্রচণ্ড ঝাঁকুনি। বরাহভূমের রাজা বিবেক-নারায়ণের পিতামহ অনেক চেষ্টা করেছিলেন এই দুর্দান্ত সর্দারকে বশে আনতে—কিন্তু পারেন নি। শেষে তিনি নিজে এসেছিলেন কাঁটারাঙ্গার কোল-ঘেঁষা এই ক্ষুদ্র কুটিরে। সংগে এনেছিলেন বৃদ্ধ খাঁড়ে পাথরকে।

বিস্মিত দৃষ্টিতে সেদিনের যুবক পারাউ কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে, ছুটে গিয়ে দুই রাজার সামনে সাষ্টাংগে প্রণাম করেছিল।

—কি অপরাধ করেছি মহারাজ।

মহারাজের হয়ে রাজা খাঁড়ে পাথর জবাব দিয়েছিলেন—জংগল মহলে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে মহারাজা ব্যাকুল হয়েছেন পারাউ।

—আমাকে উনি ওঁর কাজে লাগাতে চান?

—না। উনি শুধু চান, তুমি শান্ত হও।

—সেকথা আমাকে বলে লাভ কি রাজা? আপনার হুকুমের চাকর আমি। আপনিই ব্যবস্থা করুন।

—তা জানি। কিন্তু শান্তির জন্যে যে উনি কতটা আকুল সে কথা তোমাকে জানাতে চান বলেই তোমার বাড়ীতে আমাকে নিয়ে এসেছেন।

বরাহভূমের মহারাজা দরিদ্র মুর্মুর গৃহস্থালীর খুঁটিনাটি চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন। এত বড় সর্দার অথচ বাড়ীর আঙিনায় পা দিলেই তার সমস্ত সম্পত্তির হদিশ এক নজরে জেনে নেওয়া যায়—যার মূল্য খুবই সামান্য।

পারাউমুর্মু মহারাজের মনোভাব বুঝল। হেসে বলল সে,—হ্যাঁ মহারাজ এই হলো একজন সর্দারের সংসার। সতেরখানির সাধারণ প্রজাদের অবস্থা এর থেকেই আপনি অনুমান করতে পারবেন। মহুল, জোনার আর কদুয়া—তাও মেলে না এদের ভাগ্যে। তাই আমরা অশান্ত। শান্ত থাকতে কি আমাদেরও সাধ হয় না? কিন্তু পেটে যখন জ্বালা ধরে, ছেলে-মেয়েগুলো যখন দিনের পর দিন না খেয়ে শুকিয়ে যায়, যখন পেটের জ্বালা মাথায় গিয়ে ওঠে। আর শান্ত থাকতে পারি না আমরা।

বরাহভূমরাজ নিরুত্তর।

খাঁড়ে পাথর বলেন—শুনলেন মহারাজ? আমার সংগে শত আলোচনা করেও যা বুঝতেন না, পারাউ সর্দারের এক কথায় বুঝেছেন নিশ্চয়। সমস্ত সতেরখানি তরফ যেন কথা বলল এই মুহূর্তে।

—বুঝেছি রাজা। তবু বলছি শান্ত থাকতে। আপনি জানেন বোধ হয় টোডরমল্লের রাজস্ববিভাগের মধ্যে জংগলমহলের নামমাত্র উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এখান থেকে রাজস্ব আদায়ের কল্পনা এ-পর্যন্ত কেউ করেনি। কারও দৃষ্টিও এদিকে পড়ে নি। কিন্তু বরাবর যদি এখানে আগুণ জ্বলে, মুসলমানদের দৃষ্টি এদিকে পড়বেই। তখন কহুয়া জোনারও কারও ভাগ্যে জুটবে না। আজ আপনি আমাকে বছরে দিচ্ছেন ২৪০ টাকা। তখন এর একশো গুণ দিলেও বোধহয় ওদের পেট ভরবে না।

—আপনার কথা ভাববার মত। খাঁড়ে পাথর গম্ভীর হয়ে বলেন।

চিন্তান্বিত দুই রাজা চলে গিয়েছিলেন সেদিন পারাউমুর্মু'র আঙিনা ছেড়ে।

কিন্তু এরপরও পারাউ শান্ত থাকতে পারেনি। অল্পদিন পরেই খাঁড়ে পাথরের মৃত্যু হল। যুঝার সিং হলেন রাজা। অন্যায়ের প্রতি সহিষ্ণুতা দেখানো বৃদ্ধ খাঁড়ে পাথরের পক্ষে সম্ভব হলেও যুবক যুঝার সিং-এর ধমনীর রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। সেই সংগে পারাউমুর্মু'রও।

ঘটনাবহুল জীবন এই পারাউমুর্মু'র। অনেক যুদ্ধ দেখেছে—অনেক করেছে। শেষে অম্বিকানগরের সংগে এক খণ্ডযুদ্ধে ডান হাতখানা হারায়। সেই থেকে আর সে কিতাগড়ে যায় নি। লাভ নেই। সাঁওতাল, মুণ্ডা আর ভূমিজ অধ্যুষিত সতেরখানি তরফের রাজধানী বাটালুকার রাজপুরী কিতাগড়ে অক্ষমের স্থান নেই। জীবন ধারণের অত্যাবশ্যক তাগিদে যেখানে প্রতি মুহূর্তে অস্ত্র ধরতে হয়, সেখানে অক্ষম হয়ে বসে থেকে অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বেশীদিন সম্মান বজায় রাখা সম্ভব নয়।

তাই পুত্র রাজুমুর্মু'কে পাঠিয়েছিল সে যুঝার সিং-এর কাছে। অনুরোধ করেছিল, রাজুকে যেন তার সামর্থ্য প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হয়। যুঝার সিংও দ্বিধাবোধ করেননি সে অনুরোধ রক্ষা করতে। প্রধান সর্দারের পুত্র প্রথম সুযোগেই যাতে সর্দারের আসন দখল করতে পারে—সে ইচ্ছে

তাঁরও ছিল। এক মাসের মধ্যে সুপুর রাজের বিরুদ্ধে হলো অভিযান। রাজুমুর্মু তার নেতৃত্ব পেল।

সেদিনের কথাকে মনে হয় কালকের কথা। পারাউ প্রায়ই বসে বসে ভাবে। সূর্যকে তখনো দেখা যায় নি সমতলের দিগন্তে—কাঁটারাঙ্গার চূড়াটুকু শুধু লাল হয়ে উঠেছে সবে। পারাউ একটা বাঁশের খুঁটি মাটিতে পুঁতবার চেষ্টা করছিল একহাতে—গরু বাঁধার জন্যে। ছাব্বিশ বছরের সুঠাম যুবক ঘর থেকে বাইরে এল ঠিক সেই সময়ে। গায়ে হলুদ রঙের আঙরপ আর মাথায় লাল দাংড়ি। কাঁধে ছিল তার বল্লম—হাতে ঢাল।

পারাউমুর্মু একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখছিল ছেলের বীরের রূপ।

রাজু মৃদু হেসে প্রণাম করে বলেছিল—চালা কানাইঞ।

—ওকথা বলতে নেই। বল্ 'আসি'।

—আসি বাবা।

—কিতাপাটের আশীর্বাদে তুই জিতবি—নিশ্চয়ই জিতবি। সর্দার হবি তুই। কিতাপাট তোর সংগে সংগে থাকবেন।

আবার একটু মৃদু হেসেছিল রাজু। ঘরের দরজার দিকে একবার চোরা-চাহনি চেয়েছিল। সেখানে আড়ালে দাঁড়িয়ে তার বউ। ছেলে সাওনা তখনো ঘুমে অচেতন।

সেই বিদায়ই শেষ বিদায়।

আর ফেরেনি রাজু। যুদ্ধে জিতেও সে যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে রইল। কিতাপাট তাকে সর্দার হতে দেননি—রক্ষাও করেন নি।

নাতি সাওনামুর্মু মরেছিল ভালুকের হাতে। তার ছিন্নবিচ্ছিন্ন দেহ পাওয়া গিয়েছিল মারাংবুরুর ঠাঁই-এর কাছে। দাদুকে বৈদ্য ওষুধ খেতে বলেছিল—তাই গাছ-গাছড়ার খোঁজে সে গিয়েছিল খাঁড়ে পাহাড়িতে। পথে রাত হয়েছিল। হাত ছিল খালি। টাঙি নিয়ে [illegible] কোনো ভালুকও সাওনার কাছে ভিড়তে পারত না। বাপের মতই সে ছিল শক্তিমান—দাদুর মত তারও ছিল চওড়া বুক।

ব্যাটার বউ আর নাত-বৌও গিয়েছে। মরে বেঁচেছে তারা সেবারের 'হাওয়া-ছক'-এর মহামারীতে। কিন্তু সেই সংগে সাওনার মেয়েটাকে নিয়ে গেলেই পারত। সেটাকে যে কেন ফেলে গেল, কিতাপাটই একমাত্র জানেন সেকথা। বুড়োকে আর যে কত পরীক্ষাই করবেন তিনি।

সাওনার মেয়ে লিপুর। বুড়ো ভেবেছিল বাঁচবে না। কিন্তু মরলও তো না। বেশ ডাগর হয়ে উঠেছে। চোদ্দ বছর বয়স হল। এ-বয়সে বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ে দেওয়াই উচিত, কিন্তু প্রাণ যে চায় না। আর কয়দিনই বা। থাকুক সে-কদিন।

সেদিন বুড়ো বসেছিল চিন্তায় বিভোর হয়ে। অতীতের স্মৃতি তোলপাড় করছিল তার মনে। এমন সময় লিপুর ছুটে আসে হাঁপাতে হাঁপাতে। খবর দেয়, তাদের গাই কুঙ্‌কীর বাছুর হয়েছে মাঠের মধ্যে।

—কি বিয়োলো? এঁড়ে না বক্‌না।

—এঁড়ে। লিপুর ঠোঁট উল্টোয়।

—মন খারাপ হলো নাকি রে?

—হবে না? এতোদিনে একটা বাচ্চা হলো, তাও এঁড়ে।

—এঁড়ে কি খারাপ?

—বড় হলে দুধ দেবে?

—দুধ না দিলেও মাঠ চষবে।

—কে নিয়ে যাবে মাঠে—আমি?

—না। তোর যে একটা এঁড়ে আসবে? সে।

—ধেত্‌।

—চল দেখিগে। পারাউ হাসতে হাসতে লিপুরের গায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। শরীরটা তার বড় বেশী নুইয়ে পড়েছে। মাজাটাকে বেশীক্ষণ সোজা করে রাখা যায় না। ভার সাম্য বজায় রাখতে লাঠিতে ভর দিয়ে চলতে হয়।

বাচ্চাটা অনেক আগেই হয়েছে। বাছুরের গা চেটে চেটে পরিষ্কার করে ফেলেছে কুঙ্‌কী। গা শুকিয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে পায়েও বেশ জোর হয়েছে বাচ্চাটার। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাঁটে মুখ লাগিয়ে কেমন চুষছে। তবে এখনও মাঝে মাঝে সামনের পা দুটো ভেঙে যাচ্ছে—ফস্‌কে যাচ্ছে।

পারাউমুর্মু চেয়ে চেয়ে দেখে।

—রঙটা তো ভালই হয়েছে। সে বলে।

—ভাল না ছাই। লাল রঙ ভাল নাকি? মায়ের মত কালো হলেই তো ভাল হত। এ ঠিক শুকোলদের ষাঁড়ের মত দেখতে হয়েছে।

—বাপেরই মত হয়েছে।

—এদের আবার বাপ থাকে নাকি?

পারাউ সর্দার হাসে। লিপুর বড়ই ছোট—বয়সের চেয়েও। মেয়ে-সংগী তার কেউ নেই।

বাছুরটাকে কোলে তুলে নিয়ে বাড়ীর দিকে এগোয় লিপুর। কুঙ্‌কী ব্যতিব্যস্ত হয়ে পেছনে পেছনে ছোটে।

অনেক কাজ আজ লিপুরের। সাঁঝে শালকাঠের গুঁড়িতে আগুন দিতে হবে। মশায় যাতে কষ্ট না পায় এরা। ঘাস কেটে দিতে হবে। আজ আর কাঁটারাঙ্গার কালো পাথরের পাশে যাওয়া হবে না। দুঃখ আর আনন্দের এক অদ্ভুত অনুভূতি তার ছোট্ট মনে খেলা করে বেড়ায়।

সমস্ত দিন আনন্দ আর উত্তেজনার মধ্যে কাটলেও, সন্ধ্যাবেলা মন খারাপ হয় লিপুরের। কাঁটারাঙ্গার টান দুর্নিবার—সেই টানকে সংযত রাখতে গিয়ে সে হাঁপিয়ে ওঠে। শেষে দাদুর কাছে গিয়ে বসে পড়ে বলে—গল্প বল।

—কিসের গল্প।

—রাজার।

—আর একদিন শুনিস। আজ ঘুমো গে।

—ঘুম যে পায় না।

আঙিনার সাঁজালের আলো এসে পড়েছে লিপুরের মুখে। সেই মুখের দিকে চেয়ে কষ্ট হয় পারাউ-এর।

—তোর বিয়ে দেবো রে লিপুর। আর দেরি করব না।

—না। বিয়ে করব না।

—কেন রে। সুন্দর একটা এঁড়ে আসবে। বৃদ্ধ হেসে ওঠে।

—দরকার নেই।

—চিরকাল এমনি থাকবি?

কথার জবাব দেয় না লিপুর। অন্যমনস্ক হয় সে।

সেই সময়ে নরহরি বাবাজী এসে আঙিনায় পা দেয়।

—কেমন আছো সর্দার ?

—ঠাকুরবাবা না ?

—হ্যাঁ। বরাহভূম থেকে ফিরেছি কাল। এসে দেখলাম সব ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে। নরহরি চোখ মোছে।

—মারাংবুরুর অভিশাপ।

—তুমিও একথা বিশ্বাস করেছ ?

—বিশ্বাস করাই ভাল। না হ'লে অনর্থ ঘটে।

—আমি জানি, কে এমন জঘন্য কাজ করেছে। নরহরির কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা।

—মংগল হেম্বরম্। পারাউ উদাসভাবে বলে ওঠে।

চমকে ওঠে নরহরি।

—চমকালেন কেন ?

—তুমি জান ?

—একথা জানতে কোন কষ্ট হয় না ঠাকুরবাবা। রাজা বৈষ্ণব। রাজ্যের লোকেরাও একে একে বৈষ্ণব হচ্ছে। মারাংবুরুর প্রতাপ ধীরে ধীরে কমে আসছে। তাই—

—ঠিক। আমি যাব মংগলের কাছে।

—না। যাবেন না। ধরে নিন রাজার ভাগ্যে ছিল অপঘাত মৃত্যু। শুধু শুধু ওখানে গিয়ে ওকে প্রাধান্য দিলে খারাপ হবে।

নরহরির কপালে চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে। বৃদ্ধের কথাটা সে উড়িয়ে দিতে পারেনা। বরং যত ভাবে, ততই ঠিক বলে মনে হয়। কালাচাঁদ জিউএর প্রতিষ্ঠার পর থেকে যে মারাংবুরুর কথা সতেরখানির অধিবাসীদের মন থেকে ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে তাকে একপাশে সরিয়ে রাখাই ভাল। রাজাও সেইভাবে চললে ভাল করতেন। কুকুর বলির রক্ত দেখে বিচলিত না হয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেলে, আজ এতদিন পরে মারাংবুরু আবার সতেরখানির লোকদের মনে ভীতির আসন প্রতিষ্ঠা করতে পারত না।

—তোমার কথা মেনে নিলাম সর্দার। মংগল থাক তার নিজের অভিমান নিয়ে।

—আর একটা কথা ঠাকুরবাবা। আপনার সন্দেহের কথা রাজা

ত্রিভনের কানে যেন না যায়। প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করতে পারেন তিনি। সে চেষ্টা করলে অনেক দিকুর মন ভাঙবে। রাজার বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে পারে তারা মংগলের প্ররোচনায়।

—সত্যি কথা বলেছ সর্দার। আমরা থাকি পূজো-অর্চনা নিয়ে। এত বেশী ভাবতে পারি না।

—আপনাদের তো কোন দরকার নেই এসবে। আপনারা হলেন মহাপুরুষ।

—কই আর হতে পারলাম। গোবিন্দকে জীউ-এর সেবার ভার দিয়ে ভাবলাম বৃন্দাবন যাব। কিন্তু হয়ে উঠছে না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে নরহরি দাস।

গুরুগম্ভীর আলোচনায় অধৈর্য হয়ে উঠেছিল লিপুর। নরহরির দীর্ঘশ্বাসের সংগে সংগে সে-ও সজোরে কৃত্রিম শ্বাস ফেলে।

—বৃন্দাবনের কথা শুনে তোর দীর্ঘশ্বাস পড়ল নাকি রাধা? নরহরি ঠাট্টা করে।

—আবার রাধা বলছ?

—তুই তো রাধাই।

—বেশ তাই। লিপুরের মুখ গম্ভীর হয়।

কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়ার চাঁদ দেখা যায় আকাশে। লিপুর উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সেদিকে। কিছুই ভাল লাগে না তার, কাঁটারাঞ্জায় ইচ্ছে করে যায় নি বলে। সে হয়ত ফিরে গিয়েছে অপেক্ষা করে করে।

—কি রাধা চাঁদ দেখে কি কালাচাঁদের কথা মনে পড়ল?

নরহরি বাবাজীকে আদপেও ভাল লাগে না লিপুরের। এর চেয়ে বরং মারাংবুরুর পূজারী ভাল। দেখে ভয় লাগলেও ভাল। নরহরি বাবাজীকে কেমন যেন অসভ্য বলে মনে হয়। কথার জবাব দেয় না সে।

সেই সময়ে করুণ বাঁশীর সুর ভেসে আসে দূর থেকে। চঞ্চল হয়ে ওঠে লিপুর। কিছুক্ষণ বসে থেকে ছট্‌ফট্ করে শেষে উঠে পড়ে। কোথা থেকে আসছে সে-সুর জানে সে। ছুটে বাড়ীর বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়। ইচ্ছে হয়, তখনি দৌড়ে যায় কাঁটারাঞ্জার সেই পাথরের কাছে। যে-পাথর মসৃণ হয়ে উঠেছে—মানুষের স্পর্শ পেয়ে পেয়ে। কিন্তু এই রাতে একা কি করে যাবে? রাগ হয়

বাঁশীওলার ওপর। ওর কি একটুও বুদ্ধি নেই? ভয়ও নেই একবিন্দু। যদি ভালুক এসে কিছু করে? যদি বাঘ বার হয়? লিপুরের ছোট্ট বুকখানা ভয়ে কাঁপতে থাকে।

বাঁশীর সুর নরহরি আর পারাউ সর্দারও শুনতে পায়। কিন্তু তারা বুঝতে পারে না—লিপুর সেই সুরের টানেই বাইরে গেল। অমন বাঁশী কত লোকই বাজায় এই তরফে।

নরহরি আরও কিছুক্ষণ বসে গল্প করে। কুঙ্কীর বাছুর দেখে। এত বয়সেও সে আবার বাচ্চা দিল দেখে অবাক হয়। শেষে একসময়ে বলে —আজ উঠি সর্দার।

—আসবেন মাঝে মাঝে। বেশীদিন আর আসতে হবে না।

নরহরি চলে গেলে বৃদ্ধ আবার ভাবতে বসে। লিপুরের ভার ঠাকুর-বাবার ওপর দিয়ে গেলে হয়। সতেরখানিতে তাঁর প্রভাব আছে—ব্যবস্থা একটা করে দিতে পারবেন ভাল ঘর দেখে। কিন্তু বলতে কেমন বাধো বাধো লাগে। এ-বংশের মেয়ের আবার বিয়ের ভাবনা। কত সম্বন্ধই তো এলো—সবই কি খারাপ ছিল? আসলে মেয়েটিকে কাছে রাখার ছুতো। নিজের মন স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে বৃদ্ধের কাছে।

পূবের আকাশ ফর্সা না হতেই বাটালুকা গ্রামের আশেপাশের সমস্ত অধিবাসী ঘরের বাইরে এসে কপাট বন্ধ করে। নারীরা বাচ্চাদের পিঠে বেঁধে নেয় ভাল করে। অনেক যুবতী আঁচলভরে বন্যফুল তুলে নেয়। আর পুরুষেরা হাতে নেয় বাদ্যি—তুমদাঃ, মাদান ভেড়, রাহাড়। মেয়েরা সুন্দর সাজে সেজেছে—পরনে তাদের রঙীন খাণ্ডি আর বান্দেন কিচরি। পুরুষেরা গায়ে জড়িয়েছে বাহাধুতি। সারিবদ্ধভাবে বাজনা বাজিয়ে হৈ হৈ করতে করতে তারা রওনা হয় কিতাডুংরিতে কিতাপাটের মন্দিরে। অসময়ে কিতাডুংরির এই উৎসব। প্রতি শ্রাবণ মাসের উৎসব ছাড়াও এটা বাড়তি লাভ। তাই সবার মনে আনন্দ।

নতুন রাজা আজ কিতাপাটের পূজো দেবেন। রাজদর্শন মিলবে। সেই সংগে বোঝা যাবে রাজার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা। দু' একটা বিচার করবেন তিনি। সতেরখানি তরফের এটাই হল প্রচলিত নিয়ম। প্রথম দিনেই রাজা সম্বন্ধে সমস্ত অধি[illegible]ই ছাপ পড়ে যায়। সে ছাপ এত

গভীর যে কিছুতেই আর ওঠে না। প্রথম দিনেই রাজার হয় চরম পরীক্ষা।

কিতাডুংরি পাহাড় থেকে শালবনে ছাওয়া সদ্য-ঘুমভাঙা বাটালুকা গ্রামখানাকে দেখায় অপূর্ব। আলের পথ ধরে পিঁপড়ের সারির মত দলে দলে আসে মুণ্ডা, দিকু, ভূমিজ সাঁওতালেরা। পাথরের দুর্গম পথ বেয়ে তারা অবলীলাক্রমে উঠে আসে পাহাড় বেয়ে—এসে জড়ো হয় মন্দিরের সামনে।

লিপুরও এসেছে শুকোলদের বাড়ীর লোকজনের সংগে। পারাউ সর্দারের পক্ষে এতদূর হেঁটে আসা সম্ভব নয়।

মজা দেখতে এসেছে লিপুর। ভীড়ের সংগে মিশে রয়েছে সে। রাজার বিচার দেখে তার খুব হাসি পাবে। রাজা নিশ্চয়ই মুখখানাকে গম্ভীর করবে। তখনি তো সে হেসে ফেলবে। মনে মনে একটু ভয়ও হয় লিপুরের। তার মত আর সবাই না হেসে ওঠে রাজার কাণ্ড দেখে। লজ্জার সীমা থাকবে না তাহলে।

হঠাৎ জনতার মধ্যে একটা আলোড়ন ওঠে। এতক্ষণের চিৎকার আর হাসি মুহূর্তে স্তব্ধ হয়। রাজা আসছেন।

ত্রিভন সিং ভুঁইয়া ঘোড়ায় চড়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। তাকে অনুসরণ ক'রে পায়ে হেঁটে আসে নরহরি বাবাজী, সারিমুর্মু, বুধকিস্কু, বাঘরায় সোরেণ আর ডুইঃ টুডু।

কী চমৎকার দেখাচ্ছে রাজাকে। লিপুরের চোখের পলক পড়ে না। যেন মেঘের রাজ্য থেকে দেবতা নেমে এলেন।. এ দেবতাকে সে তো চেনে না—দেখেনি কোনদিনও। মনের মধ্যে কে যেন গুমরে কেঁদে ওঠে—সজল হ'য়ে ওঠে ওর চোখ দুটো। রাজা ক-ত উঁচুতে। আর সে? কাঁটারাঙ্গার কোল ঘেঁষা এক কুটিরের সামান্য বালিকা। পরনে তার ছেঁড়া শাড়ী। হাতে এক জোড়া বালাও জোটে না।

ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে লিপুর। দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গোজে সে। আর কেউ দেখে ফেললে তিরস্কার করবে। আজকের দিনে হাসতে হয়—আনন্দ করতে হয়। এই আনন্দের মধ্যে তার চোখের জল দেখতে পেলে সর্বনাশ ঘটবে।

যে প্রত্যাশা আর বুক-ভরা আনন্দ নিয়ে সে এসেছিল, রাজার রূপ

আর আড়ম্বর দেখে তা নিমেষে অন্তর্হিত হয়। একটা তীব্র বেদনা বাসা বাঁধে তার মনে। এ-রাজাকে সে চেনে না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে লিপুর কাঁটারাঙ্গা পাহাড়ে আর সে যাবে না। আর সে বসবে না সেই মসৃণ পাথরে। বাঁশীও শুনবে না। না—না, মরে গেলেও নয়। বাঁশীর সুর যদি ভেসে আসে দূর থেকে, সে কাণে আঙুল দেবে। তবু যদি শুনতে পায়, গরুর জন্যে রাখা পোয়ালের গাদায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুবে থাকবে তার মধ্যে।

বেশীক্ষণ বসে থাকা যায় না। সবার সংগে তাকেও দাঁড়াতে হয়। রাজা একেবারে কাছে এসে পড়েছে। সম্মান দেখাতে হবে।

কিতাপাটের পূজারী এতক্ষণ মন্দিরের সামনে সমানে পায়চারী করছিল। এবারে একগাল হেসে দুহাত বাড়িয়ে দেয় রাজার দিকে। তার আমন্ত্রণে রাজা মন্দিরে প্রবেশ করে। সর্দাররা দাঁড়িয়ে থাকে এক বিরাট পাথরের পাশে। পূজো দিয়ে রাজা তার ওপরই এসে বসবে।

লিপুর ভাবে, কাঁটারাঙ্গার পাথর এই পাথরের চেয়ে অনেক ভাল, অনেক কালো। সে পাথরে কেমন যেন মায়া-মাখানো, এমন রুক্ষ নয়। এ পাথরটায় সত্যিই কোন রস নেই।

লিপুর দেখে, সবাই হঠাৎ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। কিতাপাটকে প্রণাম করছে তারা রাজার সংগে। ধরা পড়ার ভয়ে সেও মাটির ওপর উপুড় হয়ে পড়ে।

বাইরে আসে রাজা। সর্দাররা এগিয়ে যায়। আহ্বান করে তাকে আসন গ্রহণ করতে। ত্রিভনসিং গম্ভীর—হাসির চিহ্নমাত্র নেই মুখে। লিপুর চেনেনা একে—কিছুতেই নয়। এ অন্য লোক। তাই তারও হাসি পাচ্ছেনা। আগে ভুল ভেবেছিল—ভেবে নেচেছিল।

সারিমুর্মু জোর গলায় বলে ওঠে—নতুন রাজা কিতাপাটের আশীর্বাদ পেয়েছেন। তোমরা তাঁর দীর্ঘ জীবন কামনা কর।

সমবেত জনতা একই সংগে বিড়বিড় করে কি যেন বলে। লিপুরের মনে হয়, অনেক দূরে কোথাও যেন হাট বসেছে। তারই শব্দ ভেসে আসছে। সে-ও একান্ত মনে প্রার্থনা করে—কাঁটারাঙ্গার পাহাড়ের মত চিরকাল বেঁচে থাকে যেন ঠাকুর।

বুধাকিস্কু এবারে বলে—রাজা বিচার করবেন। তোমাদের কারু যদি কোন অভিযোগ থাকে এগিয়ে এসো।

একটা অখণ্ড স্তব্ধতা বিরাজ করে কিছুক্ষণের জন্যে। সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না কোন। শেষে একজন যুবক অসংকোচে এগিয়ে আসে। সুঠাম দেহ তার। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। মাথায় ঝাঁকড়া চুল।

—তোমার নাম? সারিমুর্মু প্রশ্ন করে।

—রান্‌কো কিস্‌কু।

—বিচার চাও?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বল, তোমার অভিযোগ।

—আমাকে একঘরে করা হয়েছে আজ।

—আজ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এখানে আসার জন্যে ভোরবেলা উঠে দরজা খুলে দেখি, বাড়ীর সামনে বাঁশ পুঁতে তাতে এঁটো শালের পাতা, পোড়া কাঠ আর ঝাঁটা টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ত্রিভন সিং কথা বলে এবারে,—কেন একঘরে করল?

—আজ্ঞে রাজা, আমার বউ নেই। খুব ছোট বেলায় মরে গিয়েছে। মাস চারেক আগে একজন মেয়েলোককে এনে রেখেছিলাম সারিগ্রাম থেকে—বিয়ে করব বলে। এতদিন পরে পাড়ার সবাই জানতে পেরেছে তার উপাধিও আমার মত 'কিস্‌কু'।

—তুমি জানতে না?

—রাজাকে সাক্ষী করে কিতাপাটের সামনে দাঁড়িয়ে বলছি আমি জানতাম না।

—তবে বিয়ে করনি কেন এতদিন?

—হয়ে ওঠেনি। রান্‌কো এবারে সত্যি কথা বলল না। সে বলল না যে বিয়ে করলে হারিয়ে যাবার ভয় থাকে না। হারিয়ে যাবার ভয় না থাকলে আবার ভালবাসা।

—তাকে ছেড়ে দাও। ত্রিভন কঠিন ভাবে বলে।

—পারব না। ঝাঁকড়া চুল নিয়ে রান্‌কো মাথা ঝাঁকায়।

সর্দাররা নড়েচড়ে ওঠে। ত্রিভন সিং মুহূর্তের জন্যে বিচলিত হয়।

লোকটা বলে—এ হচ্ছে রাজার বিচার, যাকে তোমরাই সিংহাসনে বসিয়েছ।

—কিন্তু আমি তো এমন বিচার আশা করিনি।

—তোমার আশা অনুযায়ী বিচার হবে না। তোমার মনের চাইতে সতেরখানির সমাজের মূল্য বেশী। ত্রিভন কথাটাকে উচ্চারণ করলেও, মন থেকে মেনে নিতে পারল না। তবু উপায় নেই, সতেরখানিকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে হলে প্রৌঢ় আর বৃদ্ধদের মন অনুযায়ীই বিচারের রায় দিতে হবে।

রান্‌কো বুঝতে পারে, উদ্ধত হয়ে এখানে লাভ নেই। সমস্ত দেশের লোকের বিপক্ষে দাঁড়ানো তার একার পক্ষে অসম্ভব। চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ে তার।

চার-সর্দার ধমকে ওঠে। ভুইঃ বলে—ব্যাটাছেলে হয়ে চোখের জল ফেলছ? লজ্জা করেনা?

তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ফেলে বলে রান্‌কো—ভুল হয়েছিল সর্দার। এমন আর হবে না। রান্‌কোর সমস্ত শরীর শক্ত হয়ে ওঠে। কিতাপাটের কাছে শক্তি কামনা করে সে।

ত্রিভনের কষ্ট হয়। লোকটি সত্যিই মেয়েটিকে ভালবাসে। আজ যদি সে রাজা না হতো—যদি এই পাহাড়-সমান দায়িত্ব তার না থাকত, তাহলে বলত—বেশ করেছ।

কিন্তু উপায় নেই। সে রান্‌কো কিস্‌কুর পাড়ার আর সবাইকে সামনে আসতে বলে।

পঁচিশজন লোক একসংগে এসে রাজাকে প্রণাম করে।

—তোমাদের মধ্যে মোড়ল কে?

—আমি রাজা। বুকে হাত দিয়ে দাঁড়ায় এক বৃদ্ধ।

—রান্‌কো মেয়েটিকে আজই ছেড়ে দেবে। কিন্তু মেয়েটার বিয়ের ব্যবস্থা তো করতে হবে।

—কালই বিয়ে দেবো তার রাজা। আমরা প্রস্তুত।

—বেশ। আর রান্‌কোরও তো বিয়ের দরকার। বাড়ীতে কেউ নেই তার।

—পাড়ায় অনেক মেয়ে আছে রাজা। অমন সুন্দর ছেলের বউএর ভাবনা ?

—ভাল। ওর বাড়ীর সামনে থেকে আজই বাঁশ তুলে নেবে। পাড়ার সবাই ওকে নিয়ে আজ খাওয়া দাওয়া করবে।

জনতা জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠে। এমন সহানুভূতির সংগে বিচার করা তারা দেখেনি কখনো। নতুন রাজা মানুষ নয়—দেবতা। ভীড়ের মধ্যে লিপুরের ছোট্ট বুকখানা গর্বে ভরে ওঠে। কিছু না বুঝলেও এটুকু সে জেনেছে যে ত্রিভনসিং চমৎকার বিচার করেছে। কিন্তু সে তো রাজা—পারবেই বা না কেন ? কিতাগড়ে যারা জন্মায় তারা আঁতুড় ঘরের বাইরে আসার আগেই বিচার করতে শেখে—ঘোড়ায় চড়া শেখে।

জনতার কলরব রান্‌কো কিস্‌কুর কানে যায় না। তার মাথার মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করে। আজ থেকে ঝাঁপনী তার কেউ নয়। ঝাঁপনী কালই হবে অন্যলোকের ঘরণী। ভীড়ের মধ্যে মিশে যায় রান্‌কো। পালাতে হবে বাটালুকা ছেড়ে অনেক দূরে। যেখানে ঝাঁপনীর কথা তার কানে পৌঁছবে না।

বুধ কিস্‌কু চিৎকার করে বলে—আর আকয় কোয়াঃ চেৎ লালীশ মেনাঃ আ ?

সবাই ঘাড় ফিরিয়ে এদিকে ওদিকে দেখে। কেউ এগিয়ে আসে না আর। আর কোন নালিশ নেই আজ।

নাচ সুরু হয়। পুরুষেরা বাঘ্নি নিয়ে একদিকে—মেয়েরা অন্যদিকে। আজকের দিনে শুধু আনন্দ। নাচ গান হাণ্ডি আর মনের শ্রদ্ধা দিয়ে তারা রাজাকে অভিষেক করবে। কিতাডুংরি পাহাড়ের এই আনন্দোৎসব নীচের গ্রামগুলির শালবনের পাতায় কাঁপন লাগায়। মুষ্টিমেয় স্থবির আর অসুস্থ ব্যক্তি, যারা যোগ দিতে পারেনি এতে, ঘরে বসে কান পেতে শোনে এই আনন্দ কোলাহল। এক অকথিত ব্যথা পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে তাদের বুকের নীচে। এমন দিন জীবনে দুবার আসে না।

রাজার নামে জয়ধ্বনিতে ত্রিভন সংকুচিত হয়। ভাবে, এতগুলো লোকের এই যে বিশ্বাস আর নির্ভরতা—এর যোগ্যতা আছে কি তার ? পারবে কি সে সতেরখানি তরফের সমস্ত অধিবাসীর সুখদুঃখের বোঝা ঘাড়ে নিতে ?

একজন যুবতী নাচতে নাচতে রাজার সামনে এসে থেমে যায়। মুচকি হেসে নত হয়ে একপাত্র হাণ্ডি বাড়িয়ে দেয়।

নরহরি বাবাজী হাঁ হাঁ করে ওঠে—না না, ছি ছি, হাঁড়িয়া খাবে কেন?

ত্রিভন সিং চার সর্দারের মুখের দিকে চকিতে দৃষ্টি ফেলে। এখানকার নিয়ম কানুন সে ঠিক জানে না। আগে থেকে তারা বলেও দেয়নি।

সর্দারদের মুখে কিছুই লেখা নেই। সে নিজের বুদ্ধিতে পাত্রটি মুখের সামনে তুলে সামান্য একটু খেয়ে মেয়েটিকে ফিরিয়ে দেয়।

নরহরি বাবাজী স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে।

জনতা আনন্দে আকাশ ফাটানো চিৎকার করে। মেয়েটি সেই পাত্র থেকে একটু একটু করে অনেক পাত্রে ঢেলেদেয়। রাজার প্রসাদ।

একদল মেয়ে একসংগে এগিয়ে আসে এবারে। প্রত্যেকের হাতে হাণ্ডির পাত্র। নিজেকে অসহায় মনে করে ত্রিভন। এতগুলো পাত্র থেকে একটু করে খেলেও তাকে আজ পাথরের ওপর ঢলে পড়তে হবে। হাণ্ডি পানের অভ্যাস তার একটুও নেই। কিন্তু এরা শুনবে না—বিশ্বাসও করবে না। পেট থেকে পড়েই যারা মুখে হাণ্ডির স্বাদ পায়, তাদের রাজা এ-পর্যন্ত জিনিষটি খায়নি, একথা কেন তারা মানবে? মহূর্তে কর্তব্য স্থির করে ফেলে সে। হাসতে হাসতে প্রতিটি পাত্রে ওষ্ঠ স্পর্শ করে দেয়।

সর্দারদের মুখ হাসিতে ভরে ওঠে। ত্রিভন বুকে বল পায়। এটাও হয়ত একটা পরীক্ষা—সে উত্তীর্ণ হয়েছে।

সারিমুর্মু'কে কাছে ডেকে বলে—আর বেশীক্ষণ চলতে দেওয়া উচিত নয় সর্দার। অনেকেই মাতাল হয়েছে। পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়তে পারে।

—আধ্যেক লোকও যদি সেভাবে মরে আজ, তাতে তাদের বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই। কিন্তু এমন নাচগান এখনি বন্ধ করলে বড় আঘাত পাবে।

ত্রিভন উপলব্ধি করে, কথাটা ঠিকই বলেছে সর্দার।

উন্মত্ত জনতা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে সারা পাহাড়ে—দাবানলের মত। বেশবাসের খেয়াল থাকে না কারও। এক একজন যেন এক একটি আগুনের ফুলকি। সূর্যের তাপ শালগাছে বাধা পেলেও সারা গা

তাদের ঘর্মাক্ত—চোখ রক্তবর্ণ। মাথার চুল ধূলিমলিন। তবু নেচে চলেছে তারা—যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা—যার যেমন শক্তি, যার যেমন পায়ের জোর, দেহের ওজন। এমন সব উৎসবের দিনে অনেকের অনেক কামনার চরিতার্থ হয়—অনেক বিরহের সাময়িক নিবৃত্তি—অনেক অকথিত কথার প্রকাশ। পুষে-রাখা আনন্দ আর ব্যথা, হাসি আর অশ্রুতে ঝরে পড়ে এমন দিনে।

শেষে সূর্য একসময় পশ্চিমে ঢলে পড়ে। হাণ্ডির ভাঁড় শূন্য হয়—শরীরের সমস্ত শক্তি হয় নিঃশেষিত। শিশুরা কাঁদতে সুরু করে—বৃদ্ধেরা ধুঁকতে থাকে—মাতালেরা আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে টলে পড়ে এদিকে ওদিকে। ভাঙা পাত্র বিচ্ছিন্ন ভাবে ছড়িয়ে থাকে উৎসব প্রাংগণে। বনফুলের স্তূপ শুকিয়ে ওঠে রাজার পাথরের চারপাশে।

উৎসব শেষ হয়। সর্দার আর নরহরি বাবাজীর সংগে রাজা বিদায় নেয় ঘোড়ায় চড়ে।

যুবতীরা মাতাল স্বামীদের তুলে ধরে। মায়েরা শিশুদের পিঠে বেঁধে নেয়। বাদ্যযন্ত্রগুলো ঘাড়ে নিয়ে শ্লথ গতিতে সারিবদ্ধ হ'য়ে ঘর-পানে ফেরে সতেরখানি তরফের বহু গ্রামের অধিবাসী। ফেরার পথে মাদলে মাঝে মাঝে হাত চাপড়ায় তারা—উৎসবের সুরের রেশ তখনো তাদের কানে বাজে, মনে বাজে, মেয়েরা দ্'এক কলি নতুন শেখা গান গেয়ে ওঠে। সবার চোখের সামনে ভাসে তাদের নবীন রাজার সুন্দর কালো চেহারা।

লিপুরের চোখেও ভাসে ত্রিভনের মুখ। কিন্তু সে-মুখের কথা মনে করে তার চোখ ছাপিয়ে জল আসে। সামনের অসমতল পথ ঝাপসা হয়ে ওঠে বারবার। সে হোঁচট খায়—সবার পেছনে পড়ে যায়।

শুকোলের দিদি পেছন ফিরে চিৎকার করে বলে ওঠে—কি লো ছুঁড়ি, হলো কি তোর!

—যাই দিদিমা। তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় লিপুর।

পরদিন দুপুরে পারাউ সর্দারের সামনে ভাত ধরে দিয়ে নিজে খেয়ে নেয় লিপুর। সকালে কেটে আনা একগাদা ঘাস কুঙ্কীর সামনে রাখে। ঘরের যেটুকু কাজ বাকী ছিল সেরে নিয়ে সর্দারের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। সর্দার তখনো ধীরে ধীরে চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে চলেছে।

—বাইরে যাব আমি।

—কোথায়? পারাউ প্রশ্ন করে।

—পাহাড়ে।

—এখন কেন?

—জ্বালানি কাঠ নেই। শুকোলদের বাড়ীতেও যাব এক ফাঁকে। ওরা লোক দেবে বলেছিল আল বাঁধার জন্যে।

—তা যা, তাড়াতাড়ি ফিরিস।

লিপুর বাইরে আসে।

গরুটা ডেকে ওঠে। ফিরে দেখে তার দিকে চেয়ে রয়েছে এক দৃষ্টে। কাছে গিয়ে দাঁড়ায় লিপুর হাসিমুখে। পিঠ চাপড়ে বলে—অমন করে পেছু ডাকতে নেইরে কুঙ্‌কী। আমি আসছি। তুই বাচ্চাটাকে একটু আগলে রাখিস।

কুঙ্‌কী মুখ নীচু করে খেতে খেতে একটা শব্দ করে। বোধহয় দীর্ঘশ্বাস ফেলে। খানিকটা ঘাস মুখের সামনে থেকে উড়ে যায় শ্বাস ফেলার সময়ে।

—রাগ করলি? লিপুর তার পিঠের ওপর মাথা রাখে। আঙুল দিয়ে পিঠের নীচের দিকে সুড়সুড়ি দেয়। কুঙ্‌কীর গায়ের চামড়া কেঁপে ওঠে সুড়সুড়িতে।

—যাইরে। লিপুর দৌড়ে রাস্তায় নামে। পারউ সর্দারের আঁচানোর শব্দ কানে আসে তার। এখন বুড়ো বাইরের খাটিয়ার ওপর গা এলিয়ে দেবে। বিকেলের আগে আর উঠবে না।

শাড়ীর আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে নিয়ে লিপুর তাড়াতাড়ি পা চালায়। এই সময়েই সাধারণতঃ সে আসে। বুকের ভেতরে ক্ষীণ আশা, হয়ত আজকেও আসবে পুরোনো অভ্যাসের বশে। হাতে থাকবে বাঁশী।

যতই এগিয়ে যায় বুকের ধুকধুকুনি ততই বাড়ে লিপুরের। যদি না থাকে আজ? কালো পাথরটা শূন্য পড়ে থাকে যদি? ভাবতে পারে না লিপুর।

সোজা পথে যেতে ভরসা পায় না সে। ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে দিয়ে চলে। আকাওনা, দুধিলোটা, কেদার, সাপীন আর দাত্‌রার গাছের পাতা দু-হাত দিয়ে সরিয়ে সে চলতে থাকে। সেঙেলসিং লেগে গা

জ্বালা করে। তবু চলে সে। শেষে একসময়ে সেই পাথরের ঠিক পেছনে এসে দাঁড়ায়।

নেই সে। লিপুরের মন ভেঙে পড়ে। তার সব উদ্যম, সব পরিশ্রম হতাশায় পরিসমাপ্ত হয়।

রাজা হয়েছে সে। আর আসবে না। সিংহাসন পেয়েছে। এই কালো পাথরের কথা কি আর মনে থাকে?

লিপুরের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়, কোটি কোটি কীটের শোষণে সামনের পলাশ গাছ যেমন হয়েছে, ঠিক তেমনি। পাথরটার নীচে পা-ছড়িয়ে বসে পড়ে সে। নিজে থেকে কখনো পাথরের ওপর বসেনি লিপুর, আজও বসবেনা। ত্রিভু জোর করে তার হাত ধরে কখনো কখনো বসিয়েছে।

একটু দূরের এক গাছে ময়ূর পেখম মেলেছে। সেইদিকে আনমনে চেয়ে থাকে সে। কিছুদিন আগে কুঙ্কীকে খুঁজতে এসে প্রথম যখন ত্রিভুর সংগে দেখা হয়, তখনো এক ময়ূর পেখম মেলে দাঁড়িয়েছিল। ত্রিভু সেদিকে দেখিয়ে বলেছিল—ওটা নিবি? আমি ধরে দিতে পারি।

লিপুরের প্রলোভন হয়েছিল খুব। তবু বলেছিল—বেঁধে রাখলে ওর কষ্ট হবে। গাছেই থাক।

—বাঃ, তুই তো বেশ ভাবিস। তুই আমার দলে।

সেদিন ত্রিভু যখন তার পরিচয় জানতে চেয়েছিল, গর্বে ভরে উঠেছিল তার বুক। সে পারাউ সর্দারের মুখে শোনা নিজেদের বংশ-পরিচয় গম্ভীর ভাবে বলেছিল ত্রিভুকে।

—বড় ঘরের মেয়ে তুই তাহলে!

—আমাদের চেয়ে বড় ঘর আছে নাকি!

—সত্যিই নেই।

ত্রিভু যেদিন রাজা হল, সেদিনই লিপুর প্রথম জানল বাঁশী হাতে ছেলেটিই রাজা। লজ্জায় মাটিতে মিশে গিয়েছিল সে। ভেবেছিল আর আসবে না এদিকে। কিন্তু দুপুর না গড়াতেই কে যেন প্রবল ভাবে টানত তাকে কাঁটাঝাঞ্জার এই পাথরের পাশে। তাই এসেছে। দেখাও হয়েছে রাজার সংগে। কিন্তু পরিবর্তন দেখেনি কোন। ঠিক আগের বাঁশীওলাই যেন। ভয় ভেঙে গিয়েছিল লিপুরের। আনন্দ হয়েছিল

খুব। নাচতে নাচতে গিয়েছিল তাই কিতাডুংরিতে। কিন্তু সেখানে গিয়ে ভুল ভাঙল। ত্রিভন যেন বুঝতে পেরেছে এতদিনে,—রাজা হবার অর্থ। অতলোকের মধ্যে হাজির হয়ে, সবার সংগে নিজের পার্থক্য যাচাই করার অবকাশ পেয়েছে। পরিবর্তন ঘটেছে তার মনেও। আগের বাঁশীওলা আর নেই।

তবু আজ লিপুর এসেছিল একটা ক্ষীণ আশা নিয়ে। সে আশা দুরাশাই। ত্রিভন আসেনি—আর আসবেও না কখনো। কিতাগড়ে তার অনেক কাজ এখন।

ত্রিভু যেখানে পা রাখত, লিপুর সেখানে হাত বুলোয়। ত্রিভু যেখানে বাঁশী রাখত, সেখানে সে মাথা রাখে। শেষে কেঁদে ফেলে।

—এই কাঁদছিস কেন রে?

চমকে ওঠে লিপুর। চোখ দুটো মুছে ফেলে তাড়াতাড়ি। চেয়ে দেখে বাঁশীওলা দাঁড়িয়ে রয়েছে সামনে।

—সেঙেল সিং লেগেছে—এই দেখ। সে তাড়াতাড়ি তার বিছুটি-লাগা ফুলে ওঠা হাত-পা বাড়ায়।

—ঝোপের মধ্যে দিয়ে এলি কেন?

—রাস্তা দিয়েই তো এসেছি।

—হুঁ, আমি দেখিনি বুঝি।

—কোথায় ছিলে?

—ছিলাম এক জায়গায়। এই কয়দিন আসিসনি কেন?

লিপুর একটু ভেবে নিয়ে বলে—কুঙ্কীর বাচ্চা হয়েছে যে।

—বাজে কথা বলিস না। ত্রিভন তার বাঁশীটা লিপুরের মাথায় ঠুকে দেয়।

লিপুরের খুব হাসি পায়। এই আবার রাজা। এ আবার বিচার করে।

—কাল কোথায় ছিলি? ত্রিভন প্রশ্ন করে।

—বাড়ীতে।

—যাস্‌নি?

—কোথায়?

—কিতাডুংরি।

—সেখানে গিয়ে কি হবে ?

—রাজা দেখতে ?

—বয়ে গেছে। কুঙ্কীকে নিয়ে যা ঝামেলা।

—তোকে শূলে দেওয়া হবে।

—দিও। কত ক্ষমতা দেখব।

—সত্যি যাস্‌নি ?

—হুঁ। গিয়েছি।

—দেখিনি তো।

—পেছনে ছিলাম লুকিয়ে। নাচতেও জানিনে, হাণ্ডি খেতেও পারিনে। সামনে থেকে কি করব ? লিপুর হাত নেড়ে কোমর দুলিয়ে বলে। ত্রিভন হেসে ওঠে।

ঝোপের আড়াল থেকে ঘোঁৎ ক'রে একটা শব্দ হয়। লিপুর ভয়ে জড়িয়ে ধরে ত্রিভনকে।

—ভালুক।

ত্রিভন আরও জোরে হেসে ওঠে।

—ভালুক। শুনলে না ? লিপুরের চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে।

—ঘোড়া।

—কার ?

—আমার। রাজা হয়েছি যে। হেঁটে এলে পেছনে ভীড় হবে। কালকে চিনে ফেলেছে সবাই।

—কালকের সেই ঘোড়াটা !

—হ্যাঁ, ওই একটাই ঘোড়া রাজার। বিজলী ওর নাম।

—চল দেখব। খুব সুন্দর সাজানো হয়েছিল।

—আজকে আর সেজে নেই। আমারই মত।

লিপুর দাঁত দিয়ে একটা বুনো লতা চিবোতে থাকে। মনের মধ্যে এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে তার, কিন্তু বলতে দ্বিধাবোধ করে। লজ্জায় রাঙা হ'য়ে ওঠে সে। ধীরে ধীরে মুখ নীচু করে।

—শিখিয়ে দেবো। ত্রিভন তার মুখের দিকে চেয়ে মুচকি হাসে।

চমকে ওঠে লিপুর। সোজা তাকিয়ে বলে—কি ?

—ঘোড়ায় চড়া।

বিস্মিত হয় লিপুর। মনে মনে ভাবে, সে খুব বোকা। নিশ্চয়ই মুখের ভাবে মনের কথাটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

আজও বাঁশী বাজায় ত্রিভন। একমনে শোনে লিপুর। কিতাডুংরি পাহাড়ে গতকাল বুদ্ধিদৃপ্ত যে মুখ দেখেছিল, ভুলে যায় সে মুখের কথা। সামনেই তো বসে রয়েছে সে। চোখও দেখা যাচ্ছে তার। এ চোখে ভাসছে বাটালুকার মাঠ ঘাট পাহাড় আর শালবনের গাঢ় ছায়া।

বাঁশী থামে এক সময়ে। লিপুরের দিকে তাকিয়ে ত্রিভন প্রশ্ন করে—ভাল লাগে না?

ঘাড় কাত করে লিপুর।

—তোর কুঙ্‌কী ডাকছে।

খেয়াল হয় লিপুরের। অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে। সন্ধ্যে হবে একটু পরেই। ত্রিভন তার পিঠে ছোট্ট কিল মেরে বলে—যাঃ, বাড়ী যা।

লিপুর উঠে ছুটতে সুরু করে। শুকোলের বাড়ী হয়ে যেতে হবে। আল বাঁধার লোক ঠিক করেছে কিনা কে জানে। বাড়ীতে ঢোকার সংগে সংগেই তো বুড়ো প্রশ্ন করবে। জ্বালানি কাঠ সে আগেই কিছু জোগাড় করে রেখেছে। আজ না নিলেও চলবে।

পেছনে ঘোড়ার খুরের শব্দে থেমে যায় সে।

—উঠবি?

—না, ছিঃ।

—ওঠ্‌ না। কেউ দেখতে পাবে না। শালবনের ভেতর দিয়ে নিয়ে যাব।

—কি করে উঠব?

ত্রিভন নেমে তাকে উঠিয়ে দেয়। কদমে ছোটে ঘোড়া। প্রথমটা ভয় করছিল লিপুরের। শেষে দুপাশে ত্রিভনের লাগাম-ধরা দুই দৃঢ় হাত দেখে সাহস পায়। ত্রিভনের নিঃশ্বাস তার মাথায় এসে পড়ে। সে নিশ্চিন্ত মনে দুপাশের শাল গাছের দিকে বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। সব যেন নতুন—এভাবে কখনো দেখেনি। ঘোড়ায় চড়লে চিরপরিচিত দৃশ্যগুলোও কেমন যেন অন্যরকম লাগে। গাছগুলো কেমন পেছনে সরে সরে যাচ্ছে—কত তাড়াতাড়ি।

সেদিন সন্ধ্যায় কাজকর্ম সেরে লিপুর পারাউ সর্দারকে চেপে ধরে গল্প বলার জন্যে। রাজার গল্প হওয়া চাই।

—অনেক তো শুনেছিস্।

—না, বল। আবদার ধরে সে।

—শোন্ তবে। এই জংগল মহলেরই এক রাজার গল্প বলি।

লিপুর আরও একটু কাছ ঘেঁষে বসে। বৃদ্ধ সুরু করে—

আমাদের ওই খাঁড়ি পাহাড়ি ছাড়িয়ে আরও হেঁটে চললে, সতেরখানি তরফ যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে অল্প দূরে এক গ্রাম আছে। গ্রামের নাম হল রূপসান। অনেক—অনেক দিন আগে এক ক্ষত্রিয় রাজা যাচ্ছিলেন শ্রীক্ষেত্র দর্শনে। চলতে চলতে, পথের মধ্যে এই রূপসানে এসে এক রাতে তাঁবু ফেললেন। রাজার সঙ্গে এসেছিলেন তাঁর রাণী। রাণীর পেটে ছিল ছেলে। রাজা কিন্তু জানতেন না একথা। রাণী বলেন নি তাঁকে। বললে, শ্রীক্ষেত্র দর্শন জন্মে আর ঘটবে না ভাগ্যে। ওভাবে তীর্থে যাবার নিয়ম নেই কিনা। তাই সংবাদটা চেপে রেখেছিলেন রাণী। রূপসানে এসেই রাণী কাতর হয়ে পড়লেন। ছেলে হবার সময় হয়েছে। যন্ত্রণায় অস্থির, অথচ মুখে টুঁ শব্দ করার উপায় নেই। রাজা জানতে পারলেই সর্বনাশ। তাই অসহ্য যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করলেন তিনি বহুক্ষণ ধরে। শেষে গভীর রাত্রে, সবাই যখন ঘুমে অচেতন, সেই সময়ে রাণীর যমজ সন্তান হলো। দুটোই ছেলে। রাণী পড়লেন মহা সমস্যায়। ছেলেদের ফুটফুটে চেহারার দিকে চেয়ে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে হয়। অথচ রাজা শুনলে বিপদ ঘটবে।

—কেন, রাজার তো আনন্দই হতো। লিপুর বলে ওঠে।

—না রে, ওসব ব্যাপারই আলাদা। সে কি আর সতেরখানির রাজা, যে ছেলে দেখে আনন্দ হবে? ওরা অন্যরকম। তাছাড়া তীর্থক্ষেত্রে যাবার সব পুণ্য তো ওখানেই নষ্ট। যাক্‌গে, শোন। শেষরাত্রে যখন তাঁবু তোলা হল, রাণী একটা বাঁশের হাড়কার মধ্যে ছেলে দুটোকে নিয়ে জংগলের মধ্যে লুকিয়ে রেখে এলেন।—যাওয়ার সময় রাণীর কী কান্না। রাজা হাজার জিজ্ঞাসা ক'রেও কোন জবাব পেলেন না।

রাণীরা চলে যাবার অনেক পরে এক বরাহ ঘুরতে ঘুরতে এসে দেখল এদের। সে কিন্তু খেয়ে ফেলল না এদের—মেরেও ফেলল না। মানুষ

না হলে কি হবে, ওদেরও মায়া আছে। ছেলে দুটোর দিকে তাকিয়ে বোধ হয় নিজের বাচ্চার কথা মনে পড়ল তার। বুঝলি লিপুর, সব শিশুই এক। ওই যে কুঙকীর বাচ্চা ওখানে দাঁড়িয়ে দুষ্টুমী করছে, ছট্‌ফট্ করছে, ওর সংগে কি মানুষের বাচ্চার কোন তফাৎ আছে? নেই। বরাহ ছেলে দুটোকে নিজের দুধ খাইয়ে দিনে দিনে দিব্যি বড় করে তুলল। শেষে একদিন এক দিকু শিকারে গিয়ে ওদের দেখতে পেয়ে ঘরে নিয়ে এল। মানুষ করতে লাগল। নাম রাখল, শ্বেত বরাহ আর নাথ বরাহ।

দুই ভাই বড় হল। বড় হয়ে জংগল মহলেরই পাতকুম রাজ্যের রাজার অধীনে চাকরি নিল। ভালভাবেই দিন কাটছিল। শেষে রাজ্যের ব্রাহ্মণরা দুভাই-এর ওপর ভীষণ চটে গেল। ব্রাহ্মণদের প্রণাম করত না এরা। মাথাও নোয়াতো না কারও সামনে। শেষে দল বেঁধে ব্রাহ্মণরা একদিন রাজার কাছে গিয়ে অভিযোগ করল। রাজা ডেকে পাঠালেন দুই ভাইকে।

—তোমরা প্রণাম কর না ব্রাহ্মণদের? রাজা প্রশ্ন করেন।

—মহারাজ, আমরা ক্ষত্রিয়। আমাদের মাথা এমনভাবে ঘাড়ের সংগে লেগে রয়েছে যে কিছুতেই নত হয় না।

রাজা ভাবলেন, মিথ্যে কথা বলছে তারা। জব্দ করার ফন্দি আঁটলেন তিনি। বললেন—বেশ, আমি পরীক্ষা করব তোমাদের। রাজী আছো?

—হ্যাঁ, মহারাজ।

পরদিন দুই ভাইকে ঘোড়ায় চড়িয়ে পাঠিয়ে দিলেন প্রাসাদ থেকে কিছুদূরে। বলে দেওয়া হল, ঘোড়া ছুটিয়ে প্রাসাদের সিংহদ্বার দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হবে।

প্রাসাদের সিংহদ্বার ছিল নীচু। একটা লোক ঘোড়ায় চড়ে কোনরকমে ঘাড় সোজা করে ঢুকতে পারে ভেতরে। রাজা সেই দ্বারে একটা খড়্গ ঝুলিয়ে রাখলেন। বরাহ ভাইরা ঘোড়া ছুটিয়ে এসে মাথা নীচু করলে বাঁচবে—নইলে রক্ষা নেই।

বড় ভাই শ্বেত বরাহ প্রথমে ঘোড়া ছুটিয়ে এল। সিংহদ্বারের একেবারে কাছাকাছি এসে খড়্গটার দিকে দৃষ্টি পড়ল তার। স্তব্ধ হয়ে দেখছে

রাজধানীর সমস্ত লোক। ব্রাহ্মণরা উদ্‌গ্রীব। রাজার মুখে মৃদু হাসি। নিশ্চিন্ত ছিলেন তিনি—মাথা নোয়াবেই শ্বেতবরাহ। কিন্তু তাঁর ধারণা ভুল। আতংকিত হয়ে সবাই দেখল খড়্গের আঘাতে শ্বেতবরাহের মস্তক স্কন্ধচ্যুত হয়ে ভূমিতে গিয়ে পড়ল। ভীষণ অনুতপ্ত হলেন রাজা। ছোট ভাই নাথবরাহ ছুটে আসতেই, নিজে পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাকে থামিয়ে দেন। ঘোড়া থেকে নেমে আসতে অনুরোধ করেন তাকে। শেষে তার হাত ধরে ধীরে ধীরে নিয়ে আসেন শ্বেতবরাহের মৃতদেহের সামনে। বড় ভাইএর ছিন্নমুণ্ড দেখে নাথবরাহের চোখ দিয়ে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। অনেক দুঃখ-কষ্ট ঝড়-ঝাপটার মধ্যে তারা পাশাপাশি মানুষ হয়ে উঠেছিল।

পাতকুম-রাজ নাথবরাহকে দিলেন এক প্রকাণ্ড রাজত্ব। সেই রাজ্যই বরাহভূম—আমাদের সতেরখানি যাকে কর দেয়। নাথবরাহের নামেই দেশের নাম হয়েছিল বরাহভূম। কিন্তু আসলে, বনের সেই হিংস্র পশু, বরাহ ভাইদের যে মানুষ করেছিল—সে-ই অমর হয়ে থাকল এই নামের মধ্যে। তাই না রে?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে লিপুর বলে—হুঁ।

—এবার শুতে যা।

লিপুর আঙিনায় নামে। সাঁজালটা উস্‌কে দেয়। কিছু ঘুঁটে এনে রাখে তার ওপর।

সমস্ত প্রান্তর নিস্তব্ধ। কিছুদূরে বাটালুকা গ্রামও ঘুমিয়ে পড়েছে। কাঁটারাঙ্গার ফেউএর ডাক ভেসে আসে। গরু ছাগল খুঁজতে বার হয়েছে বাঘ। দূরে খাঁড়ে পাহাড়ির দাবাগ্নি জ্বলে উঠেছে। মরাংবুরুর ক্রোধ—প্রায়ই জ্বলে অমন। অনেক গাছপালা, হরিণ, ময়ুর, সাঁজারু ছুঁচো মারা যায় এতে।

লিপুর পারাউ সর্দারের পাশ দিয়ে ঘরে গিয়ে ঢোকে। একটু নিশ্চিন্ত মনে ভাবতে হবে ত্রিভুর কথা। ঘোড়ায় ওঠার শিহরণ এতক্ষণ পরে আবার অনুভূত হয়। মাথার চুলে আলগোছে হাত রাখে সে—যেখানে অনেকক্ষণ ধরে ত্রিভুর নিঃশ্বাস পড়েছে। তার কিশোরী মনে এক অনাস্বাদিত পুলক জাগে। সে জানে না এর কারণ—বয়স হয়নি জানবার।

ত্রিভনের সংগে লিপুরের মেলামেশা যখন ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হচ্ছিল, সেই সময় সমান্তরালভাবে আর একটি ঘটনা দিনের পর দিন ঘনীভূত হয়ে উঠছিল। বাঘরায় সোরেণ আর ডুইঃ টুডু—এই দুই নবীন সর্দারের মধ্যে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলছিল এক তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। মর্যাদা নিয়ে এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়—শক্তি পরীক্ষা নিয়ে নয়। এর উপলক্ষ্য হল ছুট্‌কী। সারিমুর্মু'র একমাত্র মেয়ে ছুট্‌কী। হাসিতে যার ঝরণা ঝরে—চাহনিতে যার হরিণ মরে লাজে।

বাঘরায় আর ডুইঃ—দুজনেরই বিয়ে হয়েছিল এককালে—সেই ছেলেবেলায়। কারও স্ত্রীই বেঁচে নেই। বাঘ রায়ের বউ মরেছিল সাপের কামড়ে। 'হাওয়া-ছঁকের মহামারী ডুইঃএর বউকেও টেনেছিল। তারপরে এদের যৌবন এসেছিল, কিন্তু বিয়ে করা আর ভাগ্যে ঘটেনি। যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়েরা এককালে জোর করে বিয়ে দিয়েছিল, এখন তারা মৃত।

ছুট্‌কীকে দুজনারই একসংগে চোখে পড়েছিল, সর্দার হবার পর-পরই। সর্দারের বউ এমনিই হওয়া উচিত—একই সংগে দুজনার মনের মধ্যে এই একই কথা ধ্বনিত হয়েছিল। বিশ্বস্ত বন্ধু তারা। কারও মনের বাসনাই কারও অজানা নেই। সেই থেকে চলেছে নারী-মন জয়ের প্রচেষ্টা। বন্ধুত্বের খাতিরে একসংগে কেউ এগোয় না। একের আড়ালে চলে অন্যের সাধনা। কিন্তু বন্ধুত্বের ছেদ পড়েনি বিন্দুমাত্র।

দুজনাই লোভনীয় পাত্র। কারও সংগে বিয়ে দিতেই আপত্তি নেই সারিমুর্মু'র। কিন্তু দ্বন্দ্বযুদ্ধের বহর দেখে বুধকিস্‌কুর পরামর্শে চুপ করে থাকে সে। সুযোগ যখন মিলেছে, মনের মানুষ বেছে নিক মেয়ে।

পছন্দ কিন্তু অত সহজে করতে পারে না ছুট্‌কী। একের অজ্ঞাতে আর একজন যখন তার সামনে এসে দাঁড়ায়, তখন সে বুঝতে পারে না সত্যিই কাকে ভালবাসে। বাঘরায় সাক্ষাতের সুযোগ খোঁজে কালাচাঁদের মন্দিরে যাবার পথে। ডুইঃ এসে দাঁড়ায় শালবনের ধারে, যখন সে প্রতি দুপুরেই আসে ফুলের জন্যে। বিকেলে মালা না পরলে ভাল লাগে না ছুট্‌কীর। দুই বন্ধুই বোধ হয় জানে পরস্পরের সাক্ষাতের সময়, তাই সংঘর্ষ বাধতে দেখা যায় না কখনো।

এক মহাপরীক্ষার সম্মুখীন হয় ছুট্‌কী। প্রতিদিন যখন গোবর জল দিয়ে সারা উঠোন লেপতে থাকে, তখন মন তার চিন্তায় ভরে ওঠে।

প্রশস্ত উঠোন মসৃণভাবে নিকোবার সময় কোন ছন্দপতন ঘটে না, তাই সেই সময়ে তার যত ভাবনা। সে দুজনার চুল-চেরা বিশ্লেষণ করতে বসে। প্রথম প্রথম হাঁপিয়ে উঠত। কিন্তু দিন যত এগিয়ে চলে ততই তার মনের মধ্যে কবির কবিতার মত একটা স্পষ্ট ভাব দানা বেঁধে উঠতে থাকে।

বাঘরায়। হ্যাঁ, বাঘরায়ই তার মনকে বেশী করে টানছে যেন। এই টানার কারণ ডুইঃ টুডুর অক্ষমতা নয়। তার চরিত্রের এক সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যের সংগে ছুট্‌কী ঠিক খাপ খাওয়াতে পারে না। ডুইঃএর মনে কোথায় যেন একটা অবাস্তবতার কীট লুকিয়ে রয়েছে—যেটা পাহাড়-ভাঙা মেয়ে ছুট্‌কীর ঠিক পছন্দ নয়। সে এমন পুরুষ চায় যে মাটির ওপর শক্তভাবে দাঁড়িয়ে কথা বলে। যার বুদ্ধির চেয়ে বীরত্বটাই প্রধান। নারীমনকে চেনার জন্যে ব্যস্ত না হয়ে, নিজেকে যে বেশী করে প্রকাশ করে। ডুইঃএর বুদ্ধি বড় বেশী তীক্ষ্ণ। সেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রখর আলো মাঝে মাঝে ছুট্‌কীর অন্তঃস্থল অবধি ধাওয়া করে। এটা সহ্য করা বড় কঠিন, যেমন কঠিন ডুইঃএর আবোল তাবোল কথা। তবে তার একটি জিনিষ ছুট্‌কীকে প্রবল-ভাবে আকর্ষণ করে। গান বাঁধে ডুইঃ। মিষ্টি গলায় গান গায় সে।

শালবনের ধারে তার সংগে সাক্ষাৎ সেদিন। কিতাগড় থেকে ফিরছিল ডুইঃ। ছুট্‌কীর আঁচলে ছিল ফুল। সংকুচিত হয়েছিল ছুট্‌কী। মন তার বাঘরায়ের দিকে চলেছে। ডুইঃকে এড়িয়ে যেতে চায়। তাই হঠাৎ তার আবির্ভাবে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। আঁচলের এক কোণা থেকে কিছু ফুল মাটিতে পড়ে যায়।

সেদিকে চেয়ে ডুইঃ বলে—বাঘরায় জিতে গেল।

—কি করে বুঝলে?

—তোমার দাঁড়ানো দেখে। ওই ফুলগুলো পড়ে যাওয়া দেখে।

ছুট্‌কী জানে, বাঘরায় শত চেষ্টাতেও এমন কথা বলতে পারত না—এতটা লক্ষ্যই করত না। সে নিজের আনন্দেই থাকত ভরপূর। ছুট্‌কীর মনের অবস্থা দেখার সময় কই তার?

—তুমি এত বুঝতে পার?

—পারি। সেজন্যে আমার দুঃখ কম নয়।

ছুট্‌কী ম্লান হাসে।

ছুট্‌কী ! তবু তোমার নিজের মুখে একবার শুনতে চাই।

—বুঝতেই তো পার সব।

—তবু নিশ্চিন্ত হতে চাই। চল ছুট্‌কী, আমরা এই বাটালুকা ছেড়ে খাঁড়ি পাহাড়ি ছেড়ে চলে যাই অনেক দূরে—

—সেকি ? দেশ ছেড়ে যাবে ? তোমার ওপর যে রাজা ত্রিভন সিং নির্ভর করেন।

—তা বটে। ঠিক আছে, দেশেই থাকব। নির্জনে একটা ছোট্ট কুটির তৈরী করব। সার্জম, কাদাম, রাইরুই আর মুরৎ গাছ ভীড় করে থাকবে সেই কুটিরের চারদিকে। আলাকজাড়ি বেড়া বেয়ে ওপরে উঠবে। বাগানে ফুল ফুটবে—গাছে গাছে ডাকবে কোল, কিস্‌নী, মিরু। মারাঃ পেখম ধরবে। আমরা চেয়ে চেয়ে দেখব।

অবাস্তবতার কীট মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ছুট্‌কী জানে এখন আর থামানো যাবে না। সে চেষ্টা করাও বৃথা।

—আর কিছু বলবে ? নিঃস্পৃহ গলায় বলে ছুট্‌কী।

ডুইঃ অসহায় বোধ করে নিজেকে। ছুট্‌কীর চোখের দিকে চেয়ে দেখে—সে চোখে চাপা হাসির আভাস।

—তুমি রাগ করলে ছুট্‌কী ?

—না, রাগ করব কেন ? তোমার যা ইচ্ছে তাই তুমি বলেছ। তবে আমি ওসব পছন্দ করিনে। সবাই যদি তাদের বউকে নিয়ে অমন নির্জনে বাসা বাঁধে, তাহলে ধাদকা, পঞ্চসর্দারী আর তিন সওয়া দুদিনেই সতেরখানিকে ছাড়িয়ে যাবে।

—সত্যি কথা বলেছ। আমারই ভুল। তুমি আমার পাশে পাশে থেকে এসব ভুল শুধরে দেবে তখন—তাই না ছুট্‌কী ?

—ধেৎ, বিধুয়া হেরেল। ওসব কথা আমার মোটেই ভাল লাগে না।

ছুট্‌কী অনেক চেষ্টা করেই 'বিধুয়া হেরেল' সম্বোধনটা করল ডুইঃকে। এর পরিণতি সে জানে। ডুইঃএর মত ভদ্র স্বভাবের পুরুষ হয়ত এর পর আর কথাই বলতে পারবে না। কারণ সম্বোধনটা নিম্নস্তরের। সর্দারের মেয়ের মুখে এমন কথা শুনে ঘৃণা জন্মাবে তার মনে। সে আর ফিরেও তাকাবে না ছুট্‌কী বলে এক মেয়ের দিকে। কিন্তু উপায় নেই। দুই নৌকায় পা দিয়ে চলতে চলতে হাঁপিয়ে উঠেছে সে। একটি মীমাংসার

প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এর পরে মীমাংসার জন্য আর ভাবতে হবেনা তাকে।

ডুইঃএর মুখ ছাইএর মত সাদা হয়ে যায়। তার পা টলতে থাকে। ছুট্‌কী তাকে ভালবাসে—এ ধারণা প্রথমে থাকলেও দিনের পর দিন তাতে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। তবু একটা ক্ষীণ আশা নিয়ে উপস্থিত হত সে এই শালবনের ধারে। সে আশাও আজ তিরোহিত হল। এমন সুন্দর মেয়ের মুখে এ ধরণের উক্তি অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় তার কাছে। তবু তা সত্যি।

নিজেকে সামলে নেয় ডুইঃ। সতেরখানি তরফের চার সর্দারের এক সর্দার সে। সামান্য এক মেয়ের জন্যে এতখানি কাতর হয়ে পড়া তার পক্ষে সাজে না। আঘাত যা পেল,—সে আঘাত মনেই চেপে রাখতে হবে। যে ঘা এখন থেকে দগদগ করবে মনের ভেতরে, তার নিদারুণ ব্যথা প্রকাশের জন্যে বাইরে আর্তনাদ করার সুযোগ হবে না কখনো। সান্ত্বনা যে এতে একেবারে নেই, তা নয়। সে হারলেও জিতে গেল তারই একমাত্র বন্ধু বাঘরায়—যার জন্যে জীবন দিতে পারে সে। নিজের জীবনকেই যদি দেওয়া যায় ছুট্‌কীকে কেন পারবে না দিতে? কিন্তু সত্যিই কি তাই? সে উপলব্ধি করে নিজের জীবনের মূল্য নিজের প্রিয় বস্তুর চেয়ে অনেক কম।

—চলি ছুট্‌কী। ম্লান হেসে ডুইঃ বলে—আর কখনো ফুল তুলতে এসে বাড়ী ফিরতে তোমার দেরী হবে না। জোর করে গানও শোনাব না।

ধীরে ধীরে শালবনের মধ্যে অদৃশ্য হয় ডুইঃ।

ছুট্‌কীর চোখ জলে ভরে আসে। কিতাডুংরির দিকে চেয়ে সে ভাঙা গলায় বলে—তুমি তো সব জান কিতাপাট। আমাকে ক্ষমা কর। ডুইঃকে সান্ত্বনা দিও। ভুলিয়ে দাও তার আঘাত।

পরদিন বাঘরায় সোরেণের সংগে দেখা হয় ছুট্‌কীর।

—যাক্, এসে গিয়েছ। আর একটু দেরী হলে এই বনের গাছগুলো আর দেখতে না।

—কেন, কি হল! ছুট্‌কী অবাক হয়।

—সব গাছ উপড়ে ফেলতাম। এখন থেকে বসে আছি নাকি!

—সকাল থেকে?

বাঘরায় হো হো করে হেসে ওঠে—সতেরখানির সর্দাররা কি অত ফেল্না? তাদের কত কাজ। সামান্য এক মেয়ের জন্যে অত সময় নষ্ট করার সময় কোথায়?

—আমি সামান্য?

—কে বলল সে কথা? বাঘরায় ঘাবড়ায়।

—তুমিই তো বললে।

—না না। আমার কাছে তুমি অসাধারণ। কিন্তু সতেরখানির তুলনায়?

—সাধারণ। কৃত্রিম গাম্ভীর্যে ছুট্‌কীর মুখ থমথম করে।

—এই দেখো। রাগ করলে? আর কখনো বলব না। মারাংবুরুর শপথ করছি।

—চুপ। ছুট্‌কী আঁতকে ওঠে।

—কেন?

—ও নাম মুখে আনো কেন? ভয় করে।

কিছুটা পথ এগিয়ে যায় তারা। কেউ আর কথা সুরু করতে পারে না। মনে মনে আফশোষ করে বাঘরায়—কুক্ষণে মারাংবুরুর নাম মুখে আনতে গিয়েছিল।

শেষে একসময়ে ধীরে ধীরে প্রশ্ন করে বাঘরায়—ডুইঃ এসেছিল?

—হ্যাঁ। কালকে।

—ও।

—কেন? কিছু বলেছে? ছুট্‌কীর চোখে আগ্রহ।

—না। আজ সকালে শিকারে চলে গেল। বাঘ না মেরে ফিরবে না।

—কাকে সংগে নিল।

—একা।

—একা বাঘ মারা যায় নাকি?

—ডুইঃ পারে।

বন্ধুর ওপর অগাধ বিশ্বাসটুকু ছুট্‌কী লক্ষ্য করে। সে ভেবেছিল,

কালকের ঘটনা বলবে বাঘরায়কে। কিন্তু তাতে সে শুধু আঘাতই পাবে। ডুইঃ যে কেন হঠাৎ শিকারে চলে গেল একথা জলের মতই স্পষ্ট বলে মনে হচ্ছে তার কাছে। অথচ বাঘরায়কে বলার সাহস হল না তার।

—ডুইঃ একটা পাগল। অতবড় চেহারা, অমন সাহস—শক্তিও কত। কিন্তু সব সময় কিসের স্বপ্ন দেখে। আর গান বাঁধে।

—সত্যিই কি ওর নিজের তৈরী গান?

—হ্যাঁ। আমিও বিশ্বাস করতাম না আগে। তোমাকে শুনিয়েছে?

—অনেক। ছুট্‌কী অন্যমনস্ক হয়।

—ডুইঃ নিজের বাঁধা গান ছাড়া গায় না।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে ছুট্‌কী। কালকের চোখের জল আজকেও আবার যেন বার হয়ে আসতে চায়। ব্যথা অনুভব করে কিন্তু সে অসহায়। কিতাপাট জানেন তার মন। তবু বন্ধুগর্বে গর্বিত বাঘরায়েব উজ্জ্বল চোখের দিকে চেয়ে সে কেঁদে ফেলে।

—ওকি কাঁদছ কেন?

—ওকে ফিরিয়ে দিয়েছি। শিকারে ও সেই জন্যই গিয়েছে। এখানে থাকতে পারছে না।

—তবে তুমি—

—হ্যাঁ। তোমাকে—

—ডুইঃএর ভাগ্য খারাপ। বাঘরায় আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। দূরে খাঁড়ি পাহাড়ির ওপর জমাট কালো মেঘ। এগিয়ে আসছে বাটালুকার দিকে। কিছুক্ষণ পরেই সুরু হবে শালগাছের দাপাদাপি। গাছ ভাঙার শব্দে। ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে লতাপাতা, পাখীর বাসা—
—মরবে সাজারু, মরবে সাপ, ইঁদুর।

মেঘ দেখে চিনতে পারে বাঘরায় তার ধরন। সে ছুট্‌কীর হাত চেপে নিজের কাছে টেনে আনে।

—ঝড় আসছে।

—হুঁ। ছুট্‌কী বাঘরায়ের একেবারে কাছ ঘেঁষে দাঁড়ায়। তার মাথা বাঘরায়ের বুক স্পর্শ করে।

—আজ আর কিতাপাটের মন্দিরে যাওয়া হবে না। গেলে ভাল হত। ডুইঃএর জন্যে প্রার্থনা করতাম। আমাদের জন্যেও—

বাঘরায় অভাবনীয় আনন্দের মধ্যেও দুঃখ অনুভব করে। নিজেকে কখনো ডুইঃএর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে ভাবেনি—এখনো ভাবে না। অথচ জিতল সে।

শালবনের মাথা ধীরে ধীরে নড়ে ওঠে। দূত পাঠিয়েছেন পবন দেব। শুকনো পাতা ঝরতে সুরু করে।

—বাড়ী যাও ছুট্‌কী।

—তুমি ?

—আমি যাচ্ছি খাঁড়ি পাহাড়ির দিকে। ডুইঃকে খুঁজতে হবে।

—সেকি ? ভীষণ ঝড় উঠছে। দেখছ না কিরকম পাক খেতে খেতে এগিয়ে আসছে মেঘ ?

বাঘরায় হাসে—ডুইঃও তো পড়বে এই ঝড়ের মুখে।

ছুট্‌কী চুপ করে থাকে।

নাচন সুরু হয় সারা বনস্থলীতে। শুকনো পাতা ঘুরতে ঘুরতে আকাশে ওঠে। লালমাটিতে চারদিক ছেয়ে যায়। কিতাডুংরি পাহাড় আর দেখতে পাওয়া যায় না। বন্য জন্তুরা ছুটে চলে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। উড়ন্ত পাখীরা আছড়ে পড়ে গাছের ডালে।

ছুট্‌কী বাঘরায়ের হাত শক্ত করে চেপে ধরে বলে—কিতাপাট সাক্ষী—তুমি ছাড়া আমার আর কিছু নেই।

—জানি, তবু আমাকে যেতে হবে ছুট্‌কী। আমার বন্ধুও আছে।

ধূলোর ঘূর্ণীর মধ্যে মিলিয়ে যায় বাঘরায় সোরেণ।

ছুট্‌কী স্তব্ধ হয়ে সেদিকে চেয়ে থাকে।

বাঘ শিকার করা হয়নি ডুইঃএর। আঘাতের প্রথম চোটে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল সে। বন্ধুর সুখের পথে কাঁটার মত বিরাজ করা লজ্জাকর বলে মনে হয়েছিল তার কাছে। আশু উপায় উদ্ভাবনের জন্য পাগল হয়ে ঘর ছেড়ে এসেছিল সে। সংগে অবশ্য লোক দেখানো তীর ধনুক আর বল্লাম নিতে ভোলেনি।

দুইদিন উদ্‌ভ্রান্তের মত চলতে চলতে সে এসে পৌঁছেছিল আমদা পাহাড়ি গ্রামে। তবুও সমস্যার সমাধান হয় না। বরং যত ভাবে ততই মনে হয়, বাটালুকা ছাড়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। সতেরখানি তরফকে

সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। রাজার পাশে পাশেই থাকতে হবে তাকে আজীবন। অথচ তারই সামনে বাঘরায় আর ছুট্‌কী ঘুরে বেড়াবে একসংগে হাত ধরাধরি করে—উৎসব পার্বনে কোমর জড়িয়ে ধরে পরম পরিতৃপ্তিতে নাচবে—এও যে অসহ্য। হ্যাঁ, অসহ্য। বন্ধুত্বের মর্যাদা দিয়েও একথা সে মন থেকেই বলতে পারে। ছুট্‌কীকে পর বলে ভাবতে তার প্রাণটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে ওঠে। যদিও বাঘরায়ের ওপর কিছুমাত্র ঈর্ষাও নেই তার।

ডুইঃ একটা পলাশ গাছের গোড়ায় বসে ভেবে চলে। দুদিন কিছু খাওয়া হয়নি তার। থলির ভেতরে করে শূয়োরের মাংস নিয়ে আসার কথা মনেও হয়নি।

পেছন ফিরে খাঁড়ি পাহাড়ির দিকে দৃষ্টি ফেলে। অনেক দূরে—ঠিক মেঘের মত দেখাচ্ছে ওর চূড়াটা। তারও আগে বাটালুকা। এই দুপুরে ছুটকী কি করছে? গরুকে খেতে দিচ্ছে হয়ত। কিংবা ঘরের দেয়ালে আলপনা আঁকছে। জল আনতেও ছুটতে পারে। কাজ না পেলেই জল আনার অছিলায় বাড়ীর বাইরে চলে আসে সে। শালবনের ধার দিয়ে ছোট ঝরণাটার পাশে এসে বসে থাকে চুপ করে।

ভাবতে গিয়ে বুকের ভেতরে ধ্বক্ ক'রে ওঠে। বাঘরায় হয়ত গিয়ে মিলেছে ঝরণার ধারে ছুট্‌কীর সংগে। তার সম্বন্ধেই হয়ত কথা বলছে দুজনা। ছুট্‌কী নিশ্চয়ই সব বলেছে। বাঘরায়ও বুঝেছে যে সে পালিয়ে এসেছে।

হঠাৎ দূরের একটা টিলার দিকে দৃষ্টি পড়ে ডুইঃএর। মানুষের ভীড় সেখানে। একটা তাঁবুও পড়েছে। চমকে ওঠে সে। একি যুদ্ধের আয়োজন—কিংবা উৎসব? এতবড় উৎসব হলে বাটালুকায় নিশ্চয়ই খবর পৌছত। রাজার অজ্ঞাতে কোন উৎসবই হতে পারে না। তাছাড়া এরা তাঁবুই বা পেল কোথায়? কিতাগড় ছাড়া সতেরখানিতে তাঁবু নেই।

তীব্র কৌতূহল নিয়ে এগিয়ে যায় ডুইঃ। পথে একজন লোক একমনে বসে ধনুকের ছিলা তৈরী করছিল। ডুইঃ তার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

—বসো। লোকটি গম্ভীরভাবে বলে। ডুইঃএর দিকে চাইবার প্রয়োজন বোধ করে না সে।

—ওখানে ভীড় কিসের ভাই?

লোকটি কোন কথা বলে না। চুপচাপ নিজের কাজ করে চলে।

—আমার কথাটা শুনলে ? ডুইঃ আবার বলে ওঠে।

তবু নিরুত্তর লোকটি। ছিলাটা মোলায়েম করার জন্যে খুব সূক্ষ্মভাবে হাত চলায় সে—যেন একটা কবিতা রচনা করছে। পাশে ধনুক ছিল। ডুইঃ সেদিকে চেয়ে দেখে। একটু আশ্চর্যই হয় সে। এত নিপুণ কাজ এই প্রথম দেখল। কিতাগড়ের অস্ত্রাগারেও এমন জিনিষ আছে বলে মনে হয় না। একে বাটালুকায় নিয়ে যেতে পারলে রাজা ত্রিভন সিং নিশ্চয়ই খুব খুশী হবেন। এ-যুগের অর্জুন তিনি—ডুইঃএর সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। ধনুক তৈরীর এমন লোক পেলে রাজা মাথায় করে রাখবেন।

কিন্তু বাটালুকার কথা মনে হতেই ছুটকীর কথা বিরাট পাথরের মত তার মস্তিষ্ককে আবার চেপে ধরে। মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে তার। খাঁড়ি পাহাড়ির ওপরে গিয়ে, সেখান থেকে যদি লাফিয়ে পড়া যায় তাহলে মৃত্যু অনিবার্য—কিন্তু তাতে ডুইঃ টুডুর নাম ডুবেবে। সর্দারের মৃত্যু ওভাবে হওয়া উচিত নয়। সুবর্ণরেখায় ডুবেও নয়।

লোকটি ছিলা প্রস্তুত করে ধনুকের সংগে বাঁধে। ডান হাতের আঙুল দিয়ে একটা টংকার দেয়। শেষে আড়মোড়া ভেঙে আরামসূচক একটা শব্দ ক'রে বলে—কি বলছিলে ? ভীড় ? তোমার কি মনে হয় ?

ডুইঃ অবাক হয়। লোকটা তবে কালা নয়। কাজের সময়ে কথা বলাকে প্রয়োজন বলে বোধ করে না। স্বয়ং রাজা এলেও হয়ত বলত না।

সে প্রশ্ন করে—মহুয়া উৎসব নাকি ?

—আর কিছুদিন যাক্, টের পাবে কিসের উৎসব।

—তার মানে ?

—নাগা সন্ন্যাসী। লোকটি পাশ থেকে একটা তীর তুলে নিয়ে ধনুকে লাগিয়ে ওপরের আকাশে ছুঁড়ে দেয়।

ডুইঃ টুডু চমকে ওঠে। নাগাদের কথা সে আগেও শুনেছে। রাজা হেমৎ সিংএর আমলেও এসেছিল তারা। খুব ধুরন্ধর আর যুদ্ধবাজ। পাকাপোক্ত একটা মতলব নিয়েই আসে তারা। রাজ্য জয় করার উদ্দেশ্য হয়ত তাদের থাকে না। কিন্তু লুটপাটকে ব্রত বলে ভাবে। সেই সংগে কিছু কিছু স্ত্রীলোকও অদৃশ্য হয়। মন্দিরও গড়ে তোলে বিনা অনুমতিতে। তাতে প্রতিষ্ঠা করে বিগ্রহ।

ডুইঃ ভাবে বাটালুকা ছেড়ে যাওয়া ভাগ্যে নেই। ফিরতেই হবে। রাজার কানে পৌছে দিতে হবে দুঃসংবাদ।

—তুমি এদের কখন দেখেছ ভাই।

—এই তো ভোরবেলা। রাত্রে গা-ঢাকা দিয়ে এসেছে ব্যাটারা। ওদের দেখেই তো ধনুক তৈরী করতে বসেছি।

—অতক্ষণ ধরে একটা ধনুক তৈরী করে লাভ? এখন যে অনেক ধনুকের প্রয়োজন।

—তাও পারি, কিন্তু আমার একার জন্যে একটাই যথেষ্ট। এই যে রাস্তা দেখছ, গাঁয়ে যাবার এটাই একমাত্র পথ। ওই যে শালবন দেখা যাচ্ছে, রাতেরবেলায় ওরই একটার মাথায় উঠে বসে থাকব। কোন কুমতলবে যদি গাঁয়ে যাবার জন্যে পা বাড়ায় ওরা তাহলে একজনকেও আর আস্তানায় ফিরে যেতে হবে না।

—কিন্তু একা কতক্ষণ ঠেকাবে?

—যতক্ষণ পারি। লোকটি উদাস স্বরে বলে।

—তার চাইতে চল না আমার সংগে কিতাগড়ে। আরও অস্ত্র তৈরী করে দেবে তুমি। চোয়াড় দলের হাতে শোভা পাবে সে-অস্ত্র। তোমার ধনুকের টংকারে নির্মূল হবে এরা।

—ইচ্ছে হয়। কিন্তু তা যে সম্ভব নয় সর্দার।

—আমাকে চেন তুমি? বিস্মিত ডুইঃ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

—হাঁ। কিতাড়ুংরির উৎসবে দেখেছিলাম একবছর আগে। তুমিই না ধমকে উঠেছিলে আমার চোখে জল দেখে।

—ঠিক মনে পড়ছে না। ডুইঃ ভাবতে চেষ্টা করে।

—পড়বে না মনে। সামান্য ঘটনা কিনা। কিন্তু রাজার সেই বিচার আমার বুক ভেঙে দিয়েছে। ঝাঁপনী এখন বাটালুকায় সংসার পেতেছে। সেখানে কি যেতে পারি আমি? এখনো তো পাথর হয়ে যাইনি।

—সব কথা খুলে বল ভাই। রাজার কোন্ বিচার তোমার জীবনকে মাটি হতে দিল।

—সে বিচারেই রাজার হাতে খড়ি। আমি রান্‌কো কিস্‌কু। ঝাঁপনী আমারই ঘরে ছিল। সেখান থেকে, আমার বুক থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল ওরা। আমি ঘর ছাড়লাম।

এবারে ডুইঃএর মনে পড়ে। একবছর আগের ঘটনা হ'লেও রাজা ত্রিভনের প্রথম বিচার বলে সে ভুলে যায় নি। রান্‌কো কিস্‌কুর সেদিনের মুখ তার স্পষ্ট মনে আছে। তারুণ্যে ঢলঢলে ছিল সে মুখ—চোখে সব কিছু অস্বীকার করার চাহনি। উদ্ধত মস্তকের ঝাঁকড়া চুল বারবার কেঁপে উঠেছিল। আরও মনে পড়ে তার অসহায় কান্নার কথা। চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়েছিল রান্‌কোর—সে কান্না ডুইঃএর কাছে কাপুরুষোচিত বলে বোধ হয়েছিল। সতেরখানির মূর্তিমান কলংকের দিকে চেয়ে তার মস্তকে আগুণ জ্বলেছিল। সেদিন তার চিৎকার কিতাডুংরির মন্দিরে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরেছিল।

আর আজ? আজতো রান্‌কোকে কাপুরুষ বলে মনে হচ্ছে না। শুকনো মুখ থেকে তারুণ্যের শেষ চিহ্নটুকুও যেন অদৃশ্য হয়েছে। চিনতে কষ্ট হয়েছে তাই। কিন্তু সে মুখের প্রতিটি রেখায় আঁকা রয়েছে এক বিরাট নিভৃত সাধনার স্বাক্ষর।

ডুইঃএর বুকের ভেতরে বাষ্প জমে ওঠে। সে রান্‌কোর হাত দুটো চেপে ধরে বলে, আমাকে ক্ষমা কর ভাই।

—সে কি সর্দার! ক্ষমা কেন?

—সেদিন তোমার চোখের জল দেখে আমি সহ্য করতে পারিনি। আজকে আমার চোখও শুকনো নেই।

রান্‌কো সর্দারের মুখের দিকে ক্ষিপ্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করে। তাইত—এ মুখ তো তার অজানা নয়। কিছুক্ষণ ঝিম্ ধরে বসে থাকে সে। চেয়ে থাকে একটা উড়ন্ত বহুম্ বারাড়িংএর দিকে। কাছের দুধিলোটা আর দাত্‌রার ঝোপের মধ্যে সে মধুর লোভে ঘুরে ঘুরে মরছে।

বহুক্ষণ সেদিকে চেয়ে থেকে সে ডুইঃএর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে ম্লান হেসে বলে—বুঝেছি সর্দার।

ডুইঃ রান্‌কোর ধনুকটা দৃঢ়ভাবে ধরে বলে—তবু আমি ফিরে যাচ্ছি বাটালুকায়। দেশের কাছে আর সবই যে তুচ্ছ। তোমাকেও যেতে হবে তাই। 'না' বলো না।

মাথার খোঁপায় গুলাঞ্জের বাহার। বাহুতে বকুল ফুলের বালা, গলায় হাতির দাঁতের মালা—করপল্লবে ধরা রয়েছে প্রস্ফুটিত পদ্মায়নী।

অপেক্ষা করছে লিপুর—তীব্র ব্যাকুল অপেক্ষা। নতুন নাম রাখবে ত্রিভন—সেই নামেই ডাকবে তাকে।

সূর্যের তেজ ধীরে ধীরে কমে আসে। শালগাছের ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়। লিপুর অপেক্ষা করে তবু। শালবনের মর্মর ধ্বনিতে যেন কান্নার আওয়াজ শুনতে পায় সে। পরায়নীর সতেজ মৃণাল অনেকটা হেলে পড়েছে, বকুল ফুলের সাদা রঙ ধীরে ধীরে হলদে হয়ে উঠছে। মাথায় চাঁপা ফুলের আগের গন্ধ আর নেই। লিপুরের পা ব্যথা করে। আর কতক্ষণ? চকচকে কালো পাথরটার ওপর হেলান দেয় সে। পিতামহীর রেশমের পুরানো ওড়না দিয়ে আলগোছে মুখের ঘাম মুছে ফেলে। বড় যত্নের ওড়না। খাঁড়েপাথরের রাণী ওটা উপহার দিয়েছিলেন পারাউএর পুত্রবধূকে।

সে বোধহয় আর আসবে না। এই একবছরে কখনো এমন হয়নি। কথা দিয়ে সে কথা রেখেছে। ঠিক যে সময়টিতে আসবে বলেছে, তখনি ঘোড়ার খুরের শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়েছে কাঁটারাঙ্গার পাথরে পাথরে।

নতুন নাম রাখার মানে লিপুর জানে। শুকোলের দিদির কাছে একবার গল্প শুনেছিল—তখন জেনেছে। অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতেই নারীকে নতুন নাম দেয় পুরুষ। সে অধিকারের একমাত্র পরিণাম পরিণয়।

সেদিন বোধহয় খেয়ালের বশে কথা দিয়ে ফেলেছিল ত্রিভন। পরে নিশ্চয়ই ভেবে দেখেছে। বুঝতে পেরেছে, এ অসম্ভব। কোন চোয়াড় সর্দারের বাড়ীর মেয়ে রাণী হতে পারে না—অন্ততঃ হয়নি কখনো। তাছাড়া নরহরি বাবাজীকে বলতে শুনেছে সে, ধাদ্‌কা আর পঞ্চসর্দারী তরফের রাজার কাছ থেকে প্রতি মাসেই দূত আসছে উপঢৌকন নিয়ে। দুই রাজারই মেয়ে রয়েছে।

অনুশোচনা হয় লিপুরের। ভুল করেছে সে। কিন্তু সে তো জানত না যে রাজার ছেলে বাঁশী বাজায়। তবু কিতাডুংরির সেই উৎসবের পর থেকে সে তো চেয়েছিল নিজেকে এই কালো পাথরের কাছ থেকে সরিয়ে নিতে। ও-ই হতে দেয় নি। রাজার মত মেজাজ না দেখিয়ে আগের মতই পাগলামী সুরু করেছিল। ভালই লেগেছিল সেদিন। কিন্তু এই ভাললাগাটাই যে শেষ কথা নয়—সেটুকু বুঝবার মত বুদ্ধি তখনো হয়েছিল না তার। আজ হয়েছে। এ-ভালো লাগা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে

হলে আত্মহত্যা ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই। দিনের পর দিন ঘোড়ায় চড়া শিখতে, ধনুক-হাতে তীর নিক্ষেপ করতে, ঘর্মাক্ত রাজার মুখ মুছিয়ে দিতে যে উষ্ণ পরশ সে পেয়েছে, সে-উষ্ণতা তার রক্তের সংগে অবিচ্ছেদ্য-ভাবে মিশে গিয়েছে। দেহের রক্ত ঠাণ্ডা হিম না হয়ে গেলে তা থেকে পরিত্রাণ নেই।

—এত তন্ময় ?

চমকে ঘাড় ফেরায় লিপুর। ত্রিভন হাসছে।

—ঘোড়া কই ? গলা কেঁপে ওঠে লিপুরের।

—আনিনি।

—আমাকে জব্দ করতে ?

—ছিঃ। আজকের দিনে !

—সত্যিই নতুন নামে ডাকবে আমায় ?

—হ্যাঁ, ধারতি ?

—ধারতি ?

—কেন, পছন্দ হলো না !

—তুমি যে নামে ডাকবে—তাই পছন্দ। লিপুর হাতের পরায়নীর পাঁপড়ি গোনে।

ত্রিভনের বুকের ভেতরে আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। এই মুহূর্তে যে-ভাবে কথা বলল লিপুর, এতদিনের পরিচয়ে সে-ভাব প্রকাশ পায়নি কখনো। সে চেয়ে দেখে কিশোরীর কালো মুখে লজ্জা-মধুর হাসি। জীবনে হঠাৎ একটা বড় ধাপ এগিয়ে না গেলে কিশোরীর মুখে এমন হাসি ফোটে না।

মুখ নীচু করে লিপুর। ত্রিভনের উজ্জ্বল পাদুকা তার দৃষ্টিতে পড়ে। অপূর্ব ভংগীতে মাটিতে লুটিয়ে সে পাদুকা জোড়ায় মাথা ছোঁয়ায়। হাতের পরায়ণী রাখে সেখানে। দুটি গুলাঞ্চ খসে পড়ে মাথা থেকে।

ত্রিভন দুহাতে উঠিয়ে নেয় লিপুরকে। পদ্মফুলটি আবার তার হাতে তুলে দেয়। খসে-পড়া চাঁপা দুটি সযত্নে গুঁজে দেয় তার খোঁপায়। মিষ্টি হেসে বাহুর বকুল ফুলের বালা মৃদু স্পর্শ করে। ঝুঁকে প'ড়ে তার ঘ্রাণ নেয়।

হঠাৎ ছিট্‌কে দূরে সরে যায় আজকের ধারতি। ত্রিভনের নতুন স্পর্শে সে যেন প্রথম সত্যের আলো দেখতে পেল। চোখে মুখে ফুটে

ওঠে নিদারুণ আতঙ্ক আর অসহায়তা। ত্রিভন রাজ—সতেরখানি তবক তার রাজ্য। সে তো সত্যিই কাঁটারাঙ্গার বাঁশীওলা নয়। তবে? তিনপুরুষ আগের এক সামান্য সর্দার বংশের মেয়েকে সে যদি নিজে থেকে একটা নামও দেয়। তার অর্থ কি আরও গভীর হতে পারে? না—না—এ মারাত্মক ভুল। এই ভুলকে মেনে নিয়ে কৃতার্থ হয়ে সে কি শুধু আজীবন কোন নাম-না-জানা লোকের সন্তান মানুষ করতে করতে আজকের ঘটনা স্মরণ করবে? না।

ত্রিভন? সে তো রাজা। রাজাদের কত খেয়ালই হয়। অনুগ্রহ করে নতুন নাম দিয়েছে তাকে। এর চেয়ে গভীর ভাবে কিছুই হয়ত তলিয়ে দেখেনি। নাম রেখে সে যে সূচনার সৃষ্টি করল, তার পরিণতির কথা নিশ্চয়ই ভাবে নি। রাজবংশের কেউ কখনো তা ভাবে না।

লিপুবের মনের মধ্যে চিতা জ্বলে। ফাঁড়ি পাহাড়ির অরণ্যে যখন দাবানল জ্বলে উঠবে তখন তার মধ্যে নিজেকে সঁপে না দিলে এ আগুন নিভবে না।

ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে সে।

—কি হল ধারতি? ত্রিভন বিহ্বল।

—কেন দিলে এই নাম। কি করব এ নিয়ে আমি? কোথায় যাব?

—কোথাও না।

—তবে? কেমন করে আমি সহ্য করব?

—আমি যেমন করে সইব। হাসি ফোটে ত্রিভনের মুখে।

—তুমি রাজা। তোমার রাজ্য আছে, চোয়াড় আছে—যুদ্ধ আছে। তোমার কত কাজ। তুমি রাণী পাবে—রাজারা মেয়ে দেবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছেন। আমি কি করব?—জল-ভরা চোখে সে ত্রিভনের দিকে চায়।

—তুমি? তোমার ঘর আছে—ঘরের কাজ আছে। তোমার কুঙ্‌কী আছে—যদিও সে অনেক বড়ো হয়েছে। এছাড়া আরও একটা জিনিষ আছে। পারাউ সর্দারকে কেউ আগে থাকতেই বলে রেখেছে নিশ্চয়ই তোমার জন্যে।

কঠিন সত্যি কথা বলে দিয়েছে রাজা ত্রিভন সিং ভূঁইয়া। বাঁশীওলার

কাছে এমন কথা শুনতে পাওয়া সম্ভব নয়। লিপুরের পা কাঁপতে থাকে। স্বপ্নকে স্বপ্ন বলে জানতে শুরু করেছিল মাত্র সেদিন থেকে—যেদিন বুঝল ত্রিভনের প্রতি তার আকর্ষণের একটা গভীর দিক রয়েছে। তবু ত স্বপ্নকে ভাঙতে দিতে চায়নি। নিজেকে ফাঁকি দিয়ে হয়ত মনে একটা আশা পোষণ করত—স্বপ্নও তো সত্যি হতে পারে।

আজ বুঝল, তা হয়না। যা সত্যি তাই সত্যি। দিনের আলোর মত নির্লজ্জ স্পষ্ট। শালগাছের দোদুল্যমান পাতা সে আলোতে লুকোচুরি খেলতে সাহস পায় না। কাঁটারাঙ্গার শেষ প্রান্ত থেকে সুরু হয়েছে যে কঠিন অনুর্বর বিস্তীর্ণ মাঠ, তাতে সূর্যের আলো পড়ে যেমন কোন বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে না—এও তেমনি।

লিপুর হাতের পরায়নী ফেলে দেয়। মাথার চাঁপাফুল তুলে নিয়ে পাগলের মত ছিটিয়ে দেয় চারদিকে। কাজ নেই গুলাঞ্চের বাহারে। বকুলের বালা খুলতে খুলতে যখন সে ছুটতে সুরু করে তখন ত্রিভন দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরে ফেলে।

—না—না। আমি পারব না। আমাকে মরতে দাও।

—তুমি একেবারে পাগল ধারতি।

—ছেড়ে দাও, তোমার পায়ে পড়ি।

—কেন? ত্রিভন আরও শক্ত করে চেপে ধরে তাকে।

—আমাকেও যে তাহলে মরতে হয় ধারতি।

—কেন? ছিঃ, তুমি সুখে থাক।

—তুমি ছাড়া সুখ কই?

—এ তো দু'দিনের জন্যে।

—দু'দিন পরেও। চিরকাল—। ত্রিভনের চোখ নেমে আসে ধারতির চোখেরও পর।

—ন্-না। মনের সমস্ত শক্তি দিয়ে অস্বীকার করতে গিয়ে সে অবসন্ন হয়ে পড়ে। চোখ ছাপিয়ে নতুন করে জল গড়িয়ে পড়ে।

—ধারতি, তুমি কি আমাকে নতুন করে চিনছ?

বুক চিরে ধারতির দেখাতে ইচ্ছে করে ত্রিভনকে সে চেনে কিনা। কিন্তু সবার ওপর সে রাজা। তাই তো গোলমাল হয়ে যায়।

ময়ূরের ডাক ভেসে আসে দূর থেকে। কাঠঠোকরা পাশের পলাশ

গাছটাকে অবিশ্রান্তভাবে ঠুকে চলেছে। রৌদ্র সরে গিয়ে দূর প্রান্তরের গাছগুলোর মাথায় রাঙা হয়ে আটকে রয়েছে।

ধারতি ধীরে ধীরে বলে—চিরকাল ?

—হ্যাঁ ধারতি।

—কিন্তু তা যে হয় না।

—হয় না বলো না—হয়নি। এবারে হবে।

—সবাই যে তোমাকে পাগল বলবে।

—বলুক।

—তোমার বিরুদ্ধে যাবে তরফের সবাই।

—না। তারা বুঝবে আমি তাদেরই মতন। রাজা হয়ে সিংহাসনে বসে দেবতা হয়ে যাইনি।

—কি জানি। আমার ভীষণ ভয় করছে।

—ভয় ? আনন্দ হচ্ছে না ?

—তোমার যদি কোন অনিষ্ট হয় ?

ত্রিভন হাসে। বলে—তুমি আছো। তুমি রক্ষা করবে। সবই তো শিখিয়েছি তোমাকে।

—আমি বুঝি সবার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারি।

—দরকার হলে পারবে না ?

ধারেতির মুখে কেমন পাহাড়ী কঠোরতা দেখা যায়—প্রপাতের মত যা সুন্দর অথচ ভয়ংকর। সে দূরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ধীরে ধীরে বলে—পারব।

সন্ধ্যা নেমে আসে। বাড়ীর কথা মনে ছিল না ধারতির। বৃদ্ধ পারাউ হয়ত নিজেই কুঙ্‌কীকে টেনে উঠোনে এনেছে। গেল বছরের লাল রঙের বাছুরটা মরে যাবার পর কুঙ্‌কীর আর বাচ্চা হয় নি। পারাউ বলে, আর নাকি হবে না—বয়স নেই। কুঙ্‌কী বুড়ো হয়েছে। তার কালো গায়ের অনেক লোম সাদা হয়ে গিয়েছে। আগের মত চকচকে কালো আর দেখায় না তাকে।

—ধারতি, এর পর কয়েকদিন আমাদের দেখা হবে না।

—কেন ?

—আমি বাইরে যাব। হয়ত যুদ্ধ করতে হবে।

—কোথায় ?

—আমদা পাহাড়ীতে পাঁচশ নাগা সন্ন্যাসী এসে উপদ্রব সুরু করেছে। ভাল কথায় তারা যাবে না। আমার অনুমতি না নিয়ে বাঁধ খুঁড়তে সুরু করেছে—অত্যাচার করারও চেষ্টা করছে। একি সহ্য করা যায় ?

—না। ধারতির কষ্ট হয় ত্রিভন চলে যাবে শুনে। কিন্তু যুদ্ধ করবে শুনে আনন্দ হয়। যুদ্ধবিগ্রহ অতি সাধারণ জিনিষ। এ সবে উৎসাহ দেওয়াই তাদের বংশের রীতি।

ত্রিভন ধারতির উত্তরে খুশী হয়। বলে তোমার কষ্ট হবে ?

—হুঁ। খুব।

—তবে যেতে বলছ যে ?

—যুদ্ধে যাবে না ? তাই হয় নাকি ? কিতাপাটকে প্রণাম করে যেও।

—তা যাবো। আমাদের কালাচাঁদ জিউকেও প্রণাম করব। কিন্তু তুমি আমাকে সাজিয়ে দেবে তো ?

ধারতির চোখে জল আসে। বলে—আমি যে গরীব। কোথায় পাব রাজার সাজ !

ত্রিভন অপ্রস্তুত। এমন জবাব পাবে আশা করেনি। দুহাত দিয়ে তার গাল দুটো চেপে ধরে বলে—এমনি ঠাট্টা করছিলাম। রাণী হয়ে সাজিয়ে দিও।

ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানায় ধারতি। তার মুখের দিকে চেয়ে আনন্দে ত্রিভনের বুক ভরে ওঠে।

—চল। বাড়ী যাবে।

কালো পাথর ছেড়ে দুজনে চলতে সুরু করে।

চোয়াড় বাহিনীর জৌলুষ দেখতে বাটালুকার অধিবাসীরা পথের দুধারে ভেঙে পড়ে। কিতাডুংরির পাহাড় থেকে যে যাত্রা সুরু হয়। অনেক পথ অতিক্রম করে আমদাপাহাড়ীতে তার শেষ হবে। কিতাপাটের মন্দিরে রাজ্যের ফুল এনে জমা করা হয়েছিল দেবতার পায়ে উৎসর্গের জন্য। সেই উৎসর্গীকৃত ফুল প্রতিটি চোয়াড়ের শিরস্ত্রাণ আর ঝাঁকড়া চুলে শোভা পায়। কপালে তাদের রক্ত চন্দনের ফোঁটা।

তাঁবু, খাদ্য আর হাণ্ডীর কলসী নিয়ে প্রথমে চলে ভারবাহীর দল। দলটা বেশ বড়। অন্য রাজ্য আক্রমণের সময়ে এ-সবের প্রয়োজন হয় না।—পথ চলতে চলতে লুণ্ঠন করে সংগ্রহ করাই চিরাচরিত নিয়ম। নইলে সৈন্যদলের দ্রুতগতি বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে—বিশেষ করে জংগল-মহলের এই অংশে। কিন্তু এ-যুদ্ধযাত্রা নিজেরই রাজ্যের মধ্যে নাগা সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে। লুঠপাটের প্রশ্ন ওঠে না এখানে। নাগারা বাইরের শত্রু। আমদাপাহাড়ীতে আস্তানা গেড়ে আশেপাশের অঞ্চলের দুর্গতি এনেছে ইতিমধ্যেই। রাজা ত্রিভনের সুস্পষ্ট নির্দেশ—দলের জন্যে যেন কাণাকড়িও চাওয়া না হয় সে অঞ্চলের লোকেদের কাছে। তাই এত আয়োজন।

ভারবাহী দলের পেছনে বল্লমধারী সৈন্যরা চলেছে হৈ-হল্লা করতে করতে। এদের দলপতি বাঘরায় সোরেণ। তারপরেই তীরন্দাজের দল। এদের হাতের অধিকাংশ ধনুকই নতুন। রান্‌কো কিস্‌কুর নিপুণ হস্তের ছাপ তাতে। তিনদিন তিনরাত্রি না খেয়ে সে একটানা খেটে সৈন্যদের চাহিদা মিটিয়েছে। চারজন লোক অবশ্য তাকে সাহায্য করেছে। কিন্তু সে সাহায্য শুধু আয়োজনের। আসল কাজ রান্‌কোর নিজের হাতের। পুরস্কারও সে পেয়েছে। কিন্তু বুক আগের মতই ফাঁকা তার। সৈন্যদের কেউ খোঁজ রাখে না—এমন কি রাজা ত্রিভনসিংও জানে না যে, নিস্পৃহভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করেও, রান্‌কো নিজের সৃষ্টি সৈন্যদের হাতে কেমন শোভা পায়, তা দেখার জন্যে ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে নেই। কিতাপাটের মন্দিরে যখন রাজ্যের সবাই সমবেত হয়েছিল—তার ঝাঁপানীও যখন অন্তঃসত্বা অবস্থায় অবাক বিস্ময়ে দেখছিল বিরাট সমারোহ, তখন রান্‌কো উদাসভাবে বাটালুকার পাথুরে মাটির পথ ধরে এগিয়ে চলছিল, সবকিছু পেছনে ফেলে সুবর্ণরেখার তীর বেয়ে।

তীরন্দাজের দলপতি ডুইঃ টুডু। হাতে ধনুক, পিঠে তূণ আর কোমরে তরবারি। প্রায় সবার কোমরেই তরবারি। অনেক সময়ে তীর ধনুক কোন কাজে লাগেনা, তখন তরবারি নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। নইলে যুদ্ধে জেতা যায় না।

রাজা ত্রিভন-সিং চলছিল সবার পেছনে ঘোড়ায় চড়ে সবকিছু লক্ষ্য করতে করতে। যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে সে-ই যাবে সবার সামনে। দলপতি সে। ত্রিভনের উন্নত বক্ষ গর্বে আরও স্ফীত।

ভীড়ের অধিকাংশই শিশু ও স্ত্রীলোক। সৈন্যদলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিও তাই পথের দুই ধারে। কোথাও আড়-চোখের চাহনি—মুচকি হাসি, কোথাও হাতের ইসারা। ত্রিভনের চোখ সবার ওপর ঘুরে ঘুরে ফিরছিল। শেষে এক মহুয়া গাছের গোড়ায় চোখ আট্‌কে যায় তার। ভীড়ের পেছনে সবার অলক্ষ্যে ধারতি দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে একাকী। ঘোড়ার পিঠ থেকে ত্রিভন দেখলেও পদাতিকদের নজর যাবার উপায় নেই সেদিকে। মালা হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে ধারতি। ত্রিভনের সংগে দৃষ্টি বিনিময় হতেই মালাটি গলায় পরিয়ে দেবার ভংগী করে নম্রভাবে প্রণাম করে সে। বুকের ভেতরটা দুলে ওঠে ত্রিভনের। এর চেয়ে বড় যুদ্ধসাজ সে চায়নি—কল্পনাও করেনি। তার মুখে হাসি ফোটে। ধারতির মুখেও সে হাসির সংক্রামণ। সে হাসিতে আনন্দের সংগে বিষাদও মাখানো রয়েছে।

ডুইঃ টুডুরও নজর পড়ে সামনের দিকের এক জায়গায়। ছুট্‌কী দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে। অপূর্ব সাজে সেজেছে সে। ডুইঃ লক্ষ্য করে, বল্লমধারী সৈন্যরা পাশদিয়ে যাবার সময় বাঘরায়কে দেখে হাতের ইশারা করে ছুট্‌কী। আর বাঘরায়ের পেশীবহুল হাতের বল্লমটা আকাশের দিকে অনেকটা উঠে যায়। বন্ধু তার ভাগ্যবান।

মাথা নীচু করে ডুইঃ। সবার মত জনতার দিকে উৎসুকভরা দৃষ্টি নিয়ে চাইবার কোন কারণ খুঁজে পায়না সে। এত লোকের মধ্যেও নিজেকে বড় একা মনে হয় তার। শুধু তাকেই উৎসাহ দেবার, অভিনন্দন জানাবার কেউ নেই। ছুট্‌কীর কাছ দিয়ে যাবার সময় তার বুকের ভেতরটা ঢিপ্‌ঢিপ্‌ করে। সে অন্যমনস্কের মত বিপরীত দিকে চেয়ে থাকে।

—সর্দার।

চমক লাগে ডুইঃ-এর। ছুট্‌কী ডাকছে। চোখাচোখি হয়।

—তোমাদের অপেক্ষায় থাকব সর্দার। ছুট্‌কীর কণ্ঠস্বর যেন ভেজা-ভেজা। এই আর্দ্র্তা নিশ্চয়ই বাঘরায়ের পাওনা। বড় বেশী কাতর হয়েছে ছুট্‌কীর মত শক্ত মেয়েও।

—আজকের দিনে অমন অভিশাপ দিওনা। সামনের দিকে এগিয়ে যায় ডুইঃ। ফিরে তাকায় না। তার কথায় ছুট্‌কীর মনে সাড়া জাগাবার কোন সম্ভাবনা নেই। তবু বিবেক তাকে বিব্রত করে। জবাবটা ওভাবে না দিলেও হত। বলতে পারত যে, বাঘরায়কে কখনো সে তার আগে বিপদের মুখে যেতে

দেবে না। ছুট্‌কীর কথা ভেবেই যে সে শুধু বাঘরায়ের নিরাপত্তা চায় তা নয়—বাঘরায় তার বন্ধু।

বনজংগলের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে একহাজার চোয়াড় বাহিনী যখন আচমকা এসে নাগা সন্ন্যাসীদের সম্মুখীন হল, তখন তারা সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত। তীরন্দাজের একঝাঁক তীর যখন তাদের কিছু লোককে আহত করল তখন তারা প্রথম বুঝল, যে আট দশজন নাগা বিচ্ছিন্নভাবে থেকে রাজসৈন্যের আগমনের ওপর নজর রাখছিল তারা কেউ-ই এই বন্য শিকারীদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। রক্ষা পেলে, এ-দুর্দশা হতো না। নাগা সন্ন্যাসীরা কৌশলী, বীর যোদ্ধা হলেও তাদের এ-অভিজ্ঞতা ছিল না যে জংগলমহলের অধিবাসীদের অনুভূতি হরিণের চেয়েও তীব্র, এদের চোখ বন্য বেড়ালের চেয়েও তীক্ষ্ণ। অরণ্যের সামান্য অস্বাভাবিকতাও এদের নজর এড়ায় না। তবু হয়ত এক-আধজন ঠিক সময়ে এসে খবর দিতে পারত। কিন্তু আশেপাশের অধিবাসীরা নতুন রাজার অভিযানের কথা শুনেছিল দূরের এক হাটে। সেখানে ঢাউরা দেওয়া হয়েছিল চোয়াড় বাহিনীতে যোগ দেবার জন্যে, তাই এই কয়েকদিন উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করছিল আর বাঘের মত অনুসরণ করছিল প্রতিটি নাগাকে। রাজার বাহিনী এগিয়ে এলেই তারা এক একজনকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে টেনে বার করে উন্মাদের মত পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। উন্মাদ তারা সাধে হয়নি। অজগর সাপের মতই নির্বিরোধী আর শান্ত তারা। কিন্তু পেটের ক্ষিদে আর অত্যাচার কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। নাগা সন্ন্যাসীরা যতদিন ধরে এসেছে—জোর করে লুণ্ঠন চালিয়েছে। মন্দির প্রতিষ্ঠা করবে নাকি তারা। ফলে এর মধ্যেই ঘরে ঘরে দেখা দিয়েছে খাদ্যাভাব আর হাহাকার।

তীরবিদ্ধ হয়ে কিছু লোক পড়ে যেতেই নাগারা বুঝল, তাদের প্রথম কর্তব্য হল উন্মুক্ত টিলা থেকে সরে গিয়ে কিছুর আড়ালে আশ্রয় নেওয়া। যুদ্ধকে তারা ভয় করেনা—ভালবাসে। সামনা সামনি যুদ্ধ করার নেশা যথেষ্ট রয়েছে তাদের। কিন্তু তীরের সামনে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা আর মৃত্যুকে আদরে আহ্বান করা একই কথা। তারা জানে আড়ালে গেলে চোয়াড়রা এগিয়ে আসতে বাধ্য হবে। তখন যুদ্ধে লাফিয়ে পড়া অনেক সহজ। তীরন্দাজের কোন কাজ থাকবে না সে সময়। দুই পক্ষ মিলে হবে একাকার। শক্তি পরীক্ষার প্রকৃত সুযোগ মিলবে তখন।

তবু দুশো গজ দূরে দণ্ডায়মান শত্রুসৈন্যের সংখ্যা দেখে তারা স্পষ্ট বুঝতে

পারে, তাদের দলের একটি প্রাণীও আর বেঁচে ফিরে যেতে পারবে না। ধনুক থাকলে তবু লড়া যেত। বল্লম আর তরবারি এমন কিছু সহায়ক হবে না। নাগা সর্দার অনুতাপে মাথার চুল ছেঁড়ে। এ তারই কর্মফল। সন্ন্যাসীর বেশে একবছর আগে এসেছিল সে এ-দেশে। তখন মারাংবুরুর পূজারীর কাছ থেকে জেনে গিয়েছিল যে নতুন রাজা শুধু বাঁশীই বাজায়। কিন্তু সে যে অসি ধরতেও সমান ওস্তাদ একথা কে জানত? মারাংবুরুর পূজারীও একথা জানত না। হিমৎ সিং ভুঁইয়ার মৃত্যুর পর ঝাটালুকার ঘটনার দ্রুত পট-পরিবর্তনের কোন সংবাদ সে রাখত না—রাখা প্রয়োজন বোধ করেনি। কাঁটারাঙ্গার শালবনের মধ্যে সে যখন কোন পাশবিক বৃত্তি চরিতার্থের জন্যে উন্মত্ত তখন গাছের আড়াল থেকে দেখেছিল ত্রিভনের হাতে বাঁশি—শুনেছিল তার সুর। আর দেখেছিল ত্রিভনের পাশে এক কিশোরীকে, রাঙামাটির ছাপ যার সর্বাংগে। মংগলের চোখ ধ্বক্‌ধ্বক্ করে উঠেছিল প্রতিহিংসায়। হেমৎসিং-এর কাছে হেয় হবার আগুন তখনো তাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারছে। তাই পিতার কর্মফল পুত্রের ওপরও যাতে অভিশাপের মত গিয়ে পড়ে তার জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে সে। দিকুদের চোখে আঙুল দিয়ে সে দেখিয়ে দিতে পারবে মারাংবুরুর হাতের শাস্তি কত ভয়ংকর—প্রত্যক্ষ। তবু সেদিন কিছু করতে সাহস পায়নি মংগল। তবে চেষ্টা ছেড়ে দিল না। তারই পরিণাম নাগা-সর্দারের সংগে সংযোগ স্থাপন।

কিছু ভুল হয়েছিল মংগলের। এতবড় একটা ষড়যন্ত্রের প্রস্তুতি হিসাবে আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল। তার কথায় বিশ্বাস করেই নাগা সন্ন্যাসীদের আজকের এই দুর্দশা। বাঁধ খননের জন্যে রাজার অনুমতির প্রয়োজন মনে করেনি তারা। এই অনুমতি না-চাওয়ার মধ্যে রাজাকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করার ইংগিত সুস্পষ্ট। ভেবেছিল, বাঁশীওয়ালা রাজা ভয় পেয়ে চুপ করে থাকবে। বিনা বাধায় উঠবে মন্দির—বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হবে। ধীরে ধীরে সতেরখানি তরফ নাগা-সর্দারের করতলে যাবে। তারপর ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে একদিন মারাংবুরুর সংগে সংগে মংগলকেও নিশ্চিহ্ন করে দিলেই হবে।

সন্ন্যাসী-সর্দার বুঝেছে কত বড় ভুল সে করেছিল। মংগলকে অভিশাপ দিতে দিতে নাগা-সন্ন্যাসীদের ডেকে সে বলে—প্রস্তুত হও। মরতে আমাদের হবেই। তবে শিয়ালের মত পালিয়ে যেতে যেতে মরব না। মারো আর মরো। আমাদের সম্মান রাখ। দেখাও এদের, দেবতার পূজা আর মন্দির প্রতিষ্ঠা করি যেমন, তেমনি বাহুবল আর সাহসেও কম যাইনে।

সন্ন্যাসীরা তরবারি নিয়ে হুংকার দিয়ে ওঠে। তারা বুঝতে পেরেছে, ভুল করে তাদের আগুনের মধ্যে এনে ফেলেছে সর্দার। কিন্তু এখন সে সমস্ত ভেবে লাভ নেই, সম্মানটাই বড় কথা।

সর্দার বলে—একচুল জায়গাও পেছু হটবে না। দাঁড়িয়ে লড়বে। দাঁড়িয়ে মরবে। মরার আগে ওদের অন্ততঃ দুজনকে খতম করা চাই। এই আমার শেষ আদেশ।

—আমাদের বিগ্রহ? ব্যাকুল হয়ে একজন প্রশ্ন করে।

—চুলোয় যাক বিগ্রহ! আমরা যদি মরি বিগ্রহও মরবে। কি হবে ভেবে! বৈষ্ণবদের মত হাহুতাশ করা তোমার মত নাগা সন্ন্যাসীর শোভা পায় না।

সর্দারের কথা প্রতিটি নাগার মস্তিষ্কে ঝংকার তোলে। সর্দার কি শেষে বিগ্রহের প্রতি অমর্যাদা দেখান?

দলপতি হয়ে দলের লোকের মনের অলিগলির সন্ধান জানা আছে সর্দারের। তার কথা সবার মনে কিভাবে কাজ করল মুহূর্তে বুঝে ফেলে সে। তাই কাষ্ঠ-হাসি হেসে বলে—দেবতাকে রক্ষা করবে মানুষ? তিনিই না রক্ষা করেন সমস্ত জগতকে। আজ তাঁরই জন্যে তোমরা ব্যাকুল হয়ে পড়ছ? তাঁর কি হবে সে খবর তিনি জানেন সবচেয়ে ভালই, তোমরা ভেবে কি করবে?

সন্তুষ্ট হয় সবাই। তিনশো তরবারি একসংগে ঝন্‌ঝন্‌ করে ওঠে।

ত্রিভন সিং এগিয়ে যাবার আদেশ দেয়। সহস্র তীর ছুঁড়েও আর কোন লাভ নেই।

বাঘরায় সোরেণ লাফিয়ে রাজার সামনে এসে বলে—আমাকে আগে যেতে আদেশ দিন রাজা। আমার দল নিয়ে ওদের সাবাড় করে দিয়ে আসি।

ডুইং টুডু বাঘরায়কে থামিয়ে চিৎকার করে ওঠে—কক্‌খনো না। আগে আমি যাব। রাজা বাঘরায়ের আগে আমাকে যেতে দিন।

ত্রিভন দুই বন্ধুর দিকে চেয়ে হেসে ওঠে—এখনো ঝগড়া সর্দার। চল একসংগে যাই।

প্রতিবাদ জানায় ডুইং—ক্ষমা করবেন রাজা। আমার কিছু বলার আছে।

—বল।

—শত্রু হলেও ওরা যোদ্ধা। শত্রুকে সামনা সামনি যুদ্ধের সুযোগ দেওয়াই তো বীর রাজার কাজ। জানি, আমরা ওদের পিষে মেরে ফেলতে পারি। তবু

ওদের বুঝতে দিন, সতেরখানির লোকেরা কাপুরুষ নয়। বছরের ছয়মাস আধ-পেটা খেয়ে থাকলেও শক্তিতে কম যাই না।

ত্রিভনের দৃষ্টিতে প্রশংসা ঝরে পড়ে। ডুইঃ-কে তার আলিংগন করতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু সময় বড় কম।

সে বলে—তাই হোক্। তাই হোক্। তুমি আগে যাও ডুইঃ—তোমার দল নিয়ে।

সম্মুখে তরবারি রেখে আভূমি নত হয়ে রাজাকে প্রণাম করে ডুইঃ। তার সারা মুখে ফুটে ওঠে বিজয়ীর হাসি। বাঘরায়ের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বলে—চলি ভাই।

—সে আবার কি কথা?

—এমনি বলছি। চোখের জল মুছে ফেলে ডুইঃ সবার অজ্ঞাতে।

সামনে এগিয়ে গিয়ে ডুইঃ তরবারি উঁচু করে ধরে—সূর্য্যের আলোয় সেটা ঝক্‌মক্ করে ওঠে। ইংগিত করে সে নিজের দলকে।

ত্রিভন আর বাঘরায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে ডুইঃ-এর দল এগিয়ে যেতেই নাগা সন্ন্যাসীরা তাদের আশ্রয় থেকে বার হয়ে আসে। অস্ত্রের ঝন্‌ঝনানি ছাড়া বহুক্ষণ আর কিছুই ঠাহর করা যায় না। ধূলোয় ছেয়ে যায় সেখানকার আকাশ। আহতদের আর্তনাদ বাতাসে ভেসে আসে।

—কিছুই বুঝতে পারছি না বাঘরায়। দুইদল মিশে যে একাকার হয়ে গেল?

—আমি যাব রাজা?

—না, অপেক্ষা কর। ডুইঃ ক্ষুণ্ণ হতে পারে।

বাঘরায় কিন্তু ছটফট করে। ডুইঃএর শেষ কথাটি যেন তার মনে সন্দেহের বীজ বুনে দিয়ে গিয়েছে। তাছাড়া বন্ধুর চোখে সে যেন জলও দেখেছে। হয়তো চোখের ভুল। হয়ত বা সূর্যের দিকে দৃষ্টি পড়ে অমন হয়েছিল। তবু অশান্ত হয়ে ওঠে সে। মনের মধ্যে এই ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার যে নিজের ওপর প্রতিশোধ নিতেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে ডুইঃ মরণের মুখে। বন্ধুর আনন্দের পথে কাঁটা হয়ে থাকতে চায় না।

—আমি যাই রাজা।

—না। ত্রিভনের স্বর দৃঢ়। দৃষ্টি তার যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে।

একজন চোয়াড়কে ছুটে আসতে দেখে তারা। ব্যাকুল বাঘরায় দৌড়ে যায় তার কাছে।

—কি খবর ?

—ভাল বলব কি খারাপ বলব বুঝতে পারছি না সর্দার।

হেঁয়ালী রাখ, তাড়াতাড়ি বল। চঞ্চল হয় বাঘরায়, চোয়াড়টি বলে—নাগারা প্রায় সবাই শেষ হয়েছে রাজা। একশো জনও বোধহয় বেঁচে নেই। কিন্তু আমাদের যে সর্বনাশ হল।

বাঘরায়ের হৃদ্‌পিণ্ড যেন থেমে যায়। দু'হাত দিয়ে নিজের বুক চেপে ধরে। না শুনেও সে বুঝতে পারে কী সে সর্বনাশ।

—কি হ'য়েছে। ত্রিভনের প্রশ্নে উদ্বেগ।

সর্দার ডুইঃ ঢুডুর ডানহাত কাটা পড়েছে।

বাঘরায়ের সামনে সমস্ত পৃথিবী ঘুরতে থাকে। সে বসে পড়ে মাটিতে।

কি করে হল ? ত্রিভন অবিচল।

—সর্দার যে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি নিজে হাতে কম করে তিরিশ জনকে মেরেছেন। শেষে নাগা সর্দারকে খুঁজে বার করার জন্যে ক্ষেপে উঠলেন। আমি পাশে ছিলাম সব সময়েই। বাধা দিয়েছিলাম—ফল হল না। নাগা সর্দারকে খুঁজে বার করলেন শেষ পর্যন্ত। মরবার আগে সে আমাদের সর্দারের ডান হাতখানা নিয়ে গেল।

বাঘরায়! ত্রিভন ডাকে।

—আমাকে একা যেতে দিন রাজা—আমি একাই যাই। বাঘরায়ের চোখের জল গড়িয়ে পড়ে।

—না, আমিও যাব।

চারিদিকে রক্তাক্ত মৃতদেহের মধ্যে ডুইঃকে পড়ে থাকতে দেখে বাঘরায়। সে বসে পড়ে তার পাশে।

—তবু মরলাম না বন্ধু। ডুইঃএর মুখে ম্লান হাসি ফোটে।

—কি করে মরবি ? নিজের চোখে আগে দেখবি তো খালি হাতে যুদ্ধ করে কি করে মরতে হয়।

—বাঘরায়! ডুইঃ চিৎকার করে আপ্রাণ চেষ্টায়। অমন কাজ কখনো করবি না। নিজের সর্বনাশ করে আর একজনকে পথে বসাবি না।

—আর তুই ? তুই ক'জনার সর্বনাশ করলি হিসেব রাখিস ?

আমি তো মরিনি ভাই।

বাঘরায় কোন কথা বলে না।

—যা, যুদ্ধ কর। ওদের এখনো অনেক বাকী।

—একটা কথা দে তবে।

—বল ?

—চল, ছুটকীকে নিয়ে আমি যেখানে থাকব—তুই-ও সেখানেই থাকবি। তিনজনে আনন্দে দিন কাটাব।

বুকের মধ্যে একটা দলা পাকানো ব্যথা ডানহাতের চেয়েও অসহ্য হয়ে ওঠে। ডুইঃ বুঝতে পারে তার মুখ বিকৃত হয়ে উঠছে। জোর করে হাসি ফোটায় সে। বলে—তা হয়না রে পাগল। আমার মত পংগুকে নিয়ে তোরা হাঁপিয়ে উঠবি আমাকে ভালবাসলেও, এমন দিন আসবে যখন তোরা বিরক্ত হয়ে উঠবি। কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারবি না। তোদের মুখ দেখে আমিও সব বুঝব, অথচ চুপ করে থাকতে হবে। সে অসহ্য। তোদের বাঁধ ভাঙ্গা আনন্দকে মাটি হতে দিতে পারি না। ভাঙা জিনিষ কি জোড়া লাগে ? ওই তো পড়ে রয়েছে আমার হাত। ও হাতে কত অস্ত্র ধরেছি, গান লিখেছি—এনে জোড়া লাগা দেখি। তা হয় না। অবুঝ হোসনে।

—যুদ্ধ করব না।

জ্বলে ওঠে ডুইঃ—তা করবে কেন ? তুই সর্দার আসেনি, আমি আহত। তোমার ওপর রাজার জীবনের দায়িত্ব কিনা—তাই যুদ্ধ করবে না। এই না হলে সর্দার ! ছি ছি ঃ—তোর সম্বন্ধে এত নীচু ধারণা আমার কখনো ছিল না। রাজা কোথায় আছেন, খবর রাখিস ? একা ছেড়ে দিয়ে কোন্ সাহসে নিশ্চিন্ত আছিস্। যদি ভালমন্দ কিছু হয়—কে নেবে দায়িত্ব ? নাগাদের অনেকেই আছে। মরণ-কামড় দিতে ছাড়বে না তারা।

ব্যস্ত হয়ে ওঠে বাঘরায়। ছুটে যায় রাজার স্থানে। সেদিকে চেয়ে নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যেও ডুইঃ-এর মুখে হাসি খেলে যায়।

টিলার অদূরে জলাশয়—সেখানে পদ্ম ফুটে রয়েছে। ছুটকী ফুল ভালবাসে খুব। ডুইঃ একবার তাকে পদ্ম দিয়েছিল—আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল ছুটকীর মুখ। জলাশয়ে বুনো হাঁসের ভীড়। একটু পরেই তারা উড়ে যাবে। আকাশে অনেক উঁচুতে শকুন উড়ছে। মরা জন্তুর সন্ধান পেয়েছে বোধ হয় ?

কিংবা এই মৃতদেহগুলির ওপরই তাদের সুতীক্ষ্ণ নজর। আজ না হলেও কালকে তারা এক বিরাট ভোজ পাবে এখানে।

হঠাৎ ডুইঃ দেখতে পেল একজন নাগা সন্ন্যাসী তারই কিছুদূরে উঠে দাঁড়ায়। মড়ার গাদার মধ্যে এতক্ষণ চপ করে শুয়েছিল সে। এদের মধ্যেও তাহলে ভীতু মানুষ আছে। ধারণা ছিলনা ডুইঃ-এর। শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ছে— তবু চেঁচিয়ে ওঠে—এই পালাচ্ছিস্ কোথায় ?

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে নাগা। আহত সৈন্যের মুখে এ-জাতীয় চিৎকার সে আশা করেনি। আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে। ডুইঃ বাঁহাত দিয়ে তরবারি টেনে নিয়ে প্রাণপণে উঁচিয়ে ধরে বলে—দেখছ কি ? আহত দেখেও ভরসা হচ্ছে না ? ছি ছি, থুঃ।

নাগা সন্ন্যাসী অবাক হয়। এক হাতে লোকটি কোন্ সাহসে তাকে ধমকায় ভেবে পায় না। তার মুখে ধীরে ধীরে কুটিল হাসি ফুটে ওঠে। লুটিয়ে পড়া এক নিহতের তরবারি তুলে নেয় নিজের হাতে। এক-পা এক-পা করে ডুইঃ-এর পাশে এসে দাঁড়ায়।

বাধা দেবার শক্তি ডুইঃ-এর ছিল না। যথেষ্ট রক্ত তার শরীর থেকে বার হয়ে মাটিতে গিয়ে মিশেছিল। বাঁ হাতে তরবারি তুলে ধরতেও হাত কাঁপছিল। নাগাটির তীক্ষ্ণ অস্ত্র বিনা বাধায় তার হৃদ্‌পিণ্ড ভেদ করে মাটি স্পর্শ করে। সেই মুহূর্তে তার সামনে কার মুখ ভেসে উঠেছিল কেউ জানে না।

নাগা সন্ন্যাসীদের বধ করার পর দেড় বছর কেটে যায়। ইতিমধ্যে সতেরখানি তরফের শান্তি আর ব্যাহত হয়নি। চিরকালের দারিদ্র্য নিয়ে স্বাভাবিক আনন্দে দিন কাটিয়ে চলে রাজ্যের অধিবাসী। তরফের চার-সর্দারের এক সর্দারের জায়গা এখনো খালিই পড়ে রয়েছে। ছুট্‌কী এখন বাঘরায় সোরেনের গৃহিণী। ডুইঃ-এর মৃত্যু তাঁর মনে যত বড় ঝড়ই তুলুক না কেন সে ঝড় শান্ত হয়েছে কালের গতিকে। বাঘরায় বুঝেছিল বন্ধু হলেও তার মন পাথরে গড়া নয়—তাই কোন আঘাতের দাগ যদি পড়ে তাতে সে দাগ চিরস্থায়ী হতে পারে না। পাথরই যদি হত তার মন তাহলে ডুইঃ-এর প্রতি বন্ধুত্বের বড় রকম আদর্শ স্থাপিত হলেও সর্দার হিসাবে সে পংগু হয়ে যেত। কিতাপাটের আশীর্বাদেই মানুষ অনেক কিছুকেই চেপে রাখতে পারে—অনেক কিছু ভুলে যায়। নইলে

উপায় থাকত না। ছুটকী তাকে যে প্রথম সন্তান উপহার দিয়েছিল সে আজ বেঁচে নেই। কিন্তু ওই দুই মাসের একরত্তি শিশু সেদিন যখন মারা গেল, তখন সেই মুহূর্তে, সে ভেবেছিল হয়ত তারও বেঁচে থাকার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। অথচ এর মধ্যে তো বেশ সামলে উঠেছে। ছুটকীকে সংগে নিয়ে ঘুরছে পথে-ঘাটে। হাড়িয়া খেয়ে তার কোমর জড়িয়ে নেচেছেও এক উৎসবে। ছেলের মৃত্যুতে বরং একটা লাভ হয়েছে বলে মনে হয় বাঘরায়ের। আগের চেয়ে সে যেন ছুটকীর অনেক কাছে চলে এসেছে। আগের তীব্র আকর্ষণের সংগে এখন মমতা এসে যোগ হয়েছে।

ভুইঃ-এর জন্যে রাজা ত্রিভনেরও দুঃখ কম হয়েছিল না। কিন্তু প্রথম যুদ্ধ-জয়ের উন্মাদনা সেই দুঃখকে স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধতে দেয় নি তার মনে। তাছাড়া যুদ্ধ-জয়ের পরে যেদিন প্রথম গিয়ে দাঁড়ল কাঁটারাঙ্গার পাথরের পাশে, সেদিন ধারতির চোখের ভাষা সব কিছুই ভুলিয়ে দিয়েছিল।

ঘটনা আবর্তিত হয়ে এগিয়ে চলছিল এক সুনির্দিষ্ট পথে। কেউ না জানলেও ত্রিভন জানত সে কথা। তাই ধাদকা আর পঞ্চ সর্দারী যখন দূত পাঠান বন্ধ করল তখন রাণী, নবহরি দাস, এমনকি সর্দাররাও চঞ্চল হল। রাজা কি তবে অবিবাহিত থাকবেন?

পঞ্চসর্দারী শত্রুতা করল। দুর্নাম ছড়িয়ে দেয় রাজা ত্রিভনের নামে।

নরহরি বাবাজী একদিন ব্যস্ত হয়ে ত্রিভনের সামনে এসে দাঁড়ায়।

—কিছু বলবেন ঠাকুর?

—হ্যাঁ।

—বলুন।

—গোবিন্দ ফিরল আজ বরাহভূমি থেকে।

—নতুন কোন খবর আছে?

—না, বিশেষ কিছু নয়। তবে রাজা ডেকেছিল তাকে।

—কেন?

—সতেরখানির লোক বলে। নরহরি গম্ভীর হয়।

চকিতে নরহরির আপাদমস্তক ভালভাবে দেখে নিয়ে ত্রিভন বলে—আপনার কথার অর্থ?

—রাজা বিদ্রূপ করছিলেন আপনাকে নিয়ে। শুধু আপনাকে নিয়ে বিদ্রূপ

করলে হয়ত আজ কিছু বলতে আসতাম না। কারণ রাজা হেমৎসিংয়ের মৃত্যুর পর আমার সব কর্তব্য শ্রীশ্রীকালাচাঁদ জিউর মন্দিরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

—আপনি পূজারী, শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু মন্দিরের বাহিরে আপনি কোন্ কর্তব্য করতে চান ?

—আপনার পিতা পূজারী বলে শুধু ভাবতেন না আমাকে। আমার অনেক উপদেশ তিনি বিবেচনা করতেন। তাই সতেরখানির বহু লোকই বৈষ্ণব ধর্ম নিয়েছে।

—সতেরখানির সবাই বৈষ্ণব হোক—এ আমি চাই না।

—চান না ? নরহরির মাথায় বজ্রাঘাত হয়।

—না। কারণ তাতে সতেরখানির অকালমৃত্যু অবধারিত।

বৈষ্ণবদের রাগতে নেই। রাগের সমস্তটুকু জ্বালা বিস্ফারিত দৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ পায় নরহরি বাবাজীর। শেষে কাঁপা গলায় বলে—হেমৎসিং ভুঁইয়ার ছেলে হয়ে একথা বলতে পারলেন রাজা ?

—বলতে বাধ্য হচ্ছি ঠাকুর। বৈষ্ণব ধর্মের যত গুণই থাক না কেন, আমাদের, এই সতেরখানি লোকদের, সে ধর্মের মধ্যে বেশী না-এগনোই ভাল। বাবাকেই দেখতাম—কত পরিবর্তন হয়েছিল তাঁর ধীরে ধীরে। সে পরিবর্তনে তাঁর আত্মার মংগল হয়েছিল কিনা জানি না। কিন্তু অমংগল ডেকে আনছিল এই রাজ্যের। তাই আমার ইচ্ছে, আমাদের ধর্ম শ্রীকালাচাঁদ জিউ-এর পূজোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাক। বড় কঠিন কাজ আমাদের ঠাকুর। অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখতে গেলে যেখানে রক্তপাত ঘটাতে হয় পদে পদে সেখানে বৈষ্ণব হয়ে বিবেকের দংশন সহ্য করে, ক্লীব হয়ে গিয়ে লাভ নেই। আপনি অবুঝ নন, সকলকে খেয়ে পরে বাঁচতে দিন। মহল জোনারের সংগে একটু মাংসও তাদের পেটে পড়া দরকার।

বহুক্ষণ স্থির হয়ে থাকে নরহরি। বলে—বেশ, তাই হবে। তবে আমাকে বিদায় দিন।

—সে তো সম্ভব নয়। জিউ আছেন।

—গোবিন্দ থাকল সেজন্যে। সে শুধু পূজারীই হয়ে থাকবে। আমি-তা পারি না। পঁচিশ বছর আগে যেদিন নবদ্বীপ ছেড়েছিলাম, সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম গুরুদেবের সামনে, বৈষ্ণব ধর্মের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টাই হবে আমার ব্রত। সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। এখন কাজ ফুরিয়েছে এখানকার।

—আপনাকে জোর করব না। তবে আপনি থাকলে মায়ের মনে নতুন করে আঘাত লাগত না।

—রাণী-মাকে আমি বুঝিয়ে বলব।

—ফল হবে না।

নরহরি জানে, ফল হবে না। সে বয়স নেই রাণীমার। তার ওপর অসুখে ভুগে ভুগে তাঁর আয়ু প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। এই সময়ে যা কিছুতে স্বামীর সামান্য স্মৃতি বিজড়িত, সে জিনিষ ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। বরং বেশী করে আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করবেন। হেমৎসিং-এর আমলে শেষ দিন পর্যন্ত নরহরির প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট—সর্দাররাও সমীহ করত তাঁকে। কারণ নরহরি ছাড়া চলত না রাজার। সব সময়ে তাঁর পাশে পাশে থেকে সুর করে পদাবলী শোনাত, আর তত্ত্ব কথা বুঝিয়ে যেত। কিন্তু সেবার নরহরি বরাহভূম থেকে ফিরে এসে হতবাক্ হয়ে দেখল যে হেমৎ সিং-এর নশ্বর দেহ যেমন পঞ্চভূতে গিয়ে মিশেছে, তেমনি তার অখণ্ড প্রতাপও মন্দিরের চার-দেয়ালের মধ্যে বন্দী হয়ে পড়েছে। তারপর থেকে সে অনেক চেষ্টাই করেছে ত্রিভনের মন ভোলাতে—কিন্তু পারেনি।

রাণীমা এত খোঁজ রাখেন না। কিতাগড়ের এক প্রকোষ্ঠে স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি আশ্রয় নিয়েছেন। সেখানে কেউই যায় না। তবে নরহরির অবাধ গতি সেখানে। তাই তিনি জানেন রাজপরিবারে নরহরি বাবাজীর স্থান আগের মতই অটুট। এখন যদি হঠাৎ বলা হয় যে তিনি রাজ্য ছেড়ে চলে যাবেন, রাণীমা প্রথমে বিশ্বাসই করবেন না। পরে সব কিছু শুনে পাবেন দারুন আঘাত।

নরহরি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে—ফল হয়ত হবে না। কিন্তু আমিও থাকতে পারি না এখানে। তার জন্য দরকার হলে সত্যি কথাই আগাগোড়া বলতে হবে রাণীমাকে।

—বলবেন। ঠিক আমি যা বলেছি আর করেছি, তাই বলবেন। তার সংগে তত্ত্বকথা মেশাবেন না

ত্রিভনের মেজাজ উষ্ণ হয়ে ওঠে। লোকটিকে সে কোনদিনই ভাল চোখে দেখে না। কেমন যেন মেয়েলী ভাব। কথাবার্তার ঢংও তেমনি। অনেক সময়ে বড় বেশী অশ্লীল। এ লোক যত তাড়াতাড়ি রাজ্য থেকে বিদায় নেয় ততই ভাল। তার জন্য মায়ের মন ভাংলেও রাজ্যের মংগলের দিকে চেয়ে সেটুকুকে মেনে নিতে হবে। গোবিন্দ বয়সে তরুণ হলেও তার মধ্যে একটা গাম্ভীর্য

রয়েছে। ত্রিভন পছন্দ করে তাকে। তাই বাৎসরিক খাজনা এই দুবছর সে তাকে দিয়েই পাঠাচ্ছে বরাহভূমের রাজদরবারে। সংগে অবশ্য দশজন চোয়াড় যায়।

নরহরির সংগে যদি গোবিন্দও না চলে যায়, তাহলে সব দিকই বজায় থাকবে। কালাচাঁদ জিউএর পুজোর জন্যে অন্য লোকের সন্ধান করতে হবে না।

—তাহলে চলি রাজা।

—না। যে-কথাটা বলতে এসেছিলেন, বলে যান।

—আর কিছু বলতে আসিনি। এতদিন পরে প্রথম নিজেকে অবসন্ন মনে হল নরহরি বাবাজীর।

—বরাহভূমরাজ আমাকে নিয়ে কী বিদ্রূপ করেছিলেন ?

এখন আর কোন ব্যাপারেই নরহরি দাসের আগ্রহ নেই। সে আশা করেছিল, অন্ততঃ রাণীমার দোহাই দিয়ে ত্রিভন তাকে চলে যেতে নিষেধ করবে। ত্রিভনের সাফ্ জবাবে সে-আশা তিরোহিত। তবু রাজার কথার জবাব দিতেই হবে।

—আপনাকে নিয়ে বিদ্রূপ, তত বড় কথা নয়। কিন্তু সে বিদ্রূপ শ্রীশ্রীজিউকেও বিদ্ধ করেছে।

—শুনতে চাই সেটা।

—কালাচাঁদ জিউএর মন্দিরে নাকি আপনি রাজ্যের সুন্দরী নিয়ে বিলাস সুরু করেছেন—গোপীবিলাস তাই বিয়ে করতে চান না। তাই ধাদ্‌কা আর পঞ্চ সর্দারী থেকে দূত এসে বারবার ফিরে গিয়েছে।

—এ কথা বিবেকনারায়ণ নিজে বলেছেন ?

—হ্যাঁ। কারণ তিনিই ডেকে পাঠিয়েছিলেন গোবিন্দকে।

—উত্তরে গোবিন্দ কি বলেছে ?

—সে বলেছে এ সব মিথ্যে গুজব।

—বিশ্বাস করেছেন রাজা !

—সেটা গোবিন্দ যাচাই করেনি। নরহরি দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে।

—আচ্ছা, আপনি যান। ত্রিভনের ভ্রূ কুঁচকে ওঠে।

ত্রিভন জানত মায়ের কাছ থেকে ডাক আসবে।

সে ডাক এলো সেদিনই সন্ধ্যায়। মনে মনে প্রস্তুত হয়ে সে মায়ের ঘরে প্রবেশ করে।

ছেলেকে দেখে রাণী-মা ডুকরে কেঁদে ওঠেন।

—কেঁদোনা মা। অন্যায় কিছু করিনি।

—কাকে অন্যায় বলব তবে? এ তো নিজের বাবাকেই অপমান করা।

—না। সময়ের সংগে সংগে অনেক কিছুই বদলায় মা। বাবার সময়ে যা ঠিক ছিল এখন তা নাও ঠিক থাকতে পারে।

—তাই বলে দেবতাকে অপমান?

—অপমান আমি করিনি।

—বাকী থাকল কি? বাবাজীকে চলে যেতে বলা, দেবতাকে তাড়িয়ে দেবার সামিল। যে মুহূর্তে বাবাজী এখান থেকে বিদায় নেবেন, সেই মুহূর্তেই শ্রীশ্রীজিউ কিতাগড় ছাড়বেন। ওই পাথরের মূর্তিই শুধু নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকবে।

—গোবিন্দ থাকবে।

—গোবিন্দ? সে আবার পূজারী! বাবাজী নিজেও তো বলে গেলেন, তাঁর শিষ্য হলেও গোবিন্দকে বৈষ্ণব বলতে বাধে।

ত্রিভন বুঝল, নরহরি ইতিমধ্যেই সবক'টি কলকাঠি নেড়ে রেখে গিয়েছে। সে বলে—তবু তারই হাত দিয়ে পূজো করিয়ে এসেছেন বিগ্রহকে, নিজে তো কিছুই করতেন না। জেনেশুনে তিনিই তবে অন্যায় করেছেন প্রতিদিন।

রাণীমা চিৎকার করে ওঠে—ত্রিভু। অতবড় সাধক সম্বন্ধে—এমন অশ্রদ্ধার সংগে কথা বলো না। এই তো সুরু। এখনো অনেকদিন বাকী তোমার জীবনের। অনুতাপে পুড়ে মরতে হবে।

ত্রিভন মৃদু হাসে—মহাপুরুষের হয়ে অভিশাপটা তুমিই দিয়ে দিলে মা।

চমকে ওঠেন রাণীমা—না না, ষাট্। তা দেব কেন? কিন্তু সত্যি কথনো মিথ্যে হয় না।

—আমিও সেই কথাই বলছি মা। নরহরি ঠাকুরের কোন প্রয়োজন আর সতেরখানি তরফে নেই—এটাই সত্যি।

রাণীমা বিহ্বল। বড় বড় চোখে চেয়ে থাকেন পুত্রের মুখের দিকে। কিছুক্ষণ পরে অসুস্থ শরীর নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ান—আয় আমার সংগে।

—কোথায়? ত্রিভন অবাক হয়।

রাণীমা হাতের ইশারা করে হাঁপাতে হাঁপাতে এগিয়ে যান। বাধ্য হয়ে

ত্রিভন অনুসরণ করে তাঁকে। প্রকোষ্ঠের পর প্রকোষ্ঠ পার হয়ে তাঁরা রাজ-পরিবারের অস্থিশালায় এসে উপস্থিত হন। খাঁড়েপাথর—যুঝার সিং,—হেমৎ সিং—তিন রাজার অস্থি রয়েছে সুদৃশ্য তিনটি পাথরের নীচে।

রাণীমা উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠেন—এই খাঁড়েপাথরের অস্থি ছুঁলাম, এই ছুঁলাম যুঝার সিংএর অস্থি—আর এই তোর বাবার—

—দাঁড়াও মা। মনে হচ্ছে, তুমি কোন কঠিন প্রতিজ্ঞা করতে যাচ্ছ। কিন্তু তার আগে আমি তোমাকে শুধু একটি কথা জিজ্ঞাসা করছি।

একটু থেমে ত্রিভন বলে—শেষ সময়ে বাবা কেন আমাকেই রাজ্যভার দিতে বলে গেলেন ?

—চিনতে পারেননি তোমাকে।

—ঠিকই চিনেছিলেন। চিনতে না শুধু তুমি। কখনো চেষ্টাও করনি চিনতে। ধর্মের জন্য নিজের ছেলেকে অবধি দূরে সরিয়ে রেখেছ। কিন্তু বাবা ছিলেন আমার বন্ধু। তিনি আমার শক্তি, আমার বুদ্ধি, আমার বিশ্বাস—সব কিছুরই খবর রাখতেন। আজ তোমাকে যে কথা বলায় বিচলিত হয়েছ তুমি, সে কথা, অল্প বয়স হলেও তখন বাবাকে কতবার বলেছি। এমন কথা বলেছি যা তুমি সহ্য করতে পারতে না। অথচ তিনি কখনো রাগেন নি। বরং চিন্তান্বিত হয়েছেন। তুমি বিশ্বাস করতে পার। শেষ সময়ে তিনি নিশ্চয়ই তাঁর ভুল বুঝেছিলেন। অথচ বয়স হয়েছিল বলে কিছু এড়িয়ে যেতে পারেন নি। আমি শুধু ভাবি, ছেলে হয়েই যখন জন্মালাম, তখন তাঁর প্রথম বয়সে কেন হলাম না। এত সব সমস্যায় তো পড়তে হতো না তাহলে।

হেমৎ সিং-এর পাথরের ওপর রাণীমার হাত নিশ্চল হয়ে থেমে যায়। তিনি ত্রিভনের মুখের দিকে বহুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন। শেষে বলেন—আমাকে একটু ধরে নিয়ে চল্ ঘরে।

ঘরে এসে বসে সুস্থির হতে রাণীমার অনেকটা সময় লাগে। সামান্য সময়ের মধ্যে তাঁর মনের ওপর এলোমেলো ঝড়ের ঝাপটা লাগায় তিনি কেমন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন।

—রাজাকে একথা তুই বলেছিলি ?

—হ্যাঁ মা, বাবা জানতেন মিথ্যে কথা আমি বলিনা। তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পার। রাণী, কাঁটার খোঁচা খেয়ে যেন ব্যথায় মুখ বিকৃত করেন। আরও কিছু শোনার জন্য ত্রিভনের দিকে চেয়ে থাকেন তিনি।

—আজ তোমাকে কত সংযত ভাবে কথাগুলো বললাম। বাবাকে সেভাবে বলিনি। এত গুছিয়ে বলতে শিখিনি তখনো। তখন বলেছিলাম—ঠিক আমার মন যেভাবে চলতে চেয়েছিল। বাবাকে তো কখনো পর ভাবিনি। তোমার সামনে কত সাবধান হয়ে কথা বলতে হচ্ছে। বাবার সংগে সে বালাই ছিল না। সেদিনের কথাগুলো হুবহু তোমাকে বললে অস্থিশালায় আমার এক অনুরোধে তুমি প্রতিজ্ঞা থেকে বিরত হতে না।

রাণীমা কেঁদে ফেলেন। ত্রিভনকে কাছে ডেকে তার মাথাটা বুকে চেপে ধরে বলেন—তুই রাজা, রাজ্যের মংগল তুই বুঝিস্ ত্রিভু। আমি আর বাধা দেবনা।

জীবনে প্রথম মায়ের এত কাছে এল ত্রিভু। ধর্মের যে আবরণ তাকে পৃথক ক'রে রেখেছিল এতদিনে সেটা অপসারিত হল সহসা। নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে ভাবে সে। কারণ পিতার মৃত্যুর পর সংসারে আপন বলতে তার কেউই ছিল না শ্রাবন্তি ছাড়া। মায়ের সংস্পর্শে এসে তার বিক্ষিপ্ত মন যেন একটা স্থায়ীত্ব পেল। তাই, কারণে অকারণে মায়ের কাছে আসতে সুরু করে সে।

নরহরি বাবাজীর সংগে স্পষ্ট কথা হয়ে গেলেও সে এখনো বাটালুকা ছেড়ে যায়নি। বরং এতদিন যে পূজো গোবিন্দ করত তা নিজের হাতে নিয়েছে। গোবিন্দর ভার পড়েছে শুধু পূজোর যোগাড আর ঘণ্টা বাজাবার। ত্রিভন আপন মনে হাসে। নরহরি বোধহয় নিজেকে চিনেছে এতদিনে। এতদিনের আশ্রয়ের মায়া ত্যাগ করতে মহাপুরুষের হৃদয় ভাঙছে। তার তো ঘর বলতে ওই মন্দিরটুকু আর আত্মীয় বলতে কেউ নেই।

রাণীমা একদিন ত্রিভনকে বলেন—এবারে বিয়ের ব্যবস্থা কর ত্রিভু। রাণী ছাড়া কি রাজা মানায়?

—আমিও তাই ভাবছি।

—বোক পাঠা পঞ্চসর্দারীতে। শুনেছি মেয়েটি খুবই সুন্দরী।

—পঞ্চসর্দারীতে কেন মা। খুঁজলে কি নিজের দেশে মেয়ে পাওয়া যায় না?

—নিজের দেশে মানে?

—এই সত্তেরখানিতে।

—সেকি? এদেশে আর রাজা কোথায়?

—রাজার মেয়েই যে বিয়ে করতে হবে এমন কি নিয়ম আছে কোন!

—তোমার উদ্দেশ্য কি ত্রিভন! রাণীমা গম্ভীর হন।

সম্পর্ক ঘনীভূত না হতেই বিচ্ছেদের ইংগিত। এ আশংকা সে আগেও করেছিল। কারণ কথাটা মা নিজে না ওঠালেও তাকে একদিন বলতে হত। তবু মন ভেজাবার চেষ্টা করে সে। হাজার হলেও গর্ভে ধরেছেন তো। মেয়ের দুর্বলতা একবিন্দু কি না থেকে পারে?

আবার এক সংঘাতের জন্য প্রস্তুত হয়ে মায়ের পাশে বসে তার পিঠে হাত রেখে বলে—খাঁড়েপাথর কি রাজা হয়ে জন্মেছিল মা?

—না।

—তাঁর রাণী কি সাধারণ ঘরের মেয়ে ছিলেন না?

—তা ছিলেন। কিন্তু ত্রিভন সিং রাজা হয়েই জন্মেছিল।

—না। রাজার শেষ অনুরোধেই সর্দাররা আমাকে রাজা করেছে। সতেরখানি তরফের সিংহাসনে নইলে আজ অন্য কেউ বসত। এ-দেশ বরাহভূম নয়—মুর্শিদাবাদও নয় মা। রাজার ছেলে হলেই এখানে রাজা হওয়া যায় না। এখানে রাজা হতে হলে নিজের কৃতিত্বের সংগে সর্দারদের অনুমতি প্রয়োজন। তুমি তো সবই জান মা।

—হ্যাঁ, জানি। আমিই যে তোকে গর্ভে ধরেছিলাম।

—তবে? রাজার ছেলে হলে যেমন রাজা হওয়া যায় না—রাজার মেয়ে হলেও তেমনি রাণী হওয়া যায় না।

—তুই কি বলতে চাস্।

—বলতে চাই সতেরখানির যে রাণী হবে; তাকেও উপযুক্ত হতে হবে। প্রয়োজন হলে যুদ্ধক্ষেত্রেও যেতে হবে।

—তেমন মেয়ে তুই পৃথিবীতে পাবি?

—পৃথিবী খুবই বড মা।

—তুই না বললি সতেরখানির মেয়েই বিয়ে করবি?

—হ্যাঁ।

—পাগল হয়েছিস্। নইলে এতবড কথা বলতে পারতিস না।

—কেন মা।

সতেরখানিতে তেমন মেয়ের সন্ধান করার চেয়ে পরশ পাথর খুঁজে বেড়ান অনেক সহজ।

—আছে, তেমন মেয়ে। এই বাটালুকাতেই।

—আমাকে বিশ্বাস করতে বলিস?

—দেখবে ?

—পাগলামী রাখ্ ত্রিভু। পঞ্চসর্দারীতে লোক পাঠা।

—রাণীমা শুয়ে পড়েন।

—পারাউ সর্দারকে চেন মা ?

—না চেনার কারণ নেই।

—তারই ছেলের নাতনী আছে। নাম দিয়েছি আমি ধারতি।

—তুই নাম দিয়েছিস ?

—হ্যাঁ। তাকে দেখবে ?

—থাক। রাণীমা ছট্‌ফট্ করে বলেন—আর সহ্য করতে পারছি না ত্রিভু। আমার শ্রীক্ষেত্র যাবার ব্যবস্থা করে দে।

—সর্দারের কাছে লোক পাঠাই ?

—যা খুশী তাই কর। তুই রাজা, তোর আদেশে সব হবে। আমি কে ?

—তুমিই সব। তোমার আশীর্বাদ পেতে চাই।

—অত সহজে আশীর্বাদ করতে পারব না। তার আগে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করতে হবে।

—একটু উদার মন নিয়ে চিন্তা করো মা, শক্তি আপনিই পাবে।

রাণীমা চোখের পাতা বন্ধ করেন। ত্রিভন সেদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে চলে যায়।

মত শেষ পর্যন্ত দিলেন রাণীমা। কিন্তু বাটালুকায় আর থাকলেন না। একদিন ভোরবেলা তাঁর শিবিকা লোকলস্কর নিয়ে এগিয়ে চলল সতেরখানির সীমান্তের দিকে। নরহরি বাবাজীও রাণীর সংগ নিল। সে ভালভাবেই জানত আজও যেটুকু সুবিধে সে ভোগ করত, সে শুধু রাণীর জন্যে। রাণীর অনুপস্থিতিতে তার কপালে কিছুই জুটবেনা।

ত্রিভন অনেক বুঝিয়েছিল মাকে। এমনকি তাঁর পায়ে ধরে অনুরোধ করেছিল। শোনেন নি তিনি। দুদিনের জন্যে যেটুকু স্নেহ বা বিশ্বাস তাঁর দেখা গিয়েছিল নারীসুলভ ভাবপ্রবণতাই তার মূল কারণ। তবু হয়ত ত্রিভন সক্ষম হত যদি নরহরি মায়ের মন অমনভাবে বিষিয়ে না দিত।

সীমান্তে এসে ত্রিভন ঘোড়া থেকে নেমে শিবিকার পাশে দাঁড়িয়ে শেষবারের

মত বলেছিল—ধারতিও সর্দার বংশের মেয়ে—যে সর্দার তার সত্তরখানির জন্যে একখানা হাত দিয়েছে—যে সর্দার নিজের একমাত্র ছেলেকে দিয়েছে বিসর্জন। পারাউ সর্দার যদি খাঁড়েপাথরের সময়ে না থাকত, তাহলে যুঝার সিং আর হেমৎ সিংএর নাম বোধহয় কেউ শুনতে পেত না।

—ফিরে যাও ত্রিভন। শ্রীক্ষেত্র আমাকে টানছে। ও-সব ঘরের কথা বলে কি লাভ? কোন আকর্ষণ নেই আমার। তবে আশীর্বাদ চেয়েছ—করেছি। জানিনা অমন আশীর্বাদের মূল্য কতটুকু।

—বেশ। শ্রীক্ষেত্র গিয়ে যদি সত্যিই কোন বৈষ্ণবের দেখা পাও মা তাহলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করো, তোমার ওই শ্রীচৈতন্য কাদের জন্যে ভেবেছেন—কাদের আলিংগন করেছেন।

নরহরির দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আবার সে বলে—তোমার অনুচরটিকে কিন্তু সংগে নিয়ে যেও সে সময়। কারণ ধর্ম সম্বন্ধে তার কোন ধারণা নেই। এমনকি নবদ্বীপ থেকে আসার সময়ে যে-সমস্ত পুঁথি সংগে করে নিয়ে এসে বাবাকে দিয়েছিল তাও কখনো উল্টে দেখেনি।

—কে বলল আমি দেখিনি। নরহরি রেগে ওঠে। সে ভালরকম জানে সত্তরখানিতে আর ফিরে আসার পথ নেই তার।

—পুঁথিগুলোর নাম কি বাবাজী?

—নাম কি মনে থাকে?

—রামায়ণ মহাভারতের নাম শুনেছ?

—তা শুনব না কেন?

—নিজেকে বৈষ্ণব বলে জাহির করে বৈষ্ণবদের পুঁথির নাম জান না? আমি তো শুনি অধার্মিক। কিন্তু আমিও বাবার কাছে শিখে লোচনদাসের চৈতন্যমংগল আগাগোড়া পড়েছি।

নরহরি ঢোক গেলে। কি যেন বলবার চেষ্টা করে সে। ত্রিভন তাকে থামিয়ে দিয়ে আবার বলে ওঠে—পঁচিশ বছর আগের গুরুদেবের উপদেশ, আর তখনকার মুখস্থ করা পদাবলী না আউড়ে কিছু জ্ঞান অর্জনও তো করতে পারতে। কোন কাজই ছিল না তোমার বাবাজী।

—চলে যা ত্রিভু। শেষ সময়ে ঝগড়া করে যাত্রাকে অশুভ করতে দিস্ না।

ত্রিভন ঘোড়া ছুটিয়ে দেয় বাটালুকার দিকে। কদমে চলে তার প্রিয় বিজলী। ঝগড়া করে সত্যিই কোন লাভ নেই। মা পুণ্য সঞ্চয় করুন শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে। সে

বাধা দিতে পারে না। যেমন তার মা পারেন না তার পথে বাধার সৃষ্টি করতে—যে-পথ তাকে তার প্রজাদের সংগে এক করে তুলতে সাহায্য করে।

তবু একটা ব্যথা অনুভব করে সে। কিসের ব্যথা জানে না। বাবার কথা মনে হয় তার। বাবার সে স্নেহ আর পাবে না সে। মায়ের কাছে বৃথাই সে আশা করেছিল। মনটা নেচে উঠেছিল সাময়িক ভাবে।

সর্দাররা রাজার মুখে শুনে চমকে উঠেছিল। জীবনে যে কথা শোনেনি—বাপ-ঠাকুর্দা যা কল্পনাও করতে পারত না। তাকি সত্যি হয়। কিন্তু রাজা তো মিথ্যে কথা বলেন না।

ত্রিভন বলেছিল—জানতাম অবাক হবে। কিন্তু এই আমার সংকল্প। বাধা দেবার চেষ্টা করো না। শুধু জেনে নাও লোকদের মনোভাব।

সর্দারদের মুখ থেকে বাটালুকা গাঁ শোনে—শেষে শোনে তরফের সবাই। আনন্দে নেচে ওঠে তারা। দল বেঁধে ভীড় করে পারাউ সর্দারের আঙিনায়—দুই পুরুষ যেখানে কেউ আসেনি। নতুন নতুন লোক দেখে নতুন করে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ে পারাউ-এর দুচোখ বেয়ে।

ধারতি ঘরের কোণে গিয়ে লুকোয়। লজ্জায় ঘেমে ওঠে সে। কিন্তু সেখানেও রেহাই নেই। ভীড় ঘরের মধ্যে এসে জড়ো হয়। তাদেরই মত কুঁড়েঘরের এক মেয়ে হবে রাণী। প্রতিবেশী শুকোলরা রাজ্যের লোকের প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়। সবাই জিজ্ঞাসা করে—রাণী কি চিরকাল ঘরেই বসে থাকতেন ?

—আরে না না। ওই কুণ্ড্কী বুড়ী বাঁধা রয়েছে খুঁটিতে। ওর যত কাজ তো ওই মেয়েই করে। ওই যে জ্বালানি কাঠ জড়ো করা রয়েছে, লিপুরই তো কুড়িয়ে এনেছে শালবন থেকে। বুড়ো সর্দার একহাত নিয়ে কিছুই করতে পারে না। রান্নাবান্না লিপুরই করে। —শুকোল এক নিঃশ্বাসে গর্বের সংগে কথাগুলো বলে ফেলে।

—লিপুর কে ? দূর-গ্রামের একজন প্রশ্ন করে।

—তোমাদের রাণী গো। আমাদের কাছে ও লিপুরই। স্নেহের হাসি হাসে শুকোল। তার কথা শুনে চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে একরাশ মাথার।

শুকোল আবার সুরু করে—আল বাঁধতে লিপুর—সাঁজাল দিতে লিপুর—খুঁটি পুঁততে লিপুর। ওর কি গুণের শেষ আছে ?

সবাই আবার ধারতির দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। সত্যিই তো—তাদের মতই একেবারে। রাজাও তবে তাদেরই মত। ভালই হবে। দুঃখ ঘুচবে এতদিনে।

একজন প্রৌঢ়া এগিয়ে এসে বলে—রাজা কি শুধু একটা বিয়েই করবেন?

একসংগে ভেড়ে ওঠে সবাই। যারা চেনে তারা মুখ ভেংচে বলে—তবে কি তোমার সোয়ামীর মত?

অপ্রস্তুত হয় প্রৌঢ়া—না, না, তাই বলছি। বড় জ্বালা সতীন থাকায়। হিরোম এরা শুই শাগাঃ। শুয়োপোকার হুলের মত সবসময় কুট্‌কুট্‌ করে।

শুকোল বলে ওঠে—রাজাকে দেখেছ? দেখলে আর ওকথা বলতে না দেব্‌তা—একেবারে দেব্‌তা।

—আমারই ভুল গো। কারও বিয়ে হতে দেখলেই ওকথাটা আগে ভাগে মনে আসে। পাপ—পাপ।

একজন যুবতী আস্তে আস্তে বলে—রাণী নাকি ঘোড়ায় চড়া জানে, তীর ছুঁড়তে পারে।

শুকোল এবারে বলে—ওইটাই জানিনে। আমিও তাই শুনেছি। কিন্তু বিশ্বাস হয় না। তীর ছোঁড়া শিখতে পারে—পারাউ সর্দার শেখাতে পারে। কত বড় সর্দার ছিল। কিন্তু ঘোড়ায় চড়া? ঘোড়া কোথায় পাবে। একটাই তো ঘোড়া কিতাগড়ের।

পারাউ এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবারে হেসে ওঠে দাওয়ার ওপর থেকে। সবার দৃষ্টি সেদিকে গিয়ে পড়ে।

শুকোল বলে—কি গো সর্দার, অমন হাসলে কেন? কথাটা কি সত্যি?

ঘাড় ঝাঁকিয়ে পারাউ বলে—হ্যাঁ।

—কে শেখাল?

—কে আবার? যার রাণী হবে—সেই।

সবাই বিস্মিত হয়। শুকোলও বাদ যায় না। এত কাণ্ড হয়েছে, অথচ পাশে থেকেও জানতে পারে নি? নিজের ওপর রাগ হয় তার। মেয়েরা গালে হাত দেয়। ধারতি তার মুখখানাকে সামনের দিকে আরও গুঁজে দেয়।

কিন্তু এত যে জল্পনা কল্পনা, এত উৎসাহ উদ্দীপনা সব কিছু এক প্রচণ্ড আঘাতে নিমেষে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

ধারতি নিখোঁজ হল একদিন।

সত্যি। কঠিন সত্যি। কোথাও কিছুমাত্র ভুল নেই।

রাতে পারাউ সর্দার একবার ক'রে ওঠে রোজ। সে-রাতেও উঠেছিল। ঘুম ভাঙলে পারাউ রোজই একবার অভ্যাসমত ডাকে ধারত্তিকে। সেদিনও ডাকল, কিন্তু সাড়া পেল না। মস্ত একটা নিয়মভংগ সাড়া না পাওয়া। তাই আবার ডাকল। জবাব পেল না। অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে এসে ধারত্তির শয্যার ওপর হাত রাখে—শয্যা শূন্য। বুকের ভেতরে ঠাণ্ডা হয়ে যায় বহুযুদ্ধের বিজয়ী সর্দারের। চিৎকার করে আবার ডেকে ওঠে।

হঠাৎ নজরে পড়ে, ঘরের দরজা খোলা। চমকে ওঠে সে। তাড়াতাড়ি বাইরে বার হয়ে আসে। ক্ষীণ আশা তখনো, হয়ত গোয়ালে গিয়েছে লিপুর। বুড়ো গাইটাকে বড় ভালবাসে সে। হয়ত খেয়াল হয়েছে যে সন্ধ্যেবেলায় বাঁধা হয়নি তাকে। উঠেছে তাই বেঁধে আসতে। কিন্তু পারাউকে না ডেকে কখনো তো সে বাইরে আসে না রাতে।

ফেউএর ডাক শোনা যায় খুব কাছে। পাগলের মত পারাউ গোয়ালঘরে গিয়ে ঢোকে। নেই। সেখানেও নেই। কুণ্ডকী অবাক হয়ে চেয়ে ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করে। পথে বার হয়ে আসে বৃদ্ধ। অন্ধকারে ছোটে সে শুকোলের বাড়ীর দিকে। লাঠি আনতে ভুলে যায়। খালি হাতেই নোয়ানো দেহখানা টেনে টেনে ছোটে।

কিন্তু কোথায় লিপুর? সে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে।

সেই রাতেই খবর পৌঁছে যায় কিতাগড়ে। ঘোড়ার ওপর ত্রিভন ছোটে উন্মাদের মত। প্রতিটি সর্দার ছোটে—ছোটে স্থায়ী চোয়াড় বাহিনীর লোকেরা। জংগল আলোড়িত হয়—বন্যজন্তু ভয়ে পালায়। কাঁটারাঙ্গা পাহাড়ের প্রতিটি স্তরে স্তরে অনুসন্ধান চলে। সুবর্ণরেখার গতিপথের বহুদূর পর্যন্ত অনুসন্ধান চলে।

সব বৃথা।

ভোরের আলো ফোটার অনেক পরে ক্লান্ত ঘোড়াটিকে নিয়ে অবসন্ন ত্রিভন ফিরে আসে কিতাগড়ে। সর্দাররাও একে একে ফেরে। ফিরে আসে চোয়াড় বাহিনীর প্রতিটি লোক। ত্রিভনের ব্যাকুল দৃষ্টি সবার মুখে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। ব্যর্থতার স্পষ্ট রেখা ফুটে উঠেছে সে-সব মুখে।

—রাজা। বাঘরায় সোরেণ এগিয়ে আসে।

ত্রিভন তাকায় তার দিকে। অসহায় সে দৃষ্টি।

—আমরা তো থামব না। খাঁড়েপাহাড়ি আর কাঁটারাঙ্গার সব কয়টি পাথর এখনো উল্টে দেখা হয় নি।

—এ তো কথার কথা সর্দার।

—না। সেই ভাবেই খুঁজব। পাথর ওল্টানো সম্ভব না হলেও, প্রতিটি গুহা, গাছপালা ঝোপ জংগল আমাদের খুঁজে দেখতে হবে। রাতের অন্ধকারে যা সম্ভব হয় নি দিনের আলোয় তা হবে। হতেই হবে। আমি ফিরতাম না রাজা। ভাবলাম হয়ত খুঁজে পাওয়া গিয়েছে ইতিমধ্যে।

—আমিও তাই ভেবেছি।

—কিতাপাট না করুন, যদি তিনি বেঁচে না থাকেন, দেহ যাবে কোথায়? সর্দাররা বেঁচে থাকতে তিনি শূন্যে মিলিয়ে যাবেন?

তখনি বার হয়ে যায় বাঘরায়। চোয়াড় বাহিনী ছোটে তার পেছনে।

ত্রিভন চিন্তাক্লিষ্ট হয়। কিছুদিন আগে এ ঘটনা ঘটলে সে নরহরিকে সন্দেহ করত। নিজের মা-ও সন্দেহের আওতার বাইরে পড়তেন না। কারণ নরহরির চেয়ে মায়ের স্বার্থ এখানে অনেক বেশী।

কিন্তু এখন সে কাকে সন্দেহ করবে? পারাউ সর্দারকে ডিঙিয়ে কোন বন্য জন্তু ঘরের মধ্যে ঢুকে টেনে নিয়ে যায় নি ধারতিকে। নিয়ে গেলেও ধস্তাধস্তি বা চিৎকার হতই। অমন নিঃশব্দে সম্ভব হত না।

স্বেচ্ছায় যদি ঘর ছাড়ে ধারতি তাহলে অবশ্য নিঃশব্দেই যেতে পারে। কিন্তু কেন ছাড়বে? নিজেকে কি সে ত্রিভনের পথের কাঁটা বলে ভেবেছিল? সাধারণ মেয়ে হ'য়ে রাজাকে নীচে টেনে আনছে বলে ধারণা হয়েছিল তার?

ত্রিভন ভাবতে বসে। এতদিন ধরে ধারতির সংগে যত কথা হয়েছে সব ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যাচাই করতে থাকে। কিন্তু তেমন কোন সিদ্ধান্তে জোর করেও আসতে পারে না। বরং ধারতি সমস্ত প্রাণ মন দেহ নিয়ে তাকে চেয়েছে। আত্মহত্যার প্রবৃত্তি তার হ'তে পারে না কখনই।

ছট্‌ফট্ করে ত্রিভন।

শেষে ঘোড়ার পিঠে গিয়ে লাফিয়ে ওঠে। সে ছোটে পারাউ সর্দারের কুটিরের দিকে।

শোকাকুল পারাউ সর্দার ঘোলাটে চোখ তুলে দেখে, দ্বিতীয়বার তার আঙিনায় রাজা এসে দাঁড়িয়েছেন। বহুদিন আগে একবার এসেছিলেন খাড়ে

পাথর আর বরাহভূমরাজ—এর পরে আর রাজ সমাগমের সৌভাগ্য হয় নি তার অবহেলিত কুঁড়েঘরে।

রাজাকে অভ্যর্থনা করতেই হবে। যত দুঃখই হোক না কেন তার, রাজার সম্মান দিতেই হবে। সে যে সর্দার। পাশে নিজের লাঠিটা খোঁজে সে। লাঠি ছাড়া তার পক্ষে উঠে দাঁড়ানো অসম্ভব আজ। রাতে অনেকটা পথ খালি হাতে ঘুরেছে। শেষে আর পারেনি। পথের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল। কয়েকজন ধরে তুলে রেখে গিয়েছে তাকে দাওয়ার ওপর। সেই থেকে সেখানেই বসে রয়েছে সে। গোয়ালঘরে তখনো কুণ্ডকী বাঁধা—বাইরে আনেনি কেউ। ধারতি ছাড়া আর কে-ই বা আনবে।

ত্রিভন এসে বৃদ্ধের পাশে বসে পড়ে।

—জানতাম, সহজে পাওয়া যাবে না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে পারাউ।

ত্রিভন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চায়। বৃদ্ধ কি সন্দেহ করেছে কাউকে ?

—এ কথা কেন বললে সর্দার।

—বললাম এই জন্যে যে, লিপুর আত্মহত্যা করতে পারে না।

—মানুষখেকো বাঘ অনেক সময়ে ব্যাটাছেলেদের ডিঙিয়ে মেয়েদের নিয়ে যায় এ আমি জানি। কিন্তু এখন সেরকম বাঘ একটাও নেই। তাছাড়া দরজা খুলে তো আমরা ঘুমোই না।

—ভুলে খুলে রাখতে পারে।

—না। ভুলেও না। কালও দরজা বন্ধ হয়েছে।

—তবে কি তুমি অন্য সন্দেহ করছ সর্দার ?

—হ্যাঁ, চুরি করা হয়েছে আমার লিপুরকে।

—চুরি ? কিন্তু কেন ?

—রাণী হতে চলেছে বলে।

হিংসে অনেকেরই হতে পারে। সাধারণ এক তরুণীকে কুঁড়ে ঘর থেকে তুলে নিয়ে কিতাগড়ে প্রতিষ্ঠা করায় কোন কোন যুবতী আর বাপ-মায়ের মনের ভেতরে খচ্‌খচ্‌ করতে পারে। কিন্তু এতখানি দুঃসাহস সতেরখানির কোন লোকের হবে বলে ধারণাও করা যায় না। এ তো রাজার বিরুদ্ধে সোজাসুজি মাথা তুলে দাঁড়ানো। ত্রিভন ভেবে কূল কিনারা পায় না।

তার চিন্তারই যেন প্রতিধ্বনি তোলে পারাউ সর্দার—এমন দুঃসাহসও হতে পারে শুধু একজনের।

—কে—কে সে। ত্রিভন সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ায়।

পারাউ-এর ঘোলাটে চোখ তীব্র হয়ে ওঠে। সে সোজা রাজার দিকে দৃষ্টি ফেলে। শেষে চেপে চেপে বলে—মারাংবুরু।

—মারাংবুরু! ত্রিভন চিৎকার করে ওঠে।

—হাঁ রাজা। আপনার বাবার মৃত্যু রহস্যজনক হলেও, আমার কাছে তা জলের মতই পরিষ্কার। আর একজনও সন্দেহ করেছিলেন—নরহরি বাবাজী। তিনি সে কথা বলতেই, আমি আপনাকে জানাতে নিষেধ করেছিলাম। বোধ হয় আর কেউ জানে না।

—এ সন্দেহ কেন তোমার?

—বলব। আজ নিশ্চয়ই বলব। আমার লিপুরকে যখন চুরি করেছে সে, তখন কিছুতেই ছাড়ব না। বয়সটা যদি কিতাপাট বিশ বছরও কমিয়ে দিতেন। আজ দেখে নিতাম তাকে।

—কে সে? চঞ্চল হয় ত্রিভন।

—মংগল হেম্বরম।

—পূজারী! ত্রিভন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। শেষে ধীরে ধীরে বলে—সে বাবাকে মেরেছিল?

—হ্যাঁ। কোন ভুল নেই। দেশের লোক একে একে বৈষ্ণব হয়ে যাচ্ছে দেখে শংকিত হয়ে উঠেছিল সে। ভেতরে ভেতরে জ্বলছিল। রাজা যখন বলি বন্ধের আদেশ দিলেন, ক্ষেপে গেল সে। রাজা খাঁড়েপাহাড়ীতে ওঠার আগেই অন্য পথ দিয়ে গিয়ে একটা পাথর গড়িয়ে দিয়েছিল তাঁর মাথায়।

—সত্যি?

—নিজে চোখে কেউ দেখেনি। তবু কিতাপাট যেমন সত্যি—এও তেমন সত্যি।

—কিন্তু ধারতি?

—তাকেও সে-ই নিয়েছে। আমার প্রাণ ডেকে বলছে।

—মংগল কি জানেনা। আমি বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার চাইনা। সে কি জানেনা যে নরহরি বিদায় নিয়েছে?

—জানে হয়ত। কিন্তু এ-ও জানে মারাংবুরুর প্রতিপত্তি দিনের পর দিন কমে আসছে। লোকে ভীড় করছে গিয়ে কিতাডুংরিতে। এজন্যেও আপনি দায়ী। আগের রাজা শুধু রাজাই ছিলেন। আপনি হয়েছেন সাধারণের

একজন। এরপর লিপুর রাণী হলে সতেরখানির সাঁওতাল মুণ্ডা, ভুঁইয়া আর দিকুরা কি ভুলেও ওদিকে যাবে? মারাংবুরুর ঠাঁই হয়ে যাবে শ্মশান। তাই মংগল চায় না এ বিয়ে। সে চায় রাণী আসুক অন্য রাজার ঘর থেকে। ব্যবধান গড়ে উঠুক কিতাগড় আর কুঁড়েঘরের মধ্যে।

ত্রিভন পারাউ সর্দারকে জড়িয়ে ধরে—সর্দার এভাবে তো আমি কখনো ভাবিনি। তুমি আজ বৃদ্ধ বলে আমার দুঃখ হচ্ছে। আফশোষ হচ্ছে বুঝার সিং আর বাবার জন্যে। পংগু সর্দারকে বাতিল করার প্রথা তোমার ওপরও খাটিয়েছেন তাঁরা। বুঝতে ভুল হয়েছিল তাঁদের যে পারাউ সর্দারের মাথা তার হাত-পায়ের চেয়েও বেশী শক্তি রাখে।

দুঃখের মধ্যেও তৃপ্তিতে ভরে ওঠে বৃদ্ধের মুখমণ্ডল। রাজা সত্যিই মহৎ।
—চলি সর্দার।

পারাউ জানে কোথায় যাবার কথা বলছে ত্রিভন। ব্যস্ত হয়ে বলে—একা যাবেন?

—হ্যাঁ, মংগল হেম্বরমের সংগে দেখা করতে দুজনের প্রয়োজন হয় না।

—কিতাপাট আপনার সহায় হোন। কথাটা বলেই বুকের ভেতরে ছ্যাঁৎ করে ওঠে বৃদ্ধের। মনের মধ্যে ভেসে ওঠে তার একমাত্র ছেলের যৌবনদীপ্ত মুখ। যুদ্ধবেশে এসে বিদায় চাইলে এই একই কথা বলেছিল পারাউ। কিতাপাট তো সেদিন শোনেন নি। পারাউ ছটফট করে। বৃদ্ধ বয়সে কি শেষে ঠাকুর সম্বন্ধে সংশয় জাগল মনে!

আপন মনে বিড়বিড় করে উচ্চারণ করে পারাউ—না ঠাকুর, সন্দেহ নয়। অনেক আঘাত পেয়েছি। বড় দুর্বল হয়ে পড়েছি তাই। এই দুর্বলতাও তো তোমারই দান।

চোখ তুলে চেয়ে দেখে আঙিনা শূন্য। বিদায় নিয়েছে রাজা। দূরে পাহাড়ি পাথর থেকে অশ্বপদশব্দ ভেসে আসে।

সোজা গিয়ে মারাংবুরুর গুহার সামনে ঘোড়া থেকে নামে ত্রিভন। মন্দিরের দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হয় সে। চিৎকার করে ডাকে মংগল হেম্বরমের নাম ধরে। কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয় গভীর কন্দরে। কোন সাড়া নেই।

আবার ডাকে ত্রিভন।

নিস্তব্ধ চারিদিক। শুধু ভেতর থেকে একটা কুকুর বিকট শব্দে ঘেউ ঘেউ

করে ওঠে। যেন পাতাল থেকে ডাকছে। এ কুকুরকে কেউ কখনো দেখেনি —শুধু ডাকই শুনেছে।

অধৈর্য হয় ত্রিভন। ভাল করে চারিদিকে চেয়ে দেখে। হাতের বল্লমটা একবার নেড়েচেড়ে নেয়। শেষে বলে—আমিই ঢুকছি ভেতরে। সাবধান মংগল।

এবারে মানুষের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। পদশব্দ শোনা যায় যেন।

মুহূর্তে ত্রিভন ঠিক করে, একা ভেতরে যাওয়া ঠিক হবে না। আক্রান্ত হলে অসহায়ের মত আত্মসমর্পণ করা ছাড়া উপায় থাকবে না।

পদশব্দ এগিয়ে আসে। ত্রিভন অপেক্ষা করে।

মংগল হেম্বরম সামনে এসে দাঁড়ায়।

—রাজা।

—হ্যাঁ।

—এ রাজ্যে কি নির্জনে সাধনা করবারও অধিকার নেই কারও ?

—তোমার কাছে একটা কথা জানতে এসেছি মংগল। সত্যি বলবে।

—'তুমি' বলছ আমাকে ?

—হেম্বরম !

—মারাংবুরুর পূজারী কি নরহরি বোষ্টম যে সে অপমান সহ্য করবে ?

—চুপ কর। যা প্রশ্ন করছি তার ঠিকঠিক জবাব দাও।

—তুমিও সাবধান রাজা। মারাংবুরু এ-অপমান সইবেন না. তোমার বাবা প্রাণ দিয়ে তা দেখিয়েছেন।

—বাবার চেয়ে খাড়েপাহাড়ির প্রতিটি পথ আমার ভালভাবে জানা আছে মংগল। মাথায় পাথর পড়ার ভয় আমাকে দেখিও না।

—ত্রিভন।

—চুপ্। আর একটিও কথা না। এই বল্লম দেখছ—

মংগল থতমত খায়।

দাতে দাঁত চেপে ত্রিভন প্রশ্ন করে—ধারতি কোথায় ?

—ধারতি ? কে সে ?

—সবই জান তুমি। তবু বলছি যাকে কাল রাতে তুমি চুরি করেছ—সে-ই ধারতি।

—চুরি! মংগল লাফিয়ে ওঠে, সইবে না রাজা, সইবে না। তোমার দুর্দিন ঘনিয়ে এসেছে। মারাংবুরুর নামে আমি অভিশাপ দিচ্ছি।

সজোরে মংগলের গালে চপেটাঘাত করে ত্রিভন—ভাল চাও তো ধারতিকে দাও। অভিশাপ পরে দিও।

রাগে ফুলতে থাকে পূজারী। কোন জবাব দেয় না।

—মংগল। এই শেষ বার বলছি। জবাব না দিলে, মারাংবুরুর পূজারী কাল থেকে নতুন লোক হবে।

—আমি জানি না রাজা।

জবাব শুনে নিজেকে অসহায় বলে বোধ হয় ত্রিভনের। এর পরে কী করণীয় কিছুই বুঝে উঠতে পারে না সে। মংগলের মুখের প্রতিটি কুটিল রেখার দিকে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। দৃষ্টি ফেলে খাঁড়েপাহাড়ির চূড়ার দিকে, যেখানে মন্দির প্রতিষ্ঠার আয়োজন করতে গিয়ে নিহত হয়েছিলেন হেমৎসিং সম্মুখে দণ্ডায়মান এই পাষণ্ডের হাতে।

শেষে কর্তব্য স্থির করে ফেলে ত্রিভন। তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে মংগলের ওপর। ছায়ার মত ঘুরতে হবে তার সাথে সাথে। ঘুরতে হবে এই মুহূর্ত থেকে। প্রতিটি কার্যকলাপ দেখতে হবে আড়ালে বসে।

বিদায় নেবার ভান করে ত্রিভন বলে—আজ আমি যাচ্ছি। কিন্তু কাল আবার আসব এই সময়ে। ভেবে রেখো কি জবাব দেবে তখন।

একটা পংকিল হাসি ফুটে ওঠে পূজারীর মুখে। ত্রিভন লক্ষ্য করে সে হাসি।

ঘোড়ায় উঠে সে আস্তে আস্তে শাল বনের আড়ালে চলে যায়। সেখানে ঘোড়া থেকে নেমে তার পিঠ চাপড়ে বলে—অনেক খেটেছিস আজ বিজলী। এখন বিশ্রাম নে। এক পাও নড়িস না। খাওয়ার জন্যেও নয়। ধারতিকে উদ্ধার করতেই হবে। তোর পিঠে কত উঠেছে ও, মনে নেই!

বিজলী মুখ বাড়িয়ে দেয় ত্রিভনের মুখের সামনে।

—মনে আছে তো? হ্যাঁ, লক্ষ্মী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবি।

দৃঢ়পদে ত্রিভন আবার এগিয়ে যায় গুহার দিকে। হাতে বল্লম। গুহার পাশে ঝোপ। সেই ঝোপে লুকিয়ে থেকে নজর রাখতে হবে।

সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসে। একা একা বসে থাকে ত্রিভন ঝোপের মধ্যে। সহস্র মশা এসে ছেঁকে ধরে তাকে, তবু বিন্দুমাত্র নড়েনা সে। নড়লে ধরা পড়ার সম্ভাবনা।

চারদিক নির্জন। এতক্ষণে বাঘরায়ের দল নিশ্চয়ই ফিরেছে কিতাগড়ে।

হাতের বল্লমটার দিকে চায় ত্রিভন। ওইটিই একমাত্র ভরসা। বাঘ ভালুক এগিয়ে এলে রক্ষা নেই। সাপেও ছোবল মারতে পারে। তবু থাকতে হবে। থাকতে হবে ধারতির জন্যে।

ত্রিভন জানে, মংগলের সংগে যে ব্যবহার করেছে, তাতে সে চূড়ান্ত প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবে। ধারতি বেঁচে আছে কিনা কে জানে। এতক্ষণ বেঁচে থাকলেও আজকের রাতের পরে যে থাকবে না, এবিষয়ে নিঃসন্দেহ ত্রিভন।

খাঁড়েপাহাড়ির এক অংশে দাবানল জ্বলে ওঠে। বন্য জন্তুর চিৎকার শোনা যায়। অগ্নিশিখা মারাংবুরুর গুহাকে রাঙিয়ে তোলে। ত্রিভন জড়োসড়ো হয়ে বসে। শেষে দাবানল এক সময় ধীরে ধীরে নিভে যায়। রাত আরও গভীর হয়।

মশার কামড়ে সারা গা ফুলে ওঠে। বসে থাকতে থাকতে পা অবশ। ধীরে ধীরে পা নাড়ায় ত্রিভন।

তবে কি ধারতি নেই এখানে? পারাউ সর্দারের সন্দেহ কি অমূলক? বদমেজাজী বলে সবকিছুতেই হয়ত মংগলের দোষ দেওয়া হয়। আসলে সে অত খারাপ কিনা কে জানে। মারাংবুরুকে ভালবাসে সে। সে ভালবাসায় কোন পাপ থাকতে পারে না। মারাংবুরুর সম্মানের জন্য যদি সে খারাপ কথা বলে ক্ষতি কি? অবশ্য রাজাকে কড়া কথা বলা অন্যায় বলে ভাবে অনেকে। কিন্তু দেবতার পূজারী রাজার বাধ্য কোন কালেই হয় না। বরং রাজাই এসে তার সামনে নতজানু হয়। বাবাকে দেখেছে ত্রিভন। প্রতি পদে তিনি নরহরির পদধূলি নিতেন। নরহরি অবশ্য কড়া কথা বলত না—সে বৈষ্ণব।

হঠাৎ গুহার ভেতরে ক্ষীণ আলোর রেখা চোখে পড়ে। সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সজাগ করে তোলে ত্রিভন। বুকের ভেতর তার ঢিপ্‌ঢিপ্‌ করে। মংগল হেম্বরম্‌ নিশ্চয়ই। এত রাতে তার আলো জ্বালাবার প্রয়োজন হল কেন?

আলো সামনের দিকে এগিয়ে আসে। এবারে ত্রিভন স্পষ্ট দেখতে পায় মংগলকে। তার মুখে আলো পড়ে বীভৎস দেখায়। ভেতর থেকে কুকুরের ডাক ভেসে আসে—তেমনি বিকট।

গুহার বাইরে চারদিকে ঘুরে দেখে নেয় মংগল। ত্রিভনের একেবারে কাছে চলে আসে একবার। ভয় হয় ত্রিভনের। সমস্ত কিছু বুঝি পণ্ড হলো। ধরা পড়ে গেলে মংগলকে নিহত করা ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই। মাটির ওপর আস্তে আস্তে হাতটা নিয়ে গিয়ে সে পাশের বল্লম চেপে ধরে।

কিন্তু মংগল দেখতে পেল না তাকে। সে কল্পনা করতে পারেনি, ওইটুকু ঝোপের মধ্যে স্বয়ং রাজা বসে রয়েছে ওৎ পেতে। সে জানে রাজা কালকের আগে আসবে না। তবু ঘুরে দেখে গেল একবার। সাবধানের মার নেই।

ত্রিভন উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে। জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ে তার উত্তেজনায়। মংগল ধীরে ধীরে গুহায় ফিরে যায়। তার পরবর্তী কার্যকলাপ কি হবে আন্দাজ করা যায় না।

কুকুরটা ডেকে ওঠে ভেতর থেকে। ওটাকে সংগে নিয়ে যদি বাইরে আসত মংগল তবে লুকিয়ে থাকা সম্ভব হতো না কিছুতেই। জন্তুটা বোধ হয় কখনো বাইরে আসে নি—সূর্যের আলো দেখার সৌভাগ্য হয় নি। বন্দী হয়ে থেকে হিংস্র হয়ে উঠেছে নিশ্চয়। তাই মংগল তাকে সংগে রাখতে ভয় পায়।

সে সবাইকে বলে ওই কুকুরের মধ্যে দিয়ে মারাংবুরুর ইচ্ছা প্রকাশ পায়। তাই কুকুরকে ঘিরে রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে সতেরখানি তরফে—এমনকি তরফের বাহিরেও। এই রহস্যের উদ্ঘাটন করতে চায় না মংগল—তাই বাইরে আনে না।

ত্রিভনের ভয় হয়। গুহার শক্ত কাঠের দরজা হয়ত বন্ধ করে দেবে মংগল। ধারতি যদি ভেতরে থাকে? এখনই হয়ত তাকে ঠেলে কুকুরের সামনে ফেলে দেওয়া হবে। মুহূর্তে দেহটি হবে ছিন্নবিচ্ছিন্ন। বল্লম হাতে নিয়ে দুই পায়ের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়ায় ত্রিভন।

কিন্তু না। দরজা বন্ধ হয় না। আলোর রেখা কিছুক্ষণের জন্যে ভেতরে মিলিয়ে গিয়ে আবার এগিয়ে আসে। তাড়াতাড়ি বসে পড়ে সে। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে মংগল একটা বোঝা টেনে নিয়ে আসছে। তবে কি ধারতি নেই? সব শেষ হয়ে গেল? মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করে ওঠে তার।

না না। ওই তো দাঁড় করিয়ে দিল। হ্যাঁ, ধারতি—নিশ্চয় ধারতি। চিনতে ভুল হয় না ত্রিভনের। হাত-পা বাঁধা ধারতির—মুখ বাঁধা। শয়তান নির্দয়ভাবে ফেলে রেখেছিল ওই অবস্থায়।

ছুটে যেতে ইচ্ছে হয় ত্রিভনের। কিন্তু তাতে সুফল নাও ফলতে পারে। মংগলের হাতে দাএম—খড়্গ। মানুষের অস্তিত্ব জানতে পারলে সে আর দেরী করবে না। সোজা দাএম চালাবে ধারতির ওপর।

কিন্তু কি করতে চায় শয়তান?

ধারতিকে ধরে টেনে নিয়ে আসে সে গুহার একেবারে সামনে, যেখানে কুকুর বলি দেওয়া হয়। মাত্র দশ হাত দূর থেকে ত্রিভন চেয়ে থাকে।

হাত-পা-মুখের বাঁধন খুলে মংগল বলে—কেন এখানে আনা হয়েছে জানিস্?

পারতি স্তব্ধ। অনুভব শক্তি নেই যেন তার।

—এই হাত আর এই খড়্গ অনেক মানুষের মাথা নামিয়েছে।

পারতি কাঁপেনা একটুও।

—ত্রিভন? হুঃ। তার বাপের ও-দশা কে করেছিল? এই আমি। পাথর দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলাম তার মাথা। তোর ত্রিভনেরও সেই দশা হবে—হবেই। তোকে পাশে নিয়ে কাঁটারাঙ্গায় আর বাঁশী বাজানো চলবে না।

ত্রিভন চমকে ওঠে। পারতির চোখেও যেন বিস্ময়।

—ভাবছিস্, দেখেনি কেউ, তাই না? মারাংবুরুর চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। হুঁ।

খড়্গাটা মাটিতে নামিয়ে রাখে মংগল। পারতির একেবারে কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়। তার কপালে আঙুল ছুঁইয়ে বলে—বাঁচতে পারিস এখনো। সব পথ বন্ধ হয় নি এখনো। রাজী আছিস্?

কোন্ পথের কথা বলছে পাষণ্ড? ত্রিভন ভাবতে চেষ্টা করে।

—হ্যাঁ। ভেবে উত্তর দিবি। যাবি আমার সংগে সাতেরখানি ছেড়ে? আমার কাছে থাকবি?

ত্রিভনের ইচ্ছে হয় কুকুরটার ওপর লাফিয়ে পড়ে। অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করে সে। শেষ অবধি দেখতে হবে।

পারতি রাগে দুঃখে মাটিতে পদাঘাত করে। প্রথম কথা বলে সে—তোর মুখে পোকা পড়বে।

—তবে প্রস্তুত হ। আগুন জ্বলে মংগলের সাপ-চোখে।

—আমি প্রস্তুত। কিন্তু বাজা তোমাকে ছাড়বে না—একথা বলে দিচ্ছি।

আর অপেক্ষা করা সংগত হবে না। ত্রিভন ভাবে। এখনো খড়্গাটা মাটিতে পড়ে রয়েছে। এর পর নিশ্চয়ই হাতে তুলে নেবে। তখন সময় পাওয়া যাবে না।

বিদ্যুৎগতিতে ছুটে গিয়ে খড়্গাটা পা দিয়ে চেপে ধরে বল্লম উঁচিয়ে দাঁড়ায় ত্রিভন।

—এক চুলও নড়িস না কুকুর।

ছাই-এর মত সাদা দেখায় মংগল হেম্বরমের মুখ। এই অপ্রত্যাশিত পরিণামের কথা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। তার মাথাটা একপাশে কাত হয়ে

পড়ে। সে জানে এর পরে কি হতে পারে। ভয়ে শিউরে ওঠে—গা কাঁপতে থাকে।

হাত-জোড় করে বলে—জাংগালা তারে, আশ্রয় এমালেম্।

—থির কোঃপে। ত্রিভন চেঁচিয়ে ওঠে। সে জানে এই সব হীন চরিত্রের লোকেরা সব কিছুই করতে পারে।

—আম্ রাজা। ইঞ আমরেণ্ হোপন কানালে।

এতক্ষণ ধারতি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যা ঘটছে সব যেন স্বপ্ন—বাস্তবের সংগে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। ত্রিভনও তার দিকে চাইবার অবসর পায়নি। সম্মুখে জঘন্য শত্রুকে রেখে কোনদিকে দৃষ্টি ফেলা যায় না। তাতে ঘোর বিপদ।

অনুভব শক্তি ধীরে ধীরে ফিরে আসে ধারতির। বুঝতে পারে স্বপ্ন নয়—যা ঘটছে অবিশ্বাস্য হলেও তা-ই সত্যি।

মংগলের কাকুতি শুনে ধারতি বলে—কখনো নয়, কোন ক্ষমা নেই। ও হীন, ও নরক।

ত্রিভনের বল্লম ক্ষীণ আলোয় ঝল্সে ওঠে। পরমুহূর্তে মংগল লুটিয়ে পড়ে মাটিতে।

কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থাকে ত্রিভন মৃত পূজারীর দিকে। লোকটির বলিষ্ঠতা ছিল। সেই বলিষ্ঠতা সতেরখানির প্রতিটি লোকেরই কাম্য হওয়া উচিত। কিন্তু মংগলের বলিষ্ঠতাকে আচ্ছন্ন করেছিল তার মনের নোংরামি আর কুটিলতা। নইলে সে ত্রিভনের রাজত্বে শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারত।

গুহার কুকুরটি আবার ডেকে ওঠে।

ধারতি নিশ্চিন্ত হয়ে ভেঙে পড়ে ত্রিভনের বুকের ওপর।

বিজলী আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে ধারতি।

—চল। অবিশ্রান্ত জল ঝরে তার চোখ দিয়ে।

—একটু দাঁড়াও। একে এভাবে ফেলে গেলে তো চলবে না। কোন গুহার মধ্যে লুকিয়ে রাখতে হবে। যদি কেউ জানতে পারে একে আমিই মেরেছি, তাহলে খারাপ ফল ফলতে পারে।

আবার আনন্দের জোয়ার আসে বাটালুকায়—জোয়ার আসে সমস্ত সতেরখানি তরফে :

রাজা ত্রিভন সিং ভূঁইয়ার বিবাহ।

পারাউ সর্দারের ছোট্ট কুঁড়েঘর কোন্ সুদূর অতীত থেকে ম্লান হয়ে পড়ে ছিল এক কোণে। মৃত্যুর বিভীষিকা এতদিন যেখানে ছিল পরিব্যাপ্ত—আজ আবার সেখানে নতুন জীবনের রঙ ধরল।

বুধকিস্কু আর সারিমুর্মু বলেছিল যে বিয়ে হওয়া উচিত কিতাগড়ে। ত্রিভন শোনেনি। সে যে সতেরখানির শত শত অধিবাসীরই একজন। সে প্রবীণ সর্দারদের কথা মানবে কেন? ওরা পুরোনো রীতিতেই অভ্যস্ত। তাই বাঘরায়ের মতামত জানতে চেয়েছিল সে।

বাঘরায় ঘাব্ড়ে গিয়ে বলেছিল—আমাকে তাহলে আর একজনের কাছ থেকে জানতে হয় রাজা।

—কে?

—ছুট্কী। সংকোচে বলেছিল বাঘরায়।

—ঠিক। শুনে এসো। ত্রিভন হেসে উঠেছিল।

শুনতে বেশী সময় লাগেনি বাঘরায়ের। কিছুক্ষণ পরেই ছুটে এসে জানিয়েছিল ছুট্কীর মতামত। পারাউ সর্দারের ঘরেই বিয়ে হওয়া উচিত। সবাই আসবে—সব কিছু দেখবে—তবে তো আনন্দ।

পারাউএর আনন্দের সীমা নেই। বিষপাত্রের তলানিটুকু যে অমৃত, তা কি জানত সে? হে কিতাপাট! অনেক সন্দেহ করেছি তোমায়। ক্ষমা করো। ক্ষমা করো।

অবিরল ধারায় জল গড়িয়ে পড়ে বৃদ্ধের চোখ দিয়ে। মনে পড়ে তার খাঁড়িপাথরের কথা, সামনে ভাসে যুঝার সিং আর হেমৎ সিং-এর মুখ। স্পষ্ট দেখতে পায় একমাত্র ছেলে রাজু আর নাতনি সাওনার সুঠাম চেহারা। 'হাওয়া-ছকে' যন্ত্রণাকাতর লিপুরের মায়ের মুখচ্ছবিও ভেসে ওঠে। অভাগী জানত না সে রাণীর মা।

হে কিতাপাট! এত আনন্দ শুধু আমার জন্যেই তুলে রেখেছিলে? তাদের তো কিছুই দিলে না। আমাকে আগে-ভাগে টেনে নিয়ে যদি তাদের রাখতে তাহলে ওপর থেকে দেখে যে আরও আনন্দ পেতাম।

দেখ্ রাজু দেখ্, তোরই সাওনার মেয়ে। সবই তো দেখতে পাচ্ছিস্। দেখ্ সাওনা—তোর যে আজ কত আনন্দ তা কি জানিনে রে দাদু। দেখো গো লিপুরের মা, সব বিষটুকু গিলে লিপুরের জন্যে কী

রেখে গিয়েছ। দেখো, ভাল করে দেখো-দেখে তোমাদের মন জুড়োক—চোখ জুড়োক।

পারাউ ডুকরে কেঁদে ওঠে।

শুকোল কোথা থেকে ছুটে এসে সদারকে কাঁদতে দেখে বলে—ও কি গো সর্দার, কাঁদো কেন?

—কাঁদি কি আর সাধে রে।

শুকোল গম্ভীর হয়। সর্দারের চিন্তা যেন তার মধ্যেও সংক্রামিত হয়। সে তো সবই জানে। তারা যে সর্দারের চার পুরুষের প্রতিবেশী।

—তবু কেঁদো না। অমংগল হয়।

—না না, আর কাঁদব না। চোখের জল মুছে ফেলে পারাউ।

বাইরে হৈ হৈ শুনে তারা বেরিয়ে আসে।

একদল লোক এসেছে সংগে হাণ্ডি আর ফুল। এই দুটোই তাদের সব চাইতে প্রিয় জিনিষ। রাজা-রাণীকে উপহার দেবে। ঘাড়ে করে বয়ে এনেছে মাদল—এনেছে বাঁশী।

শুকোল হাসতে হাসতে চিৎকার করে—এ যা, কোড়াকো আপে দ তুমদাঃ টামাক রুইপে।

মাদল বেজে ওঠে।

—না না। এখন মাদল বাজাবে কি? পারাউ ইতস্তত করে। রাজাই আসেন নি তো এখনো।

—আরে রাখো সর্দার। আনন্দ করতে এসেছে—চুপ করে বসে থাকবে?

—তা ঠিক, তা ঠিক। যা ভাল বুঝিস কর তোরা। এ তো তোদেরই উৎসব।

শুকোল চিৎকার করে—তিরিও অরং পে।

মাদলের সাথে বাঁশীও সুর ধরে সংগে সংগে।

শুকোল উৎসাহে আরও উত্তেজিত হয়। কতকগুলি মেয়ে খোঁপায় ফুল গুঁজে হাসছিল আর ভংগী করছিল। শুকোল তাদের দিকে চেয়ে বলে—কুড়ি কো এনেঃ মা।

কিন্তু মেয়েরা নাচতে দ্বিধা বোধ করে। গলায় হাণ্ডি না ঢাললে মনে উৎসাহ আসে না, পায়ে বলও পাওয়া যায় না। সংকোচ থেকে যায়।

—হাণ্ডি খাই তবে ? একজন মেয়ে বলে বসে।

—না না। আগে থেকে মাতাল হয়ে পড়িস না। তোরা দেখছি সব তাতেই বাড়াবাড়ি করিস্। একগাদা মাতালের মধ্যে কি শেষে রাজার বিয়ে হবে ?

সারারাত্রি হৈ চৈ করে আর হাণ্ডি খেয়ে মেয়ে পুরুষ সবাই ঢুলে পড়ে। পারাউ সর্দার অবসন্ন হয়ে একপাশে শুয়ে থাকে।

স্তূপীকৃত বন্যফুলের মধ্যে জেগে থাকে শুধু রাজা আর রাণী—ত্রিভন আর ধারতি। এতদিন পরে পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তির হাসি উভয়ের মুখে।

—কিতাগড়ে এমন চাঁদের আলো পাওয়া যেত না ধারতি।

—বাঁশী বাজাবে ?

—সে কি, আমি না রাজা ?

—আমার রাখাল রাজা। নরহরি ঠাকুরের মুখে রাখালরাজার কথা শুনেছি।

—অত কালো আমি ?

—জানি না। ঠিক সেই রকম।

—বেশ। তবে তাই। ত্রিভন হাসে।

—বাজাও না।

—বাঁশী কোথায় ?

—আছে।

—তুমি কোথায় পেলে !

—তোমারই। ফেলে রেখেছিলে পাথরের ওপর। চুরি করে এনেছি।

—দেখি।

ফুলের স্তূপের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে আস্তে আস্তে বার করে দেয় ধারতি।

—বাজাবো ?

—হুঁ।

—সত্যি !

—হুঁ।

ত্রিভন ধীরে ধীরে বাজায়। সে সুর রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে ভাসতে ভাসতে মহুয়া গাছ ছাড়িয়ে কাঁটারাঙ্গার শালবনের পাতা ছুঁয়ে দিগন্তে গিয়ে মেশে।

বাহিরে বাঘরায় সজাগ প্রহরী—তার সংগে সাদিয়াল আর চোয়াড়রা। তারা শোনে। ত্রিভনের খেয়াল ছিল না এসব। সে অনুভব করে পৃথিবীতে শুধু সে আর ধারতিই জেগে।

ছুট্‌কীর কথা মনে হয় বাঘরায়ের। সে ঘরে ফিরে গিয়েছে।

বহুদিন পরে বন্ধু ডুইঃএর কথা মনে হয়। সে যদি থাকত আজ তাদের মধ্যে। চোখের কোণা আঙুল দিয়ে মুছে ফেলে বাঘরায়।

পরদিন সকালে স্ত্রীপুরুষ পরিবেষ্টিত হয়ে রাজা-রাণী চলে নিকটের জলাশয়ে। ত্রিভনের হাতে তীর ধনুক—ধারতির মাথায় কলসী। বিয়ের পরদিন এই আচার পালন করে তরফের সাধারণ অধিবাসীরা। ত্রিভনও আপত্তি করেনা।

জলাশয় থেকে ফেরার পথে ধারতি আগে আগে চলে জলপূর্ণ কলসী মাথায় নিয়ে। ত্রিভন অনুসরন করে তাকে। সে তার ধনুক থেকে একটি একটি করে তীর নিক্ষেপ করে সামনের দিকে। ধারতি কলসী-মাথায় সেই তীর কুড়িয়ে নিয়ে ত্রিভনের হাতে ফিরিয়ে দেয়।

বৃদ্ধ পারাউ সর্দার লাঠিতে ভর দিয়ে সংগে সংগে চলছিল।

সে গম্ভীর স্বরে বলে—এই আমাদের ব্রত রাজা। অস্ত্রবিদ্যায় নৈপুণ্যই শ্রেষ্ঠ পুরুষের লক্ষণ। যুদ্ধের জাত আমরা—যুদ্ধ ছাড়া বাঁচতে পারিনা। পুরুষরা যদি যুদ্ধে নিপুণ না হয় তাহলে কি আমাদের অস্তিত্ব থাকবে? তাই এই অনুষ্ঠান—এই তীর নিক্ষেপ।

বৃদ্ধ একটু থামে। চলতে চলতে কথা ব'লে সে হাঁপিয়ে পড়ে। তাই একটু দম নিয়ে আবার সুরু করে,—কিন্তু পুরুষেরা নিপুণ হলেই তো শুধু চলবে না রাজা। পেছনে চাই প্রেরণা। কোথায় তার প্রেরণা?

ধারতির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে,—ওই তো প্রেরণা। পুরুষের সব কাজে ওরা সাহায্য করে। ভেঙে পড়লে সান্ত্বনা দেয়। তবেই তো পুরুষেরা হবে দুর্জয়—দুঃসাহসী। যে তীর ছুঁড়ছেন আপনি, সেই তীর কুড়িয়ে দিয়ে ধারতি আপনাকে সাহায্য করছে, প্রেরণা দিচ্ছে। সুখে দুঃখে বিপদে আপদে সব সময়েই আপনার পাশে থাকবে ও। কখনো একা ফেলে রেখে সরে দাঁড়াবে না।

বিস্মিত ত্রিভন সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে সর্দারের দিকে চেয়ে থাকে। শেষে বলে—আজ আমার একটা কথা রাখতে হবে সর্দার।

—বলুন।

—ধারতির গুরুজন তুমি—আমারও গুরুজন। পদধূলি দাও।

পারাউ যেন দশহাত পেছিয়ে যেতে পারলে বাঁচে। কিন্তু সে স্থবির, সে অক্ষম। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে বলে—ছি ছি—রাজা। তা হয় না। ত্রিভন বলে,—খাড়েপাথরের শক্তি তুমি। বুদ্ধি তুমি। তাই আজ আমি রাজা। বাধা দিওনা। এ সুযোগ আর পাবনা।

সবার চোখে আনন্দাশ্রু। পারাউ-এর চোখেও।

সতেরখানির অধিবাসীদের সামনে ত্রিভন পদধূলি নেয় সাধারণ এক সর্দারের।

নিশ্ছিদ্র মেঘ বাটালুকার ওপর। দূরের খাঁড়েপাহাড়ি চোখে পড়ে না। কাঁটারাঙ্গাও ঝাপসা। কিতাডুংরির ওপর বৃষ্টির ধারা নেমেছে। সতেজ শাল বনের পাতায় অবিশ্রান্ত শব্দ। ব্যাঙ ডাকছে—ঝিঁঝিঁ ডাকছে। সাপ ছুটে চলেছে পাহাড়ী পথ ডিঙিয়ে উঁচু আশ্রয়ের খোঁজে।

সাঁওতাল মুণ্ডাদের কুঁড়ে ঘরে শিশুরা চেঁচাচ্ছে ক্রমাগত পাতায় ছাওয়া ছাদের ফুটো দিয়ে জল এসে পড়ছে তাদের গায়ে। শুকনো জায়গা নেই ঘরের কোথাও।

শুয়োরের পাল গড়াগড়ি দিচ্ছে বৃষ্টির মধ্যে। বাছুর ডেকে চলেছে উঠোনে দাঁড়িয়ে—মা তার বাইরে গিয়েছে পেট ভরাতে। মোষের দল ডোবার মধ্যে গা চুবিয়ে মাথা উঁচিয়ে সুখের দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। অসংখ্য জোঁক যে তাদের পা কামড়ে ধরে রক্ত চুষে খাচ্ছে সেদিকে খেয়াল নেই।

শ্রাবণ মাস। এমন বর্ষা বহুদিন হয় নি। বুড়োরা বলে যুঝার সিং-এর আমলে নাকি একবার হয়েছিল।

ছুটকী তার ঘরে বসে কাঁথা সেলাই করে। গর্ভবতী সে। বৃষ্টির একঘেঁয়ে শব্দ মাঝে মাঝে তাকে অন্যমনস্ক করে দেয়। হাতের কাজ থেমে যায়। সামনের পলাশ গাছের দিকে চেয়ে সে অস্ফুট স্বরে এক কলি গান গেয়ে ওঠে। সংগে সংগে বুকের ভেতরটাও কেমন যেন মোচড় দেয়। এমনি এক শ্রাবণের দুপুরেই সে গানখানি প্রথম শুনেছিল। সেদিন মনের ভেতরে গেঁথে গিয়েছিল এর সুর—এর প্রতিটি কথা। এখনো তাই অন্যমনস্ক হলেই গেয়ে

ওঠে মাঝে মাঝে। মনে হয় যেন নিজে গাইছে না। সেদিনের সেই মিষ্টি গলাই যেন ভাবে বিভোর হয়ে তার কানে ঢেলে দিচ্ছে এক স্বর্গীয় সুধা। ডুইঃ-এর উদার করুণ মুখখানা তার ঝাপসা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। শ্রাবণের ধারার সংগে ধারা মিলিয়ে দুফোঁটা অতিরিক্ত জল বাটালুকার মাটিতে মেশে।

আঙিনায় ছলাৎ ছলাৎ শব্দ হয়। গরু নয়। কোন মানুষ আসছে জলের মধ্যে দিয়ে। বাঘরায়ের আসার সময় হয়েছে।

সে-ই।

ছুট্‌কী কাঁথা গুটিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

—কি হল? মুখখানা যে আকাশের মতই। বাঘরায় বলে।

ম্লান হাসে ছুট্‌কী।

—উহুঁ। শুধু হাসলে তো চলবে না। দস্তুরমত কথা বলতে হবে। বাঘরায় জড়িয়ে ধরে ছুটকীকে।

—এখনো পাগলামী গেল না।

—স্বভাব কি না-মরলে যায়? বল তো মরি।

ছুট্‌কীর মুখ গম্ভীর হয়।

—রাগ হলো! বেশ, কিছু বলব না।

ছুট্‌কীকে হাসতে হয়। বলে—এবারে কি কিতাডুংরির উৎসব হবে না? শ্রাবণ আসতেই যা বৃষ্টি।

—সেই তো ভাবনা সবার।

—রাজা কি বলেন?

—তিনি বলেন উৎসব কখনো বন্ধ হয় না। হবেই।

—ঠিক। তাছাড়া এবার রাজারাণী একসঙ্গে যাবেন।

—হ্যাঁ। কিন্তু এরকম বাদল চললে?

—তবু হবে। এই একটাই তো উৎসব। একি বন্ধ করা চলে?

—লোক হবে না। দূরের কেউ-ই আসতে পারবে না।

—ঠিক আসবে। কিতাপাটের ইচ্ছে হলে কাল সকালেই সূর্য উঠবে।

—জানাব রাজাকে।

—কি?

—তোমার কথা। তিনি তো তোমার কথার খুব মূল্য দেন।

—যাও, কি যে বল।

—সত্যি।

—আর রাণীর কথার?

—তা জানি না। সেকথা রাজাই ভাল জানেন। বাঘরায় হাসে।

—বাবা এসেছিল আজকে।

—কেন?

—এমনি। আমাকে দেখতে। গোয়ার-গোবিন্দর হাতে দিয়ে কি নিশ্চিন্ত থাকতে পারে?

—ও, তাই বুঝি?

—বাবা নাকি অবসর নেবে। রাজাকে তাই জানিয়েছে।

—আমি জানি। কিন্তু চাইলেই কি অবসর পাওয়া যায়? তেমন লোক কোথায় সর্দার হবার?

—সতেরখানিতে কে-উ নেই?

—চোখে পড়ে না। ডুইঃ সেই করে ছেড়ে গিয়েছে আমাদের, তার জায়গায় কেউ এল না এতদিনে। অবিশ্যি ডুইঃ-এর মত সর্দার আর আসবেও না।

ছুট্‌কী আবার অন্যমনস্ক হয়। বাইরের মেঘে-ঢাকা সূর্যের আলো আরও কমে এসেছে। শালগাছের ছায়া দুপুরেই সন্ধ্যার আঁধার সৃষ্টি করেছে।

খুব আস্তে আস্তে বাঘরায়কে বলে ছুট্‌কী—নিয়ে গেলে না তো?

বাঘরায় জানে কিসের কথা বলছে ছুট্‌কী। ডুইঃ-এর মৃত্যুর পর অনেকবারই একথা বলেছে ছুট্‌কি, ডুইঃ-এর প্রসংগ তুললে একবার অন্ততঃ বলবেই। তাই আজকাল বাঘরায় এড়িয়ে যায় এসব কথা। তবু বন্ধুকে ভুলতে পারে না বাঘরায় —ভুলতে পারেনা তার জীবনের শেষ মুহূর্তটুকু। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাই এক এক সময়ে বলে ফেলে। তখনই ছুট্‌কির প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়।

ছুট্‌কী চায় একবার আমদাপাহাড়িতে যেতে। দেখতে চায় সেই টিলা, যেখানে নাগা সন্ন্যাসীদের বিধ্বস্ত করা হয়েছিল। বিশেষ করে দেখতে চায় সেই জায়গাটি যেখানে ডুইঃ তার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিল।

শোকের মুখে বাঘরায় কথা দিয়ে ফেলেছিল, নিয়ে যাবে ছুট্‌কীকে সেখানে। সে সদিচ্ছাও তখন ছিল তার। কিন্তু কাজের চাপে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

আজকাল ছুট্‌কী যাওয়ার কথা বললেই বুকের ভেতরটা যেন কেমন করে

ওঠে। একটা চাপা ব্যথা অনুভব করে সে। প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হল—মারাও গেল। দ্বিতীয় সন্তান ছুট্‌কীর গর্ভে। এখনো কেন সে ওকথা বলে? কেন সে ভুলতে পারেনা ডুইঃকে ? ডুইঃ তো ছুট্‌কীর বন্ধু ছিলনা।

ছুট্‌কীর কথার জবাবে বাঘরায় তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—যাব, নিশ্চয়ই যাব। ব্যস্ত হচ্ছ কেন?

—কতদিন হয়ে গেল।

—সেই টিলা এখনো অক্ষয়ই আছে। ঝড় জল বৃষ্টিতেও ক্ষয়ে যাবে না।

—ও। ছুট্‌কী স্তব্ধ হয়। বাঘরায়ের কথায় উষ্ণতা। এমনভাবে তো সে কোনদিনও কথা বলেনি। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ছুট্‌কী, আর কখনো ভুলেও এ-অনুরোধ করবে না। মরে গেলেও নয়।

মনের ভেতরে পরিচিত এক সুর আবার গুন্‌গুনিয়ে ওঠে—সে সুর শ্রাবণের—সে সুর বিষাদের।

পারাউ মুমু'র মৃত্যু হল এতদিনে।

বংশের শেষ বাতিটিকে ঝড়-জলের ঝাপ্‌টা থেকে বাঁচিয়ে সুরক্ষিত স্থানে স্থাপন করে সে নিশ্চিন্ত মনে তার কিতাপাটের চরণে ঠাঁই নিল।

ধারতি কাঁদল খুব। পৃথিবীতে তার আপন জন বলতে রইল শুধু ত্রিভন। কুঁড়েঘরটির মায়ায় সে আচ্ছন্ন হল। কত পুরুষের বাস ছিল এখানে। পারাউ-এর মুখে শুনেছে খাড়েপাথর আসার বহু আগে ওখানে এসে ঘর তৈরী করেছিল তাদের পূর্বপুরুষেরা। তখন বাটালুকা গ্রামের চিহ্ন ছিলনা। কিতাগড়ের অস্তিত্ব ছিলনা কোন। শ্বাপদসংকুল গভীর বনের মধ্যে ছিল ইতস্ততঃ দুচার ঘর সাঁওতাল আর মুণ্ডা। দিনরাত যুদ্ধ করতে হত তখন—যুদ্ধ করতে হত হিংস্র জন্তুর সংগে। অধিকার ছিনিয়ে নিতে। তখন নাকি কিতাপাট ছিলেন না—ছিলেন শুধু মারাংবুরু।

পারাউএর ভিটে সেই সময়কার। কতবার ঘর ভেঙে পড়েছে,—আবার নতুন করে ঘর উঠেছে। কিন্তু ভিটে ছাড়েনি কেউ। এমনকি যুঝার সিং বারবার অনুরোধ করেও পারাউকে কিতাগড়ের কাছে আনতে পারেন নি।

শেষবারের মত ধারতি গিয়ে কুঁড়েঘরখানাকে ঘুরে দেখে। রাণী হয়ে বার বার আসা সম্ভব হবে না এখানে। আঙিনায় একটা খুঁটি পোঁতা রয়েছে।

কুণ্ড্ কী বাঁধা থাকত সেখানে। সেও মারা গিয়েছে পারাউ-এর আগেই। ধারতি চেয়ে চেয়ে দেখে আর কাঁদে। কত পরিচিত—কত আপন।

—সর্দারের অস্থি কিতাগড়ে নিয়ে যাওয়া হবে ধারতি। ত্রিভন বলে।

—কোথায় রাখবে সেখানে? চোখের জল মুছে বলে সে।

—আমাদেরই পরিবারের অস্থিশালায়।

ধারতি যেন বিশ্বাস করতে পারেনা। রাজপরিবারের অস্থিশালায় অন্য অস্থি স্থান পায় না। ত্রিভনের দিকে চেয়ে থাকে সে।

—সতেরখানির রাজাদের মত পারাউসর্দারও সম্মানীয়। আর একজন লোক অবশ্য ছিল।

—কে?

—ডুইঃ টুড়ু।

—হ্যাঁ, ডুইঃ টুড়ু। ধারতির মনে কোন সংশয় নেই।

—বাঘরায় নিয়ে এসেছিল তার অস্থি। কিন্তু তার ঘর থেকে সেটা হারিয়ে যায়। কি করে হারাল বুঝতে পারি না। বাঘরায় নিজেই অবাক হয়েছিল।

—বোধহয় খুব যত্ন করে রেখেছিল।

—যত্ন করে রাখলে হারায়?

—যত্নের জিনিসই তো হারায় রাজা।

অন্য সময় হলে ত্রিভন ভাবত ধারতি রসিকতা করছে। কিন্তু এখন সে কথা কষ্ট করেও ভাবা যায় না। ধারতির বিমর্ষ কণ্ঠস্বরে বিশ্বাসের গভীরতা।

পারাউ-এর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই আর একটি সংবাদ আসে অভাবনীয় ভাবে। স্তম্ভিত হয় ত্রিভন।

এক সন্ধ্যায় কিতাগড়ে এসে উপস্থিত হয় রান্‌কো কিস্কু। দেখেই চিনতে পারে সবাই। ত্রিভনও চেনে। তার প্রথম বিচারের বলি এই রান্‌কো—তার প্রথম যুদ্ধের বিশ্বকর্মা। রান্‌কোর কাছে মনে মনে লজ্জিত ত্রিভন। নাগা-যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে যখন শুনল রান্‌কো নেই—তখন থেকে নিজেকে অপরাধী বলে ভাবে। সেদিন থেকে তার উপকার করার সুযোগ খুঁজছে ত্রিভন। কিন্তু সম্ভব হয়নি। সতেরখানির কোথাও তার খবর মেলেনি—ঢাউরা দিয়েও নয়।

এতদিন পরে রান্‌কোকে আসতে দেখে ত্রিভন তাই তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে তার হাত চেপে ধরে।

—তোমার জন্য আমার শান্তি নেই রান্‌কো।

—কেন রাজা?

—কিতাডুংরির ঘটনা ভুলতে পারিনা।

ম্লান হাসে রান্‌কো। বলে—সেজন্যে দুঃখিত হবেন না রাজা। বিচারের সময় তো হাত-পা বাঁধা থাকে।

—সে নাহয় তুমি বুঝলে। কিন্তু তোমার মন? মন তো মেনে নিতে পারেনি।

—কি করে জানলেন?

—তোমার হাভভাবে। নাগা-যুদ্ধের আগে তোমার চেহারা দেখে তো আমি চমকে উঠেছিলাম। তাছাড়া ডুইংও আমাকে সব বলেছিল।

একটু যেন কেঁপে ওঠে রান্‌কো। মুখের রক্ত সরে যায় সাময়িকভাবে। শেষে বলে—কিন্তু উপায় কি?

—আমি জানিনা কী উপায়। তবে প্রার্থনা করি, তুমি যেন শক্তি পাও।

শক্তি আমি পেয়েছি রাজা। তাই আবার ফিরে এলাম। বাটালুকায় থাকব বলেই ফিরে এলাম। কিন্তু এবারে আপনার শক্ত হবার পালা।

—কেন?

—দুঃসংবাদ এনেছি।

—নাগা সন্ন্যাসী এসেছে?

—না।

—বরাহভূমের মহারাজ—

—তাও নয়। এ আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

—আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার? ত্রিভন টেনে টেনে বলে।

—রাণীমাকে আপনি যেদিন সতেরখানির সীমান্তে পৌঁছে দিয়ে এলেন সেদিন আমি সেখানেই ছিলাম।

—চিনতে পারিনি।

—কেউ-ই চিনতে পারত না। নাগাযুদ্ধের সময় যে চেহারা দেখেছিলেন আমার, তখন তাও অবশিষ্ট ছিলনা। তাছাড়া আমি ছিলাম সন্ন্যাসীর বেশে।

—তুমি সন্ন্যাসী হয়েছিলে?

—ভেবেছিলাম হবো। কিন্তু হইনি। শক্ত হয়েছি।

—বল, এবারে কি দুঃসংবাদ।

—রাণীমা শ্রীক্ষেত্রে যাবেন শুনে, আমি তাঁর সংগী হলাম। কিন্তু তীর্থক্ষেত্রে যাওয়া তাঁর ভাগ্যে হয়নি।

—মা যাননি শ্রীক্ষেত্রে ?

—না।

—কোথায় তিনি ?

রান্‌কো কিন্‌কু হাত তুলে আকাশের দিকে দেখায়।

—মা নেই ? ত্রিভন কেঁপে ওঠে।

—না।

—আর সবাই ?

—তারাও নেই।

—ঠগী—ঠগী দস্যুরা হানা দিয়েছিল ?

—না রাজা। হাওয়া ছক্।

দিনান্তে এক জলাশয়ের ধারে উপস্থিত হয়েছিল রাণীমার দল। পিপাসার্ত হয়ে সবাই পান করেছিল জলাশয়ের জল। কেউ জানতনা যে—ওলাউঠার মহামারী শেষ করে এনেছে সে অঞ্চলকে। একে একে মরল সবাই—সেই রাত্রেই। বাকী রইল দুজন—রান্‌কো আর নরহরি। কেন যে তারাও আক্রান্ত হলো না সে এক বিস্ময়।

—নরহরি কোথায় ? ত্রিভন নিজেকে সামলে নিয়ে ধীরে ধীরে প্রশ্ন করে।

—পালিয়েছেন। রাণীমার আর্তনাদ শুনেও দাঁড়ান নি এক মুহূর্ত।

—ভণ্ড।

—থাকতে বলেছিলাম তাকে। বলেছিলাম, দুজনাই ফিরে আসব বাটালুকায়। তিনি রাজী হলেন না। বললেন, এখানে নাকি স্থান নেই তার। বরাহভূমে চলে গেলেন।

—ভালই করেছেন।

—রাণীমাকে বাঁচাতে অনেক চেষ্টা করলাম রাজা। পারলাম না।

—তোমার কাছে আমি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবো। ত্রিভনের চোখ সজল হয়ে ওঠে। ধারতির মত তারও পৃথিবীতে আর কেউ থাকল না।

কোমর থেকে একটা ছোট্ট কৌটো বার করে রান্‌কো ত্রিভনের হাতে দেয়।

—কি এতে ?

—রাণীমার অস্থি।

—তুমি সৎকার করেছ রান্‌কো ? সত্যি বলছ ?

—শুধু রাণীমার নয় রাজা—সবারই সৎকার করেছি   তারা যে আমার সতেরখানির লোক।

ত্রিভনের গলার স্বর কেঁপে ওঠে—সতেরখানি সত্যিই তোমার। এমন ভাবে আমি তো কখনো দেখিনি সতেরখানিকে ?

—আমিও না। জানতাম না সতেরখানি আমার কত আপন। সেদিন প্রথম বুঝলাম। আপনিও একে ভালবাসেন রাজা। শুধু সে ভালবাসার যাচাই হয়নি এখনো।

ত্রিভন চিন্তামগ্ন হয়। তার ভাগ্যে দুঃখ আর আনন্দ এইভাবে পাশাপাশিই চলেছে চিরকাল। শুধু দুঃখ কিংবা শুধু আনন্দের স্বাদ পেলনা কখনো।

—আমি বাটালুকায় থাকতে চাই রাজা।

—আমিও তোমাকে রাখতে চাই।

—চোয়াড়ের দলে ঢুকিয়ে নিন আমাকে।

—হ্যাঁ। তবে সাধারণ চোয়াড় নয়। আজ থেকে তুমি সর্দার।

—অতবড় দায়িত্ব কি আমি বইতে পারব ?

—ওর চেয়ে বড় দায়িত্ব যদি থাকত, তাই দিতাম তোমাকে। ডুইঃ-এর জায়গা খালি পড়ে আছে অনেকদিন। সারিমুর্র বয়স হয়েছে। অবসর নিতে চায়।

—ঘর দোর কিছুই নেই আমার।

ত্রিভন একটু ভেবে বলে—ঘর আছে। থাকবে সেখানে ?

—কোথায় রাজা ?

—পারাউ মুর্র বাড়ী।

—সে তো তীর্থস্থান। এ আমার সৌভাগ্য। আশীর্বাদ করুন, যেন তাঁর মত সর্দার হতে পারি।

রান্‌কো চলে যায় কিছুক্ষণ পরে। ত্রিভন হাতের কৌটোটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। এত কথার মধ্যেও তার বারবার মনে পড়ছে—মাকেই। মায়ের স্নেহ কাকে বলে, ঠিক জানেনা সে। তবু তারই মা—রাজা হিমৎ সিং-এর স্ত্রী—তাঁর জীবনের পরিসমাপ্তি যে এভাবে ঘটবে কেউ তা কল্পনা করেনি।

নরহরিকে কোনদিনই মহাপুরুষ বলে ভাবেনি সে। সাধারণ বোষ্টম বলেই মনে করত। কিন্তু ধর্মের আড়ালে যে এতখানি মনুষ্যত্বহীনতা লুকিয়ে

ছিল কে জানত! শেষ সময়ে মা নিশ্চয় তাঁর মহাপুরুষটির পরিচয় পেয়ে গিয়েছেন।

ত্রিভন অন্দরে যায়। রাজা হেমৎসিং ভুঁইয়ার অস্থির পাশে একটি অপেক্ষাকৃত ছোট পাথরের নীচে আর একটি অস্থি রক্ষিত হবে আজ।

ধারতি ফুলের মালা গাঁথছিল তখন। কিতাগড়ে আসার পর থেকে তার কাজ হয়েছে দিনে একটা করে মালা গেঁথে ত্রিভনের গলায় পরিয়ে দেওয়া।

ত্রিভনকে দেখে সে বলে ওঠে—একি, এখনি এলে যে? আধ্যেকও তো গাঁথিনি।

ত্রিভন কথা বলেনা।

—কথা বলছনা কেন? হাসছ না—মুখ গম্ভীর। কি হয়েছে বল।

ত্রিভন হাতের কৌটো এগিয়ে দেয়।

—কি এটা?

—মায়ের অস্থি।

—মা? রাণীমা?

—হ্যাঁ।

—কি করে হলো। মালা রেখে ধারতি উঠে দাঁড়ায়।

ত্রিভন একে একে সব বলে।

—নরহরি ঠাকুর এমন লোক?

—আজ আমারও, তুমি ছাড়া আর কেউ নেই ধারতি।

ধারতি দুই হাত রাজার কাঁধের ওপর রেখে চোখের জল ফেলে।

বরাহভূমরাজ দরবার থেকে লোক আসে বাটালুকায়। এমন সাধারণতঃ হয় না। পঞ্চখুঁটের রাজারাই সাধারণতঃ যায় বরাহভূমে।

বিস্মিত সর্দারদের অতিক্রম ক'রে লোকটি রাজার সম্মুখে এসে নত হয়।

ত্রিভনও কম অবাক হয়নি। খাঁড়েপাথরের সময়ে বরাহভূমরাজ নিজে এসেছিলেন একবার। তারপরে এপর্যন্ত আর কোন লোক আসেনি দরবার থেকে। ত্রিভন অনুমান করে, হয়ত কোন বিপদ আসন্ন জংগলভূমির। মুসলমানরা এ-অঞ্চলের দিকে নজর না দিলেও ইংরেজদের

বিশ্বাস নেই। হা-ঘরে ওরা। পাথর থেকেও নাকি রস বার করতে ছাড়ে না। যুদ্ধ বিগ্রহ বাধাবার ফন্দী আঁটছে কিনা কে জানে।

বরাহভূমের অধীনে চার তরফ—ধাদ্‌কা, তিন সওয়া, পঞ্চসর্দারী ও সতেরখানি। এই চার রাজ্যের রাজা আর মহারাজকে বলা হয় জংগল মহলের পঞ্চখুঁট। দেশের কোন জরুরী অবস্থায় পঞ্চখুঁট একত্রিত হয়ে কোন সিদ্ধান্তে আসার একটা প্রথা রয়েছে। কিন্তু বহুদিন তার প্রয়োজন হয় নি। হিংস্রজন্তু পরিপূর্ণ এই দরিদ্র অরণ্যের রাজ্যে বিলাসী মুসলমানেরা আসতে চায়নি কোনদিনও। যে-কষ্ট এখানে এসে ভোগ করতে হয়, সেই অনুযায়ী ফললাভ সম্ভব নয়। লুঠপাটের বাসনা থাকলেও দারিদ্র্যের নগ্ন চেহারা দেখে আতংকে হাত আপনি থেমে যায়। ত্রিভন ভাবে, ইংরেজদের সে অভিজ্ঞতা এখনো হয় নি। মুর্শিদাবাদ জয় করে রাজ্য বিস্তারের নেশা পেয়ে বসেছে তাদের। তাই জংগলের দিকেও হাত বাড়িয়েছে। জানে না, সাপের ছোবলের ভয় রয়েছে এখানে।

তৈরী হতে হবে। যেতেই হবে বরাহভূমে। মনে মনে প্রস্তুত হয় ত্রিভন।

কিন্তু দরবারের লোকটির কথা শুনে তার সব চিন্তা কল্পনা ধুয়ে মুছে কোথায় মিলিয়ে যায়। নির্বাক হয়ে লোকটির মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

লোকটি বলে,—মহারাজ বলেছেন, এতদিন যে দুইশ' পয়তাল্লিশ টাকা বার্ষিক কর দিয়ে এসেছে সতেরখানি তরফ, তাতে চলবে না, অন্তত: তার দ্বিগুণ চাই।

—পত্র আছে? ভ্রূ কুঁচকে ত্রিভন প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ। পত্র বার করে লোকটি এগিয়ে দেয়।

ত্রিভন আগাগোড়া পড়ে সেটি। একবার নয়, দুবার নয়—বহুবার। প্রতিটি অক্ষরের মধ্যে শাসানি। মহারাজের কাছ থেকে এমন ব্যবহার সে কখনো আশা করেনি।

বিরক্তিতে পত্রটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় ত্রিভন।

লোকটি বিদ্রূপের স্বরে বলে ওঠে—ওটি মহারাজের নিজের হাতে লেখা, যাকে আপনি কর দেন।

—দূত অবধ্য বলে একটা কথা আছে জান?

—নিশ্চয়ই জানি।

—কেন, তা জান? কারণ দূত শুধু সংবাদই বহন করে। তার ব্যক্তিগত কথাবার্তায়, আচার ব্যবহারে কোন রকম অভদ্রতা প্রকাশ পায় না। শত্রু পক্ষকেও যথাযথ সম্মান দিতে তারা জানে।। সে-শিক্ষা তাদের দেওয়া হয়।

—এ সব কথা কেন বলছেন?

—তোমার ভদ্রতার অভাবের জন্যে। তুমি একটা সংবাদ নিয়ে এসেছ মাত্র। এই সংবাদ আনা আর তার জবাব নিয়ে যাওয়াই শুধু তোমার কাজ। তুমি এমন ব্যবহার করছ যা স্বয়ং মহারাজও করতে পারতেন না।

—কিন্তু তাঁর পত্রটির ভাষা কি খুব মধুর!

—সাবধান। আর এক পা বাড়ালে, বরাহভূমে ফিরে যেতে হবে না তোমাকে।

—আমাকে হত্যা করবেন?

—সেটা খুবই সহজ। জাননা, রক্ত না দেখলে আমাদের দিন কাটেনা? মানুষ কিংবা অন্য প্রাণী আমাদের মারতেই হয় রোজ। এ তোমাদের বরাহভূম নয়—অত সভ্য আমরা নই।

লোকটি কাঁপতে থাকে। এমন সহজভাবে যে হত্যার কথা বলতে পারে, সে তা কার্যেও পরিণত করতে পারে। এতটা আশংকা করেনি। ভেবেছিল, মহারাজ যখন তার সহায়, তখন সামান্য এক তরফের রাজা তার কথা শুনে ভয় পাবে। সম্মান দেখিয়ে তো এদের রাজা বলা হয়—আসলে সর্দার।

—আমাকে ক্ষমা করুন রাজা।

—ক্ষমার প্রশ্ন ওঠে না। তবে মারব না। কারণ পত্রের জবাবটা তোমাকে মুখে মুখেই নিয়ে যেতে হবে। লিখে জানাতে আমার ঘৃণা হচ্ছে।

সর্দারদের দিকে চেয়ে ত্রিভন বলে—মহারাজ বেশী কর চেয়েছেন, কিন্তু কেন চেয়েছেন জান? কোন বিপদের সম্ভাবনার জন্যে নয়। এমনি তাঁর ইচ্ছে হয়েছে—খেয়াল হয়েছে; তবু এই খেয়াল যাতে অপূর্ণ না থাকে সে চেষ্টা আমি করতাম, যদি তাঁর পত্রটি তেমন হত। কিন্তু পত্র পড়ে

আমার ধারণা হয়েছে, ভয় দেখিয়ে তিনি টাকা নিতে চান। ইচ্ছে করে বিরোধ বাধাতে চান। তোমরা কি বল? জবাব লিখব!

বাঘরায় এতক্ষণ জ্বলছিল। সে বলে—না রাজা, কোন প্রয়োজন নেই। আর এই বাচালকে আমার হাতে দিন, আমি ব্যবস্থা করব।

—না, না। ও ফিরে যাক্ সর্দার। বরাহভূম ইতর হলেও সতেরখানি তা হতে পারে না।

—কিন্তু এতক্ষণ ওর কাণ্ড দেখে হাড়পিত্তি জ্বলছিল রাজা।

—সেটা অন্যায় নয়, তবু ওর মুখেই আমার বক্তব্যটা শোনাতে চাই মহারাজকে।

রান্‌কো বলে—জবাবটা ভদ্রভাবে দিতে হবে রাজা। বলে দিন, আসছে দুবছর বোধ হয় কর দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। দেশের আকাল চলছে। অতি বৃষ্টিতে অনেক কিছু নষ্ট হয়েছে এবার।

ত্রিভন লোকটির দিকে চেয়ে বলে—ঠিক এই কথাই মহারাজকে বলবে। মুখস্থ করে নাও।

বাঘরায় বলে—শোনাও তো কি বলবে?

লোকটি রান্‌কোর কথার আবৃত্তি করে।

বাঘরায় বলে—ঠিক। যাও, দূর হও।

রাজাকে কোনরকমে প্রণাম করে সে ছোটে। সতেরখানির সীমানা ছাড়াতে পারলে সে বাঁচে।

কিছুদিনের মধ্যে খবর আসে বরাহভূমের সৈন্য সীমান্তের দু-একখানি গ্রাম লুঠপাট করেছে। শূয়োর মোষ মেরে—দুচার জনকে বেঁধে নিয়ে গিয়েছে।

ত্রিভন এতটা আশা করেনি। হাজার হলেও সতেরখানি তরফ বরাহভূমেরই অন্তর্গত। চিরকাল নিয়মিত কর দিয়ে এসেছে। মহারাজের উগ্র পত্র আর পত্রবাহীর অসভ্য ব্যবহারের জন্যে হয়ত মহারাজকে পুরোপুরি সম্মান দেখান সম্ভব হয়নি। কিন্তু তার জন্যে সৈন্য পাঠিয়ে হামলা করার কথা কল্পনা করা যায় না। এ এক অদ্ভুত আচরণ।

কেউ বোধহয় বরাহভূমরাজকে বুঝিয়েছে, কর দিতে অস্বীকার করার অপর অর্থ স্বাধীনতা ঘোষণা করা। কিন্তু একেবারে অস্বীকার তো করা

হয় নি। বলা হয়েছিল দেশের দুরবস্থার জন্য আগামী দু'বছর কর দেওয়া সম্ভব হবে না। তাও জানানো হয়েছিল মৌখিক ভাবে। স্বাধীনতা ঘোষণা করারও তো একটা নিয়ম আছে। লিখিতভাবে জানাতে হয়। বরাহভূমরাজের সে ব্যাপারে ওয়াকেফ্‌হাল থাকা উচিত।

রাগের চেয়ে দুঃখই বেশী হয় ত্রিভনের। দুঃখ হয় এই জন্যে যে স্বাধীন ভাবে থাকা পঞ্চখুঁটের কোন খুঁটের পক্ষেই সম্ভব নয়—একথা জেনেও সতেরখানি তরফের মধ্যে হামলা করতে উৎসাহিত করেছেন রাজা তাঁর সৈন্যদের। এ যেন নিজেরই এক অংগ দিয়ে আর এক অংগকে আঘাত করা। এতদিনের এক দলবদ্ধ গোষ্ঠীতে ভাঙন ধরালেন মহারাজা।

রাজদরবারে লোক পাঠান প্রয়োজন। রান্‌কো কিস্‌কুকে মনোনীত করা হয়। সে চতুর। কথাবার্তা বলা ছাড়াও রাজার মনোভাব ও রাজ্যের হাবভাব জানতে পারবে। এর পরেও যদি বোঝা যায় যে রাজা নরম হবেন না, তখন স্বাধীনতাই ঘোষণা করতে হবে। অন্য পথ নেই। কারণ যেটুকু ব্যবসা বাণিজ্য এ রাজ্যের রয়েছে তার সব কিছু বরাহভূম আর তার আশেপাশের রাজ্যের মাধ্যমে। বরাহভূমরাজ যদি বিপক্ষে যান তাহলে সুদূর ধলভূম, অম্বিকানগর পরে শ্যামসুন্দরপুরও ছেড়ে কথা বলবে না। ফলে ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হবে।

শ্রীশ্রীকালাচাঁদ জিউএর মন্দিরে প্রণাম করে রান্‌কো যাত্রা করে বরাহভূমে। মন তার আনন্দে ভরপূর। রাজা তার ওপর কতখানি নির্ভর করেন।

মনে পড়ে যায় কয়েক বছর আগের কিতাডুংরির কথা। সর্দারদের হুমকি আর রাজার বিচার। সেদিন মনে হয়েছিল, এদের মত নিষ্ঠুর লোক পৃথিবীতে নেই। বৃদ্ধ সারিমুর্মু ও বুধকিস্‌কুকে দেখলে মায়া হয়। বাঘরায়ের মত সরল মানুষটিকে ভাল না বেসে পারা যায় না। আর ডুইঃ টুডু? সে-ই তো তার সর্দার হবার পথ সহজ করে দিয়ে গেছে। পথ থেকে কুড়িয়ে এনে মর্যাদা দিয়েছে—চিনিয়ে দিয়েছে রাজাকে। আসলে মানুষের পদবী আর তার একটি ব্যবহারেই লোককে চিনে ফেলা যায় না। চিনতে হলে গভীরভাবে মিশতে হয়।

কিছুদূর গিয়েই পথের ধারে একজন স্ত্রীলোককে দেখে রান্‌কো চমকে ওঠে।

ঝাঁপনী।

রাজার বিচারের পরদিনই ওর বিয়ে হয়ে যায়—সাল্‌হাই হাঁসদার সংগে। লোকটির বাড়ী ছিল দূর গ্রামে। বিয়ের পরেই একেবারে বাটালুকায় এসে ঘরবাড়ী তৈরী করে জমাট হয়ে বসেছে। সাল্‌হাই-এর মনোবাসনা ছিল সর্দার হবার। তাই রাজা যখন বিচার করে অন্যের সংগে ঝাঁপনীর বিয়ের আদেশ দিলেন তখনি সাল্‌হাই গিয়ে গ্রামের মোড়লের হাতে পায়ে ধরে বিয়ে করে ফেলে তাকে। আশা ছিল এভাবে রাজার নজরে পড়ে নিজের কাজ গুছিয়ে নেবে।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু পারেনি সে। ভেতরে পদার্থ বলতে কিছু নেই তার। তাই হতাশ হয়ে এখন চাষবাসে মন দিয়েছে। রাজাই তার জমির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

ঝাঁপনী ঘরে বসে ছেলে মানুষ করে, ঘুঁটে দেয়, শূয়োর দেখে। মাঝে মাঝে জ্বালানি কাঠ কুড়োতে বার হয় শালবনে।

আজও কাঠ কুড়োতে এসেছিল। রান্‌কোকে দেখে সে চিনতে পারে। দূর থেকেই চিনেছিল তার চলন দেখে। কোমরে একগাদা কাঠ নিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সে। রান্‌কো কাছে এলে কাঠের গাদা মাটিতে ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

রান্‌কো ভেবেছিল সে খুব শক্ত হয়েছে। কিন্তু ঝাঁপনীর অতি পরিচিত দাঁড়াবার ভংগী দেখে তার বুকের ভেতরটা যেন কেমন করে ওঠে! কথা না বলে তাড়াতাড়ি পাশ কাটাতে চায় সে।

ঝাঁপনী ম্লান হেসে বলে—ওকারে।

রান্‌কো থতমত খায়। ভাবতে পারেনি যে ঝাঁপনী তার সংগে ডেকে কথা বলবে। কোনরকমে সে বলে—আডি সাঙিঞ।

—এন্‌হ তিনাঃ সাঙিঞ।

—বরাহভূম।

ঝাঁপনী অবাক হয়। অনেকদূর মানে অতদূর? হবেই বা না কেন। সে তো সালহাই হাঁসদা নয়—সে রান্‌কো কিস্‌কু। সর্দার।

—তোমার ভেতরে এত গুণ ছিল সর্দার? আগে বলনি তো!

—কেন?

—বললে, কিতাড়ুংরির বিচারের পর তোমার সংগে ঘর ছেড়ে পালাতাম।

—সাল্‌হাই সর্দার হয় যদি

—ও আর হয়েছে।

—হতেও তো পারে।

—তবে আমার বরাত খুলবে।

রান্‌কোর দীর্ঘশ্বাস বার হয়ে আসছিল আর একটু হলে। কিন্তু সে এখন শক্ত হয়েছে। অনেক আঘাতই অবিচলভাবে বুক পেতে নিতে পারে। সাধারণ এই সব মেয়েদের জন্তে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। এরা চায় শুধু নিজের সুখ।

—চলি ঝাঁপনী।

—এসো। আবার একটা হয়েছে, খবর রাখো? বেশ মোটাসোটা।

—কী, শূয়োরের বাচ্চা?

—যাঃ, তা কেন? ছেলে।

—একটার খবরও রাখিনে।

—প্রত্যেক বছরই হচ্ছে—শূয়োরের মতনই। খিল্‌খিল্ করে হেসে ওঠে ঝাঁপনী।

—আসছে বছর?

—হবে হবে, ঠিক হবে। কাঠের গাদা মাথায় তুলে নেয় সে।

ঝাঁপনীর কথা ভাবতে ভাবতে রান্‌কো অনেকটা পথ চলে যায়। সে ঝাঁপনী আর নেই। আজ যার সংগে দেখা হল তার মন বড় স্থূল—সহজেই নাগাল পাওয়া যায়। আগের ঝাঁপনীর মন ছিল ধরাছোঁয়ার বাইরে। আভাস পাওয়া যেত শুধু। এখনকার ঝাঁপনীর মন ধুলোকাদায় মাখামাখি।

কষ্টে ভরে যায় রান্‌কোর বুক। ওর সংগে দেখা না হলেই ভাল হত। দেখা হয়ে পৃথিবীর আকর্ষণ যেন অনেকটা কমে গেল।

রান্‌কো চলে যাবার কিছুদিন পরে এক সন্ধ্যায় বাঘরায় মুখ কালো করে কিতাগড়ে এসে দাঁড়ায়। ত্রিভন তখন সবে শিকার থেকে ফিরেছে—হাতে তার দুটো সেরালী।

এমন অসময়ে বাঘরায় সাধারণতঃ আসেনা কিতাগড়ে। তার মুখের দিকে সপ্রশ্নদৃষ্টিতে চেয়ে ত্রিভন চমকে ওঠে। সে মুখে রক্তের কিছুমাত্র চিহ্ন নেই।

—কি হ'য়েছে বাঘরায় ?

জবাব নেই। নির্বাক দৃষ্টিতে রাজার দিকে শুধু চেয়ে থাকে সর্দার।

রাজা সজোরে ঝাঁকি দেয়।

তবু বাঘরায় নীরব।

ত্রিভন অনুমান করে বড় রকমের কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে। সেরালী দুটোকে মাটির ওপর আছড়ে ফেলে দেয় সে। বাঘরাযের হাত দুটো নিজের হাতে তুলে নেয়।

—চুপ করে থাকলে চলবে না সর্দার। কি হয়েছে বল। যদি কিছু ঘটে থাকে তার প্রতীকার তো করতে হবে। তুমি হলে সতেরখানির সর্দার। যাই হোক না কেন, সকলের মত ভেঙে পড়া তোমার সাজেনা।

দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে রাজার সামনে মাটিতেই বসে পড়ে বাঘরায় সোরেণ। রুদ্ধ কান্নার আবেগকে কোনরকমে সামলে নিয়ে বলে—ছুটকী নেই।

—নেই ? তার মানে ?

খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

—তবু ভাল। ত্রিভন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে—কি হয়েছে খুলে বল।

প্রতিদিনের মত আজও বাঘরায় ভোরবেলা উঠে তার ক্ষেতের দিকে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে ছুটকীকে আর দেখতে পায় না। বাঘরায় ভাবল হয়ত কোন কারণে বাপের বাড়ী গিয়েছে। তাই কিতাগড় চলে আসে সে। বাপের বাড়ী ছুটকী মাঝে মাঝে যায়। শরীরটা তার ভাল যাচ্ছিল না কিছুদিন থেকে। সব সময়েই বিমর্ষ বলে মনে হত। কথাবার্তা কম বলত। শাশুড়ী বলেছিল, ছেলে হবার আগে অমন হয়। প্রথম ছেলে হবার সময় কিন্তু হাসিখুসীই ছিল ছুটকী। বাঘরায় ভেবেছিল, প্রতিবার হয়ত একরকম থাকেনা মন মেজাজ।

দুপুরে কিতাগড় থেকে বাড়ী ফিরতে পারেনি বাঘরায়। কতকগুলো কাজে আটকে পড়েছিল সে। রান্‌কো বরাহভূমে যাবার পর থেকে তার

ওপর কাজের চাপ পড়েছে অনেক বেশী। তাই গড়েই খাওয়া দাওয়া করেছিল। শিকারে যাবার আগে ত্রিভনই তাকে খেয়ে নিতে বলেছিল এখানে।

বাড়ী পৌঁছে বাঘরায়ের বুক কেঁপে উঠল। ছুট্‌কী ফেরেনি। সকালের যে যে জিনিষ, যেখানে পড়েছিল সেখানেই রয়েছে। তাড়াতাড়ি সারিমুর্‌'র বাড়ী ছুটে যায় সে। গিয়ে শোনে, ছুট্‌কী তিনদিন যায়নি ওখানে।

চারদিকে খুঁজতে শুরু করে বাঘরায়। প্রতিটি বাড়ীতে গিয়ে খোঁজে। কিন্তু নেই। কোথাও নেই। নিরাশ হয়ে কিতাগড়ে এসেছে শেষে।

ত্রিভন ভেবে পায়না, কী হতে পারে ছুট্‌কীর। বাঘরায় যখন খুঁজে এসেছে তখন আশেপাশে কোথাও নেই। কিন্তু যাবেই বা কোথায়?

—কোন ঝগড়া হয়েছিল তোমার সংগে?

—না। ওর সংগে আমার কখনো ঝগড়া হয়নি।

—আমি এখনি লোক পাঠাচ্ছি চারদিকে। তুমি যাবে?

—না। আমার ভীষণ ভয় হচ্ছে। সাংঘাতিক কিছু দেখব হয়ত। বাঘরায় দুহাতে আবার মুখ ঢাকে।

—ছিঃ বাঘরায়, ধারতির বেলায় তো আমি অমন করিনি।

—আপনি রাজা।

—আমি মানুষ—তুমিও মানুষ।

কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থেকে বাঘরায় বলে—আমি যাব রাজা।

—আমিও যাব তোমার সংগে।

—এই অন্ধকারে?

—ধারতির বেলায় তুমি খুঁজে বেড়াওনি সারারাত?

—রাজা! বাঘরায়ের চোখে জল আসে এতক্ষণে। শুকনো চোখ নিয়ে বড় কষ্ট পাচ্ছিল সে।

একটু চুপ করে থেকে বাঘরায় বলে ওঠে—কিন্তু রাজা, এখন তো মংগল হেম্বরম্ নেই।

—চুপ্। ও নাম মুখেও এনো না। লোকের যা বিশ্বাস তাতে যেন বিন্দুমাত্র সন্দেহের ছায়া না পড়ে।

অনুসন্ধান ব্যর্থ হয়। ছুট্‌কী নেই। ঘুরতে ঘুরতে মারাংবুরুর গুহার সামনে আসে ত্রিভন আর বাঘরায়। এখানেও একবার খুঁজতে হয়—নইলে মনের খুঁতখুঁতি যায় না।

এখন আর এখানে এলে কুকুরের আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায় না। সেই কুকুর বন্দী অবস্থায় না খেতে পেয়ে মরে পড়েছিল। নতুন পূজারী এসে ফেলে দিয়েছে তাকে।

ঘুমিয়ে ছিল পূজারী। ত্রিভনের ডাকাডাকিতে চোখ মুছতে মুছতে বাইরে আসে। রাজাকে দেখে বিস্মিত হয়।

সমস্ত ঘটনা শুনে সে বলে,—তাকে তো দেখেছি রাজা!

—দেখেছ? ছুট্‌কীকে?

—হ্যাঁ। সারিমুর্মু সর্দারের মেয়ে তো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, কখন দেখেছো? কোথায়? বাঘরায়ের হৃদ্‌পিণ্ড যেন ফেটে বার হয়ে আসতে চায়।

—সকালে। ওই নীচের পথ দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল।

—ছুটে যাচ্ছিল?

—হ্যাঁ। খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ছেলেপিলে হবে দেখলাম।

বাঘরায় নিজেকে সংযত করে বলে—কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলেন আপনি?

—করেছিলাম। বলল, মানত আছে কোন্ বন-দেবতার কাছে। ছেলে যাতে বাঁচে।

ত্রিভন আর বাঘরায় পরস্পরের মুখের দিকে চায়। এ এক গভীর রহস্য। মানতই যদি থাকে, সেকথা স্বামীকে গোপন করবে কেন?

—সত্যিই তুমি জানতে না বাঘরায়?

—না রাজা।

আরও এগিয়ে যায় দুজনা। কিন্তু কোথায় সেই বন-দেবতার ঠাঁই? নিরাশ হয়ে শেষরাতে ফিরে আসে তারা কিতাগড়ে।

দুপুরে অনুসন্ধানকারীদের একজন ফিরে আসে।

বাঘরায় বার হয়নি। দেহ-মনে সে অবসন্ন। ফাঁকা দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে সে চুপ করে বসেছিল রাজার পাশে।

লোকটি রাজার সামনে এসে দাঁড়ায় মাথা নীচু করে।

—খবর পেলে ?

—হাঁ, রাজা।

পেয়েছ ? কোথায় ? চিৎকার করে ওঠে বাঘরায়। মুহূর্তে তার সমস্ত অবসন্নতা ঘুচে যায়। উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে সে।

—আমদাপাহাড়িতে।

বাঘরায় মূক। তার উত্তেজনা স্তব্ধ। দৃষ্টিতে তার চূড়ান্ত অসহায়তা। সে টলতে থাকে।

ত্রিভন তাড়তাড়ি উঠে তাকে ধরে ফেলে বলে—এ কী বাঘরায় ?

—আমি বুঝতে পেরেছি রাজা।

—কী বুঝেছ ?

—ওর মানত। একটি সুদীর্ঘ শ্বাস নির্গত হয় তার অতবড় বুকখানাকে কাঁপিয়ে দিয়ে। শেষে অস্ফুট স্বরে লোকটিকে প্রশ্ন করে,—সে কি বেঁচে আছে ?

—না।

ত্রিভনও এতটা আশংকা করেনি। কিন্তু বাঘরায়ের দিকে চেয়ে সে বিস্মিত হয়। দুঃসংবাদটা জানার সংগে সংগেই সে যেন নিজের শক্তি নিজের দৃঢ়তা ফিরে পায়। একটুও টলে না, বা কাঁপে না। চোখের পাতাও নড়েনা তার। লোকটির দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বলে—কোথায় সে ? নাগাদের সেই টিলার ওপর ?

—হাঁ। বাচ্চাটাও বাঁচেনি।

বাঘরায়ের মুখ যন্ত্রণায় নীল হয়ে ওঠে।

—তুমি স্থির হয়ে বসো বাঘরায়। ত্রিভন বলে।

—ভাববেন না রাজা। আমি ঠিক আছি। কিন্তু বাচ্চাটা হল কখন ? আপন মনে বিড়বিড় করে বাঘরায়।

লোকটি শুনতে পায় বাঘরায়ের স্বগতোক্তি। সে বলে—ওখানেই হ'য়েছে সর্দার। তিনি যেখানে পড়ে আছেন—তার পাশেই; মারা যাবার ঠিক আগে হয়েছে মনে হয়।

—কাকে পাহারায় রেখে এসেছ ? ত্রিভন প্রশ্ন করে।

—গ্রামের সবাই। সোরেণ সর্দারের বউ শুনে একপাও নড়েনি, কেউ —নড়বেওনা।

আমদাপাহাড়ীতে যাবার পথে বাঘরায় কোন কথা বলে না। কলের মত চলেছে ত্রিভনের পাশে পাশে। বিজলীর পিঠে চড়ে আসতে পারেনি ত্রিভন—বাঘরায় সংগে ছিল বলে। সে চেষ্টা করেছিল বাঘরায়কে রেখে আসতে। পারেনি।

শেষে সেই প্রসিদ্ধ পরিচিত টিলাটির কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়ায় বাঘরায়। ছুটকীর শেষ অবস্থা নিজের চোখে দেখতে বোধ হয় ভীতি বোধ করে সে—সইতে পারবে না বলে। কিংবা এ-ও হ'তে পারে—শক্তি সঞ্চয় করছে একটু থেমে নিয়ে।

—তুমি না হয় এখানে দাঁড়াও। আমি দেখে আসি।

—না না, রাজা। আমি যাব। দেখতেই হবে আমাকে।

ইতিমধ্যেই খবর রটেছিল, রাজা আসছেন। একদল লোক দেখতে পেয়ে টিলার ওপর থেকে ছুটে এসে অভ্যর্থনা জানায়। বাঘরায় প্রতিটি মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। আশার কথা এতগুলো লোকের মধ্যে কেউ-ই শোনাতে পারে না? কেউ বললেও বলতে পারে,—একটু নড়ে উঠল যেন, বোধ হয় বেঁচে আছে।

না, ভুল। আশা করা পাগলামী। সর্দারের পক্ষে এ-পাগলামী শোভা পায় না।

—চলুন রাজা। বাঘরায় বলে।

—আগে আমিই যাই।

—না। আমি যাব।

ভীড়ের একজন বলে—মনে হচ্ছে যেন ঘুমিয়ে আছে বাচ্চাটাকে পাশে নিয়ে। প্রথমে যে দেখেছিল, সে তো তাই ভেবেছিল।

তারা গিয়ে দেখে, সত্যিই ঘুমিয়ে রয়েছে ছুটকী। বাচ্চাটাও পড়ে রয়েছে মায়ের ঠিক পাশেই। কিন্তু মায়ের সংগে নাড়ীর সংযোগ ছিন্ন হয়নি। অবসর মেলেনি। এ এক ভয়ংকর নাড়ীর টান—যার ফলে মা-ছেলে কেউ-ই বাঁচল না।

ত্রিভনের চোখের পলক পড়ে না।

বাঘরায় নির্বাক।

হঠাৎ সে ছুটে যায় ছুট্‌কীর দিকে। বসে পড়ে তার পাশে। ছুট্‌কীর ডান হাতের মুঠো বন্ধ। যেন চেপে ধরে রেখেছে সে। বাঘরায় মুঠো থেকে ছাড়িয়ে নেয় সেটা। জিনিষটির দিকে চেয়ে শিশুর মত কেঁদে ওঠে সে।

কেউ কিছু বুঝতে পারে না। ত্রিভনও নয়। দুঃখের মধ্যে একটা চাপা কৌতূহল সবার চোখে মুখে।

বাঘরায় ধীরে ধীরে উঠে রাজার কাছে এগিয়ে আসে। পাতায় জড়ানো একটি মোড়ক দেখিয়ে বলে—এই দেখুন রাজা।

—এটা কী বাঘরায়?

—ডুইঃ-এর অস্থি। এতদিন খুঁজে খুঁজে পাইনি। ছুট্‌কী লুকিয়ে রেখেছিল যখের ধনের মত।

—তোমার কথা তো বুঝছিনা বাঘরায়।

রাজাকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে চোখের জলে ভেসে সর্দার বাঘরায় সোরেণ বলে—ছুট্‌কী ছেলেমানুষ ছিল, তাই বুঝতে পারেনি আগে। নিজে মরল—আমাকেও মেরে রেখে গেল।

আমদাপাহাড়িতে কতবার ছুট্‌কী আসতে চেয়েছে। সাধারণ কৌতূহল ভেবে প্রথমে উড়িয়ে দিত বাঘরায়। শেষে এড়িয়ে গিয়েছে। রাগও করেছে ছুট্‌কীর বাড়াবাড়ি দেখে। কিন্তু কখনো কোন সন্দেহ জাগেনি মনে। ডুইঃ-এর সংগে ছুট্‌কীর একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। তাই ডুইঃ শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে কোথায়, সে জায়গা দেখার আগ্রহ খুবই স্বাভাবিক।

কিন্তু দিনে দিনে ভেতরে ভেতরে মিথ্যার ভিত্ ধ্বসে গিয়েছে। উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে,—যা আসল সত্যি। তখন আর ছুট্‌কী কোন বাধাই মানেনি। ছুটে এসেছে আপনজনের কাছে। নিজেও সেখানে শেষ নিঃশ্বাস ফেলে নিশ্চিন্ত হ'য়েছে। এখন বাঘরায় বুঝেছে, কেন ছুট্‌কী হাসি ভুলেছিল, কেন সে সব সময় একা একা বসে ভাবত—কেন গুণগুণ করে গাইত ডুইঃ-এরই বাঁধা গান।

নাগা সন্ন্যাসীদের সংগে যুদ্ধে জিতে ডুইঃ-এর অস্থি নিয়ে বাঘরায় যখন ফিরে এল বাটালুকায়, তারপর থেকেই আসল সত্যি আবছাভাবে

ছুটকীর মনে ধরা পড়েছিল। কিন্তু গভীরভাবে জিনিষটি সে তলিয়ে দেখেনি। তবু অস্থির মোড়কটি লুকিয়ে রেখেছিল মহা সম্পদ হিসাবে। সেই সম্পদের মূল্য দিনে দিনে বাড়তে বাড়তে শেষে কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

ভাঙা গলায় বাঘরায় বলে—রাজা, তীর্থস্থানে এসেছে ছুটকী। মারাংবুরুর পুজারীকে সে ঠিক কথাই বলেছিল—বন-দেবতার পূজো দিতে এসেছে। সে-পূজোর বলি ছুটকী নিজে আর তারই রক্তমাংসে বড় হয়ে ওঠা ওইটি। বাঘরায় আঙুল দিয়ে দেখায়।

ত্রিভন স্তব্ধ। এ অভিজ্ঞতা তার কখনো হয় নি। মানুষের মনের এই জটিলতার শিক্ষা আজ তার প্রথম। অপরাধ কারও নয়—অথচ এক নিষ্করুণ অভিশাপ ব্যর্থ করে দিল তিনটি জীবনী-শক্তিতে ভরপুর মানুষকে।

বাঘরায়, ডুইঃ, রান্‌কো—সব সদারই যে শুধু বিষটুকুই পান করছে। সারিমুর্মুও। মেয়ের জন্যে তারও বুক ভাঙবে। সর্দাররা বোধ হয় শুধু দুঃখই পায়। পারাউমুর্মুও তাই পেয়েছিল। তবে কি অমৃতটুকু রাজাদের একচেটিয়া ?

নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয় ত্রিভনের। বাঘরায়ের দিকে চাইতে পারে না। সতেরখানির সব রূপ, সব রস, সবটুকু গন্ধ যেন নিজেই শুষে নিয়েছে সে। কারও জন্যে ছিটেফোঁটাও ফেলে রাখে নি। হতভাগ্যেরা ছোটাছুটি করছে, সামান্য একটু আনন্দ, সামান্য সান্ত্বনার জন্যে। কিন্তু পাচ্ছে না। পেতে হলে রাজার স্বার্থপর বুকখানাকে ভেঙে চুরমার করে দিতে হয়।

চোখে জল আসে ত্রিভনের। সামনের ভীড় করা বুকগুলো যেন বিরাট শূন্যতা নিয়ে হাহাকার করছে।

ত্রিভনের দুহাতের মুঠো শক্ত হয়ে ওঠে। একটা প্রতিহিংসার চরিতার্থতা প্রয়োজন। কিন্তু কার ওপর সেই প্রতিহিংসা ? সে জানে না। তবু বুঝতে পারে, কে যেন অন্যায় করছে—ঘোরতর অন্যায়। তাকে খুঁজে বার করতে হবে। এতে দিন যাক্, মাস যাক্, বছর যাক্—ক্ষতি নেই, সে থামবে না। মুখোমুখি দাঁড়াবে সেই অন্যায়ের জঘন্য প্রতিমূর্তির সামনে—মংগল হেম্বরমের সামনে যেভাবে দাঁড়িয়েছিল। সে দিনের পরই

আসবে সুদিন। ভরে উঠবে এতগুলো বুক—রূপ রস গন্ধে। মাতাল হবে তারা মহুয়া খেয়ে—নাচবে তারা, গাইবে তারা। কিতাডুংরিতে আনন্দের ঢেউ বইবে। টামাক, তিরিওর শব্দে শালবনের পাতা নাচবে।

রান্‌কো কিস্‌কু ফিরে আসে বরাহভূম থেকে। দুঃসংবাদ নিয়ে আসে সে। মহারাজ তার কোন কথাই শোনেন নি। এ-বছরের জন্তে কর না দেবার প্রশ্ন দূরে থাকুক, দরবারে তাকে ভৃত্যদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। অথচ সে শুধু দূত নয়, সে গিয়েছিল রাজার ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হিসাবে।

রান্‌কোর প্রতিটি কথা ত্রিভন গম্ভীর হয়ে শোনে। বুধকিস্‌কুর কপালের রেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এমন কি বাঘরায়ের এ-কয়দিনের ভাবলেশহীন মুখেও রক্তের আভাস দেখা যায়।

সারিমুর্মু'ও এসেছিল কিতাগড়ে। বাড়ীতে তার মন টেকে না—সব সময় তার আতংক, সে পাগল হয়ে যাবে। তাই অবসর চেয়েও পুরোপুরি অবসর নিতে পারেনি। রান্‌কোর কথায় সে ধীরে ধীরে বলে—এবারে প্রস্তুত হন রাজা।

কিছুক্ষণ আলোচনা চলার পর রান্‌কো হঠাৎ বলে ওঠে—এবারে আসল কথা বলি রাজা?

তার কথা শুনে সবাই অবাক হয়। এত কথার পরও আসল কথা বলেনি রান্‌কো?

—আসল কথা? সবাই নড়েচড়ে বসে। ভাবতে চেষ্টা করে, এর পরও আসল কথা তার কি থাকতে পারে।

ত্রিভনের সপ্রশ্ন মুখের দিকে চেয়ে রান্‌কো বলে—সমস্ত কিছুর জন্তে শুধু একজনই দায়ী।

—একজন? কে সে?

—নরহরি।

বিস্মৃতির দিকে দুহাতে ঠেলে দেওয়া একটা নাম যেন ঘুরে এসে সবার মনকে নাড়া দিল।

—নরহরি ? সে কোথায় ?

—দরবারে ঢোকার সময়ে দেখি, মর্যাদার আসনগুলির একটি দখল করে বসে আছে। আমাকে দেখেই কোন ছুতো করে তাড়াতাড়ি চলে গেল। মনে হল ভালুকের তাড়া খেয়ে যেন পালাচ্ছে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে রাজা বলে—বুঝেছি, নরহরি প্রতিশোধ নিতে চায়। বৈষ্ণব ধর্ম জলাঞ্জলি দিয়ে তাই রাজার মন্ত্রী হয়ে বসেছে।

—তাহলে আমাদের প্রস্তুতই হতে হবে ? বুধ বলে।

—হাঁ, কোন সন্দেহ নেই তাতে। বাঁচতে আমাদের হবেই। তবে মহারাজের আক্রমণের অপেক্ষায় বসে থাকলে চলবে না। আমরাই আক্রমণ চালাব।

—সে কি সম্ভব ? বুধ বলে।

—অসম্ভব হবে কেন ? খাঁড়েপাথরের কথা কি শোনেনি কেউ ?

বুধ যেন লজ্জা পায়। বয়স হয়েছে তার। ভীরু না হলেও, নতুন কিছুতে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে নানান্ চিন্তা আচ্ছন্ন করে তাকে।

ত্রিভন বুঝতে পারে তার মনোভাব। সে বলে—তুমি আর সারিমুর্ দেশেই থাকবে সর্দার। বাইরে থেকে কোন হামলা এলে, তাদের শাস্তি দেবার ভার তোমাদের দুজনার ওপর রইল।

—তাই হবে রাজা।

—বাঘরায়, তুমি সুপুর রাজ্যের ভার নাও। পাঁচদিনের মধ্যেই চোয়াড়দল নিয়ে রওনা হতে হবে তোমাকে। এর সব বন্দোবস্ত তোমাকেই করতে হবে।

—আমি প্রস্তুত রাজা। বাঘরায়ের চোখ দুটো চক্‌চক্ করে ওঠে। সে এইরকম একটা কিছু চাইছিল। বাটালুকায় এখন তার দম বন্ধ হয়ে আসে। সে চায় উত্তেজনা—সব কিছুকে ভুলিয়ে দেবার মত নেশা-ধরা উত্তেজনা। যুদ্ধের চেয়ে সেরা জিনিষ আর কি থাকতে পারে ? নাম শুনলেই রক্ত নেচে ওঠে।

—রান্‌কো।

—আমাকে বরাহভূমের ভার দিন রাজা। ভৃত্যদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকার অপমান ভুলতে পারছি না।

—বরাহভূমের আগে একবার ধলভূম ঘুরে এসো। অনেক দূরের পথ

বটে, কিন্তু জিততে পারলে কিছু রসদ সংগ্রহ করে আনতে পারবে। আমাদের রসদের প্রয়োজন।

—আমি ধলভূমেই যাব রাজা। মনে মনে ত্রিভনের বুদ্ধির তারিফ করে রান্‌কো।

—বুধকিস্‌কু, আজই ঢাউরার ব্যবস্থা কর। শুধু হাটে-মেলায় নয়। প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি বাড়ীর লোক যাতে শুনতে পায় সেইভাবে ঢাউরা দিতে হবে। লোক চাই—যুদ্ধের জন্যে প্রচুর লোক চাই। স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয় যেন, এ-যুদ্ধ এক-আধ দিনের নয়। কতদিন চলবে কেউ বলতে পারে না। যারা আসতে চায় তারা খুব তাড়াতাড়ি যেন কিতাগড়ে এসে জমা হয়।

—আমি আজই ব্যবস্থা করছি রাজা।

—সর্দার সারিমুর্মুকেও একটা ভার দিচ্ছি। কে কোন্ দলে গেল, গোবিন্দকে দিয়ে তা যেন লিখে রাখা হয়।

সম্মতি জানায় সারিমুর্মু।

ত্রিভন এবারে উঠে দাঁড়িয়ে বলে,—সবশেষে একটা কথা জানিয়ে দিই। তা না জানালেও চলত অবশ্য কারণ-নতুন কিছু নয়। তবু নিয়মমত জানানই উচিত। চোয়াড়বাহিনীর চিরকালের যা যুদ্ধপ্রথা তাই আমরা অনুসরণ করব। আমাদের উদ্দেশ্য হবে ওদের রাজ্যের শান্তি নষ্ট করা আর রসদ সংগ্রহ। আসল যুদ্ধ এড়িয়ে চলতে হবে। লোকসংখ্যা আমাদের বড় কম। তবে দৈবাৎ যদি কখনো শত্রু-সৈন্যের মুখোমুখি পড়ে যাও, তখন আমাদের শক্তিটা দেখিয়ে দিতে ভুলো না।

চার সর্দারের সপ্রশংস দৃষ্টির সামনে দিয়ে ত্রিভন কিতাগড়ের অন্দর-মহলে প্রবেশ করে।

সে রাতে বিমর্ষ ত্রিভনের পাশে ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ায় ধারতি। কিতাগড়ের প্রহরী ছাড়া সমস্ত প্রাণী ঘুমে অচেতন। ত্রিভন শয্যার ওপর কিছুক্ষণ ছট্‌ফট্ করে ধারতিকে নিদ্রিত ভেবে উঠে এসেছিল অন্দরের আঙিনায়। প্রহরীরও প্রবেশের অধিকার নেই এখানে।

বসে বসে ভাবছিল সে, এভাবে এগিয়ে যাওয়াটা উচিত হল কিনা।

নিজের তরফের অবস্থা তার অজানা নেই। যুদ্ধের জন্যে চাষবাস হবে না ভাল করে। অনেক পুরুষ নিহত হবে—কিংবা ফিরে আসবে বিকলাংগ হয়ে। সে সময়ে দুর্দিন দেখা দিতে বাধ্য।

ধারতির স্পর্শে চমকে ওঠে রাজা।

—ঘুমোও নি তুমি?

—তোমার মনে অশান্তি। কোন্ শান্তিতে ঘুমোবো?

—ভাবছি ঝোঁকের মাথায় এ সব করে বসলাম না তো?

—এ ছাড়া আর কি করতে পারতে?

—একটা মীমাংসায় আসা কি সম্ভব হতো না চেষ্টা করলে?

—হ্যাঁ। তবে মাথা বিকিয়ে। বুড়ো দাদুর মুখে শুনেছি, সম্মানটাই হল আসল, তারপরে জীবন।

ত্রিভন ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বলে—পারাউ সর্দার সত্যি কথাই বলত। ভুল আমি করিনি। কিন্তু এতগুলো লোককে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছি বলে দুশ্চিন্তা।

—তারা তোমাকে ভুল বুঝবে না রাজা।

—তাদের স্ত্রী—তাদের ছেলেমেয়ে? পথের পানে দিনের পর দিন চেয়ে থেকে যখন তারা হতাশ হবে? তাদের প্রিয় পুরুষটি যখন আর ফিরবে না—তখন?

—তখনো। আমি যে তাদেরই একজন রাজা। আমার মন আর তাদের মন একই। আমাকে দিয়েই আমি বুঝতে পারছি। সতেরখানির মেয়েরা যোদ্ধারি মেয়ে, তারা যোদ্ধার স্ত্রী। বিয়ের পরের দিন বুড়োদাদু কি বলেছিলেন ভুলে গেলে।

ধারতিকে দুহাত দিয়ে চেপে ধরে ত্রিভন উত্তেজিত হয়—বলে, ঠিক বলছ ধারতি?

—হ্যাঁ রাজা। সাঁওতাল আর মুণ্ডাদের কাছে সম্মানই জীবন।

কৃষ্ণপক্ষের রাতের কোটি তারার অস্পষ্ট আলোয় ত্রিভন চেয়ে থাকে তার ধারতির মুখের দিকে। সে মুখ কাঁটারাঙ্গার শালবনের মতই সজীব, সতেজ আর সত্যি।

ধারতি মৃদু হেসে বলে, কি দেখছ অত?

—সতেরখানি।

—এখেনে? ধারতি আঙুলের ডগা দিয়ে নিজের মুখ স্পর্শ করে।

—হুঁ।

—দেখোনি?

—এমনভাবে বোধ হয় দেখিনি।

—আর দেখতে হবে না। ত্রিভনের কোলে মুখ লুকোয় ধারতি।

পরম পরিতৃপ্তি ত্রিভনের মনে। সেই মুহূর্তে সে ভুলে যায় যে বাঘরায় শূন্য মনে শূন্য শয্যার ওপর ছট্‌ফট্ করছে। সবই হত, কিন্তু কিছুই হলো না তার। স্ত্রীকে পেল, ভালবাসল, প্রতিদানও পেল ভালবাসার অথচ টিকল না। মাঝখান থেকে শুধু পেয়ে হারানোর তীব্র ব্যথা, পিতৃস্নেহের ব্যথা, তার বুকখানাকে ধ্বসিয়ে দিয়ে গেল।

তবু আজ রাতে অন্ততঃ বাঘরায়ের এক মস্ত সান্ত্বনা রয়েছে—সে যুদ্ধে যাবে। যুদ্ধ থেকে না-ফেরার সৌভাগ্য তারও হতে পারে ডুইঃ-এর মত। ডুইঃ-এর মৃত্যু দুর্ভাগ্যের। সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের আগে কত আনন্দই না অনুভব করেছিল পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারল ভেবে। বেচারা জানতে পারল না, মরে যাওয়ায় কত বড় হতভাগ্য সে।

পারাউ মুর্মুর ঘরে রান্‌কো তখন তার নিজের জন্যে একটা ধনুক তৈরী করছিল—প্রদীপের আলোর নীচে। রাতের নিদ্রা বহুদিন থেকেই তার নেই। শেষ রাতে অবসন্ন হয়ে একটু ঘুমিয়ে নেয়।

রান্‌কোর চোখে ভাসে ঝাঁপনীর সেই মূর্তি—শালবনের মধ্যে বরাহভূমে যাবার দিন দেখেছিল যাকে। সে যেন ঝাঁপনীর প্রেতাত্মা। দেখার পর থেকে পৃথিবীর অনেক কিছু তার কাছে মূল্যহীন বলে বোধ হয়েছিল। কিন্তু ছুট্‌কীর মৃত্যুর বিবরণ শুনে সে যেন আবার বল পেয়েছে। ব্যর্থতার বল—বেদনার বল। কোমরে কাঠ নেওয়া ঝাঁপনীর সাংসারিক কথা-বার্তার মধ্যে তাকে খোঁজা বৃথা। আসল ঝাঁপনী রয়েছে তার অন্তরের গভীরতম প্রদেশে। সে নিজেই হয়ত তা জানে না—জানতে চায় না। কারণ জেনে লাভ নেই কোন। সেদিন ঝাঁপনী নিজের ওপরটাই শুধু দেখিয়েছিল হয়ত, যেমন ছুট্‌কী দেখাত নিজেকে না জানতে পেরে। তবু যদি একবার ঝাঁপনী আচমকা আভাসে প্রকাশ করে ফেলত তার আগেকার মনকে, বড় ভাল হত। ব্যর্থতার বেদনা উপভোগের মধ্যে একটা দ্বিধাভাব আসত না।

ধনুক তৈরী করতে করতে রান্‌কো প্রতিজ্ঞা করে আর কোনদিন সে ঝাঁপনীর সামনে যাবে না। দৈবাৎ দেখা হলেও কথা বলবে না। সেদিনের ঘটনা ভুলে যাবার চেষ্টা করবে। ঘর ছেড়ে চলে আসার দিনের ঝাঁপনীকেই সে মনে রাখবে চিরকাল।

বিদায়ের দিন এসে গেল। বাঘরায় আর রান্‌কো প্রস্তুত হল। তাদের সংগে যাবে সতেরখানি তরফের সিকি ভাগ পুরুষ। চাষবাসকে তো বন্ধ করা যায় না। নইলে অধ্যেক যেত। ঢাউরার জবাবে প্রায় সবাই জমা হয়েছিল কিতাগড়ে। সবাই যেতে চায়। বেছে নিতে হল তাদের ভেতর থেকে। শুধু একজন পুরুষই যে পরিবারের সম্বল, তাদের ঠেলে দেওয়া যায় না মরণের মুখে। আর যেতে দেওয়া যায় না তাদের, যারা ফসল ফলায়। অনেক আবেদন নিবেদনকে উপেক্ষা করতে হল তাই।

যাত্রার আগে কিতাডুংরির উৎসবের স্মৃতি মনের মধ্যে গেঁথে নিয়ে যাবে তারা।

রাজা রাণীর সংগে তরফের সবাই ভেঙে পড়ে সেখানে। রাণী বসলো রাজার পাশেই সেই পাথরের ওপর। চোখ জুড়োলো সকলের। সজল চোখে ভাবল সবাই, রাণী যে তাদেরই ঘরের মেয়ে।

সারিমুর্মু কেঁদে বলে ওঠে—রাজা, আজ যদি আমার ছেলে থাকত!

—আছে। রাণী বলে ওঠে সংগে সংগে।

ত্রিভন অবাক হল। অবাক হয় সর্দারেরা—আর যারা শুনেছিল রাণীর কথা।

—বাঘরায় সোরেণ আপনার ছেলে সর্দার।

—বাঘরায়? তাই তো। হ্যাঁ হ্যাঁ—বাঘরায়, তুই-ই আমার ছেলে।

ছুটে এসে বৃদ্ধ সর্দারের হাঁটু জড়িয়ে ধরেছিল বাঘরায়। বলেছিল —আমি তোমারই ছেলে সর্দার। কিন্তু আশীর্বাদ কর যেন আর ফিরে না আসতে হয়। আমারও যে ছেলে নেই। ছুট্‌কী একজনকেও রেখে গেল না।

রাণীর মুখ বেদনায় ক্লিষ্ট। রাজা বিচলিত।

রান্‌কো এগিয়ে আসে। বাঘরায়ের হাত ধরে টেনে তোলে। তার মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হাসে। শেষে বলে—খালি বুকেই আগুন জ্বলে

বাঘরায়। সেই আগুনই না ঘরের বাইরে ছুটিয়ে নিয়ে যায়। এত বীরত্ব আর যুদ্ধ—সব ওই খালি বুকের কাণ্ড। ভরা বুক একটুকুতেই ভয়ে কাঁপে। হারাবার ভয়। যার সব হারিয়েছে তার ভয় কি?

শেলের মত ত্রিভনের বুকে কথাগুলো এসে বেঁধে। থাকতে না পেরে সে বলে—একি সত্যি রান্‌কো?

—হ্যাঁ রাজা।

—এত লোক এখানে জমা হয়েছে,—হাণ্ডি খেয়ে নাচছে, গাইছে। অনেকেই শেষবারের মত এসব করছে। সবারই বুক কি খালি?

—না রাজা। সতেরখানিকে তারা ভালবাসে, তাই যাচ্ছে। তারা লড়বে, বীরত্বও দেখাবে। কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়া যাকে বলে—তারা তা পারবে না। ভানুমতীর খেল দেখাবার সাধ্য তাদের নেই। খেল দেখায় ডুইঃ টুডু। বাঘরায় সোরেণ আর রান্‌কো কিস্‌কুর দল।

রাণীর কথা রান্‌কো ভুলে গিয়েছিল। হঠাৎ সেদিকে নজর পড়তে রাজ্যের সংকোচ এসে তার মাথাটাকে হেঁট করে দেয়।

রাজা চিন্তান্বিত হয়। মনে পড়ে তার সেদিনের কথা, যেদিন অদৃশ্য হল ধারতি। প্রচণ্ড মশার কামড় সহ্য করে প্রহরের পর প্রহর বসেছিল মারাংবুরুর ঠাঁইএর পাশে ঝোপের মধ্যে। ভালুকের কথা মনে হয় নি—সাপের কথাও নয়। স্বাভাবিক অবস্থায় সে কি তা পারত? বোধ হয় না। তখন যে বুক ছিল শূন্য।

—তোমার কথা সত্যি রান্‌কো। ধীরে ধীরে বলে ত্রিভন।

ত্রিভন আবার ভাবে। বুক ছিল তার শূন্য সেদিন, কিন্তু তবু আশা ছিল। ধারতিকে ফিরে পাবার আশা। তাই নির্ভীক হলেও, সতর্কতা ছিল। বাঘরায়ের সে বালাই নেই। সে সবচাইতে হতভাগা। রান্‌কোর আশা এখনো সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়েছে বলা যায় না—কিন্তু বাঘরায়ের আশার ভাণ্ডার পুরোপুরি খালি। সে জেনেছে, এতদিন যাকে নিয়ে ঘর করেছে, সে ছিল একান্তই অন্যের। ছুট্‌কী বেঁচে থাকলে তবু প্রতীক্ষায় অগ্নি-পরীক্ষা দিতে পারত সে—যেমন দিচ্ছে রান্‌কো—সে পথও বন্ধ বাঘরায়ের।

মেয়েরা দল বেঁধে নেচে চলেছে পুরুষদের ঘিরে ঘিরে। হাণ্ডি খাওয়া নাচে সংযমের বালাই থাকে না। আজ একেবারেই নেই। সবাই

জানে যে-সমস্ত পুরুষ আজ জমা হয়েছে এখানে তাদের অনেকেই সতেরখানির মাটিতে আর পা দেবে না কোনদিনও। উদ্দামতা তাই সীমা ছাড়িয়েছে। পুরুষেরা চায় চরম স্ফূর্তি, মেয়েরা চায় শেষবারের মত তুষ্ট করতে তাদের—নিজেরাও তুষ্ট হতে।

কাণ্ড দেখে ত্রিভন নীচুগলায় ধারতিকে বলে—এবার তোমার ফিরে যাওয়াই ভাল।

—কেন?

—দেখছ না?

—কি?

—বলে দিতে হবে?

—এমন তো হবেই। আমার তুমি আছো—তোমার আমি আছি। কিতাপাট দুজনকে কাছে এনে দিয়েছেন। অনেকের তো সে সুযোগ হয় নি। কাঁটারাঙ্গায় যখন ছুটে যেতাম আমরা—সে সময়ে যদি তুমি যুদ্ধে যেতে কি করতাম আমি? এমন সুযোগ হয়ত তোমার আসেনি রাজা বলে। এলে কি ব্যর্থ হতে দিতে?

ত্রিভন যেন ধারতির নতুন পরিচয় পায়। তারও ইচ্ছে হয় ধারতির হাত ধরে ওদের দলে মিশে গিয়ে উন্মত্ত হয়ে ওঠে।

ঝাঁপনী বসেছিল এক শালগাছের গোড়ায় তিনটে ছেলে নিয়ে। সবচেয়ে ছোটটি ঘুমিয়েছিল তার কোলে। তার ওপরেরটি সমানে কাঁদছিল মায়ের দুধ খাবার জেদ ধরে। অন্যদিন হলে তার পিঠে দু'চার ঘা বসিয়ে দিত ঝাঁপনী। কিংবা রাগ করে স্তনের ডগা মুখে ভরে দিয়ে নিশ্চিন্ত হত। কিন্তু আজ একটু অন্যমনস্ক সে।

সাল্‌হাই হাঁসদা আসেনি এখানে। তার নাকি অনেক কাজ রয়েছে ক্ষেতে। ঢাউরা শুনে সে কিতাগড়েও যায় নি। ঝাঁপনী ছি ছি করেছিল লজ্জায়। সাল্‌হাই হেসেছিল। সর্দার হবার সখ ছিল তার। তা যখন সম্ভব হয়নি, তখন এসব অশান্তির মধ্যে গিয়ে লাভ কি?

ঝাঁপনীকেও আজ সে আসতে মানা করেছিল কিতাড়ুংরিতে। শোনেনি ঝাঁপনী। এতগুলো লোক যুদ্ধে যাচ্ছে—দেখেও কত আনন্দ। তাছাড়া আর একটা আশাও ছিল।

হঠাৎ সে চমকে দেখে পাশে রান্‌কো দাঁড়িয়ে। হাসিমুখে তার ছোট বাচ্চাটার দিকে চেয়ে রয়েছে।

—আবার হবে নাকি? প্রশ্ন করে রান্‌কো। ঝাঁপনীকে একা বসে থাকতে দেখে সে পূর্ব প্রতিজ্ঞা ভুলে গিয়েছিল।

—যাঃ, কি যে বল।

—সাল্‌হাই কোথায়?

—আসেনি!

—আজও এলোনা?

—তার নাকি ক্ষেতে অনেক কাজ।

—ও। রান্‌কো একটু থেমে বলে,—তুমি এমন চুপ করে বসে আছো যে?

—কি করব?

—নাচবে, হাণ্ডি খাবে—সবাই যা করছে।

—এরা? নিজের ছেলেদের দেখায় ঝাঁপনী।

রান্‌কো অবাক হয়, ঝাঁপনী একেবারে বদলায় নি তাহলে। সাল্‌হাই তাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে পারেনি এখনো। সে বলে—এরা আর কারও কাছে থাকবে। বুড়ীর অভাব আছে নাকি?

—কার সংগে নাচবো?

—যার সংগে ইচ্ছে।

ঝাঁপনী সংকোচে বলে—তুমি? রান্‌কোর কাছে থাকার সময়ে তারা প্রায়ই নাচত। সেই স্মৃতি বোধহয় মনে পড়ে।

—হুঁ।

ঝরঝর করে ঝাঁপনীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। সে কোন-রকমে বলে—তুমি যদি আর না ফের।

অবাক হয় রান্‌কো। সেদিন তবে ভুলই দেখেছিল। আগের ঝাঁপনীই রয়েছে এখনো। আনন্দে মন নেচে ওঠে তার।

বহুদিন পরে রান্‌কোকে পেয়েই আবার হারানর ভয় তার।

অপ্রস্তুত হয় রান্‌কো। কি করবে ভেবে পায় না। কিছুই করার নেই অথচ—। সে আস্তে আস্তে ঝাঁপনীর একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নেয়।

হাণ্ডি না খেয়েও মাতালের মত নাচে তারা দুজনে। পায়ে পাথরের খোঁচা লাগে—পা ফেটে রক্ত বার হয়। হুঁস থাকে না। টামাকের তাল তাদের পায়ে। তাদের সর্বাংগে, তাদের হৃদ্‌পিণ্ডে, তাদের মনে।

—আমাকে নেবে তোমার সংগে? আস্তে আস্তে বলে ঝাঁপনী।

—কোথায়?

—যুদ্ধে।

—পাগল।

—কেন?

—ছেলেপিলে?

—ওদের বাপ্ দেখবে। আমার দোষে হয়েছে ওরা?

—কারও দোষেই নয়।

—নেবে?

—তা হয় না ঝাঁপনী।

—তবে কথা দাও।

—কি কথা?

—ফিরে আসবে।

রান্‌কোর মাথা ঘুরতে থাকে। কিছুক্ষণ আগে বাঘরায়কে যা বলেছিল সব মনে পড়ে তার। ভাবতে অদ্ভুত লাগে—এর মধ্যেই কত বড় এক পরিবর্তন ঘটে গেল। ডুইঃ টুডু আর বাঘরায়ের দলে নিজেকে আর নির্বিচারে ফেলতে পারছে না সে এখন। কারণ শালবনের ঝাঁপনী আর কিতাডুংরির ঝাঁপনী এক নয়।

রাজাকে সে গর্ব করে বলেছিল, যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে সবাই পারে না, সেও কি পারবে এখন?

ঝাঁপনী জানে, রান্‌কোর সংগে সে জীবনে মিলতে পারবে না। নিজে হাতে তার কাজ সে কখনই করে দিতে পারবে না। পারাউ সর্দারের নির্জন কুটিরে রান্‌কোর পিপাসা মেটাবার জন্যে এক কলসী জল পৌঁছে দেবারও সৌভাগ্য তার হয়ত হবে না কোনদিন। তবু সে তার নিরাপত্তা চায়। সে বেঁচে আছে এইটুকুতেই তার শান্তি।

আকুলভাবে রান্‌কোর মুখের দিকে চেয়ে থাকে ঝাঁপনী। জবাব

চায় সে। স্পষ্ট জবাব। অমন হেঁয়ালী-ভরা হাসিমুখ দেখে সে কখনই কিতাভুংরি ছেড়ে যাবে না।

—বল।

—কি বলব।

—ফিরে আসতেই হবে।

—লাভ ?

—জানিনে। শুধু বল ফিরে আসবে।

—পালিয়ে ?

—না না—যুদ্ধ করে ! রান্‌কো সর্দার পালাতে জানেনা তা আমি জানি।

—যুদ্ধ করে ফিরে আসা কিতাপাটের হাত।

—জানি। কিন্তু যুদ্ধ করতে গিয়ে পাগলামী করোনা।

রান্‌কো বুঝতে পারে ঝাঁপনী কি বলতে চায়। এবারের পূরো সম্মান বাঘরায়ের ভাগ্যে।

—তুমি কি চাও বাঘরায়ের চেয়ে আমি ছোট হয়ে যাই ?

—না।

—তবে ?

—অত জানি না—বলতে পারি না। ফিরে এসো—শুধু তুমি ফিরে এসো। কান্নায় ভেঙে পড়ে ঝাঁপনী।

বহুদিন পরে বুক-ভরা দুর্বলতা রান্‌কোকে চুরমার করে দিতে চায়। শালগাছের আড়ালে ঝাঁপনীকে টেনে নিয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরে বলে—যদি ফিরি, তোমার জন্যেই ফিরব ঝাঁপনী। এককালে তুমি ছিলে সবার ওপরে। এখন সতেরখানির পরেই তুমি এইটুকু পার্থক্য।

এক সময় নাচ থামায় তারা। ফিরে আসে রান্‌কো রাজারাণীর পাশে। শরীর আর মনে তার অসীম শক্তির অবসাদ।

বাঘরায় ম্লান হেসে তার দিকে চেয়ে থাকে। সে আগাগোড়া দেখেছিল সব। রান্‌কোর মুখ নীচু হয়। তাকাতে পারে না বাঘরায়ের চোখের দিকে। ছোট—অনেক ছোট সে বাঘরায়ের চেয়ে। বুকের আগুন আর আগের মত জ্বলছে না।

—বড় আনন্দ হল রান্‌কো। বাঘরায়ের কথায় অকৃত্রিমতার ছাপ।

—কি বললে ? থতমত খায় রান্‌কো।

—তুমি ভুইঃ-এর দলে। জিতে গেলে। ভুল করো না সেই হতভাগার মত।

রান্‌কো মর্মে মর্মে অনুভব করে—এত যে ভীড়, এর মধ্যেও বাঘরায় একা। নিঃসংগ। তার সংগে কারও তুলনা হয় না। যেন অ-নে—ক উঁচু এক পাহাড়ের চূড়ায় সে রয়েছে—সবাই দেখতে পাচ্ছে অথচ নাগাল পাচ্ছে না।

ত্রিভন সিং একসময়ে সর্দারদের কাছে ডাকে। দিন শেষ হয়ে আসে। আনন্দ উৎসব বন্ধ করতে হবে।

কিতাপাটের কাছে আশীর্বাদ চেয়ে নেয় সবাই। শেষবারের মত মাদল বেজে ওঠে।

রাজারাণী বিদায় নেয়।

কিতাগড়ে ত্রিভনের সামনে এখন এসে বসে শুধু বৃদ্ধ সারিমুর্ম আর প্রৌঢ় বুধকিস্‌কু। সবারই মুখ থমথমে। তীর ছোঁড়া হয়ে গিয়েছে—ফিরিয়ে আনার উপায় নেই। লক্ষ্যস্থলে গিয়ে বিঁধবেই। তাতে উঠবে বিরাট আলোড়ন—সে আলোড়নের ঢেউ দ্রুত ধাবিত হবে বাটালুকার দিকেই। হয়ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বাটালুকা—নিশ্চিহ্ন হবে গোটা সতেরখানি তরফই।

তবু উপায় নেই।

সারিমুর্ম আপন মনে ঘাড় নাড়ে—উপায় নেই। সম্মানই যদি জীবনের মুখ্য জিনিষ হয়, তবে অন্য পথ ছিল না। সে ধীরে ধীরে বলে—রাজার কি আফশোষ হচ্ছে?

চমকে ওঠে ত্রিভন সারিমুর্মর কথায়। বুধকিস্‌কু ঘাড় ফেরায়।

—কিসের আফশোষ সর্দার?

—পরিণাম ভেবে?

—না, দুঃখ হ'চ্ছে। সমস্ত ঘটনার জন্যে নিজেকে দায়ী বলে মনে হচ্ছে। আজ বার বার একই কথা মাথার মধ্যে ঘুরছে। আমি রাজা না হলে হয়ত সতেরখানির এ-বিপদ কোনদিনই আসত না। দুরের পোতামকে তীর দিয়ে মেরে ফেললাম দেখে তোমরা অবাক হয়েছিলে সর্দার। নির্বিচারে আমাকে রাজা করলে। কিন্তু ঠিক কাজ করেছিলে কি সেদিন?

—হঁ্যা। ঠিক কাজই করেছিলাম। জীবনে বোধহয় ওই একটাই ঠিক কাজ করেছি। বুধকিস্কুর গলার পেশী ফুলে ওঠে।

—নরহরিকে সহ্য করলে এ বিপদ আসত না। ত্রিভন বলে।

—তা আসত না। তবে সমস্ত বীর্য হারিয়ে গলায় মালা পরে বেঁচে মরে থাকতাম রাজা। তার চেয়ে এ অনেক ভাল। বীরের মত মরা। আমরা, সাঁওতাল মুণ্ডারা এর চেয়ে বড় কিছু চাই না।

ত্রিভন চেয়ে থাকে বুধকিস্কুর দিকে। এমনিতে লোকটা বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দেখাতে পারে না। অথচ মাঝে মাঝে এমন সব কথা বলে, যা ভাবিয়ে তোলে। হৃদয় দিয়ে অনুভব করা জিনিষ কথায় রূপ পেলে সবার মুখেই সমান শুনতে লাগে।

—বুধ ঠিকই বলেছে রাজা। সারিমুর্মু বলে।

—আমি নিজেও জানি ঠিক। কিন্তু সতেরখানির শত শত কুঁড়েঘরের কথা মনে পড়ে গেলে বড় দুর্বল হয়ে পড়ি।

—সে দুর্বলতাকে আর মনে স্থান দেবেন না রাজা। যে কুঁড়েঘরের কথা ভেবে আপনি কষ্ট পান, একবার গিয়ে দেখবেন চলুন, সে কুঁড়েঘরের প্রাণীগুলোর বুকে কতখানি গর্ব আজ। রাজা খাঁড়েপাথরের পরে এ-গর্ব অনুভব করার সুযোগ আর কখনো আসেনি। সারিমুর্মু বলে।

—যদি তাদের আপন মানুষরা ঘরে না ফেরে?

—তারা কাঁদবে—আকুল হয়েই কাঁদবে। তবু তাদের গর্ব বাতাসে মিলিয়ে যাবে না। আমার মত যখন বয়স হবে তাদের নাতি নাতনিদের শোনাবে বংশের গৌরবের কথা। আর নাম করবে আপনার। বৃদ্ধ সর্দারের গলা আবেগে কেঁপে ওঠে।

মুংনী এসে ত্রিভনের সামনে দাঁড়ায়। মেয়েটি রাণীর পরিচারিকা—বছর তেরো বয়েস। সারিমুর্মু বহুদিন রেখেছিল একে। সেখান থেকে বাঘরায় নিয়ে আসে কিতাগড়ে।

রাজার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মুংনী। কি যেন বলতে চায়—অথচ বলে না। কিছু বলার জন্যেই এসেছে সে। নইলে দরবারে অন্তঃপুরের পরিচারিকার দাঁড়াবার কোন কারণ নেই।

ত্রিভন অস্বস্তি অনুভব করে। সে জানে, ধারতির কাছ থেকে তলব এসেছে। মুংনী না বললেও, তার চোখে মুখে সেই কথাই লেখা রয়েছে।

তবু একটা গুরুতর আলোচনার মধ্যে তার আবির্ভাব বেমানান। উঠে অন্দর মহলে যেতে ইতস্তত: করে ত্রিভন।

মুৎনী ফিরে যায় তার চোখের ইসারায়। আলোচনার জের টেনে ত্রিভন বলে—সতেরখানির ভবিষ্যৎ বাসিন্দারা যদি আমার নামই শুধু মনে করে—সেটা হবে মস্ত ফাঁকি। তাদের মনে রাখা উচিত বাঘরায় আর রান্‌কোর নাম। স্মরণ করা উচিত তাদের ভুইঃ টুডু, সারিমুর্মু আর বুধকিস্‌কুকে। আমি কে?

—মনে তারা সবাইকেই রাখবে রাজা। একজনকে আশ্রয় করেই তো অন্য সবাই অমর হয়। বুধকিস্‌কু আরও জেঁকে বসে।

সারিমুর্মু ভাবে বুধটার বুদ্ধি আর পাকল না। চিরকাল সাদাসিদেই থেকে গেল সে। রাজার চোখ-মুখের চাঞ্চল্য লক্ষ্য করার মত চোখও নেই তার। সে তাড়াতাড়ি বলে—আমরা আজ চলি রাজা। কাল সকালে আবার আসব।

—এখনই। বুধ অবাক হয়।

—হ্যাঁ, তোমার ওই দোষ। একবার বসলে আর উঠতে চাওনা। এখনি কেমন যেন বুড়ো হয়ে পড়েছ।

—কে বলল? লাফ দিয়ে উঠে পড়ে বুধ।

ত্রিভন হেসে ফেলে বলে—সর্দারকে এ-বদনাম দিওনা সারিমুর্মু।

বুধের পিঠে হাত রেখে হাসতে হাসতে কিতাগড় ছাড়ে সারিমুর্মু।

অন্দরে যেতেই ধারতি ফুলের মালা হাতে এগিয়ে আসে। বিস্মিত হয় ত্রিভন। কিতাডুংরির উৎসবের পর যেদিন রান্‌কো আর বাঘরায় চোয়াড় বাহিনী নিয়ে দেশ ছাড়ল সেদিন বিকেলে মালা না নিয়ে এগিয়ে এসে তাকে চমকে দিয়েছিল ধারতি। প্রথম নিয়মভংগ সেদিন। আঘাত পেয়েছিল ত্রিভন মনে মনে।

ধারতি হেসে বলেছিল—কত মেয়ের স্বামী গেল যুদ্ধে। দিনে তারা আনমনা হয়ে ঘরের কাজ করছে আর রাতে একলা বিছানায় শুয়ে ছট্‌ফট্ করছে। আমাদের এ আনন্দও বন্ধ থাকনা রাজা। ওরা যে তোমারই প্রজা। ওদের দুঃখের অংশীদার তো আমরাই।

আনন্দে ভরে উঠেছিল ত্রিভনের মন।

এতদিন পরে আবার ধারতির হাতে ফুলের মালা দেখে সে ভাবল,

কষ্টকে দীর্ঘতর করা সামর্থে কুলালো না তার। মনে মনে দুঃখ পায় তাই।

—আবার এ সব কেন ধারতি? বেশ তো সয়ে গিয়েছিল।

—শুধু আজকের জন্যে।

—কিন্তু কেন?

—কারণ রয়েছে। মিষ্টি হাসে ধারতি।

—বিয়ের দিন তো আজকে নয়? জন্মদিনও নয়।

—এছাড়া অন্য কোন বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে না। আজকের দিনের?

—পারে, তবে আমার অনুমানের বাইরে।

—তাই-ই। হেসে ফেলে ধারতি।

—বল তবে।

—বলব বলেই তো মুৎনীকে পাঠিয়েছিলাম। এখন যে পারছিনা। বলা এত কঠিন আগে বুঝিনি।

ত্রিভন চেয়ে দেখে রাজ্যের লজ্জা এসে জড়ো হ'য়েছে ধারতির মুখে। সে বলে—মালা যখন হাতে নিয়েছ বলতেই হবে। নইলে গলায় পরিয়ে দেবে কি বলে?

—বলব। ধারতি মালা হাতে আরও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। কি যেন ভাবে। শেষে ছুটে এসে ত্রিভনের গলায় পরিয়ে দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বলে—তোমার ছেলে।

—আমার ছেলে? বিস্মিত হয় ত্রিভন।

ধারতি ছেলেমানুষের মত মাথা ঝাঁকায়।

—কই।

—এসেছে।

—আলো দেখতে পায় ত্রিভন। ধারতিকে ছেড়ে দূরে সরে গিয়ে বলে—সত্যি?

—হুঁ।

আনন্দে বুক ভরে উঠলেও সে সংযত হয়ে বলে—ভালই হ'ল। এই দুর্দিনে আসছে সে—দুঃখের মধ্যেই মানুষ হ'তে হবে। শক্ত হয়ে উঠবে। সতেরখানির সার্থক রাজা হবে। রাজাই তো ধারতি?

—হ্যাঁ—রাজাই তো। এমনভাবে বলে ধারতি যেন সে সব জেনে ফেলেছে।

—কি করে বুঝলে?

—আমার মন বলছে।

—একটা নাম দিতে হয়।

—এখনি?

—নিশ্চয়।

—তুমি আস্ত পাগল।

—আর তুমি পাগ্‌লি।

ধারতি হাসে। ত্রিভনও হাসে। পাশাপাশি বসে দুজনা।

—কি নাম দেবে ধারতি।

—তোমার ছেলে, তুমি জান।

—তোমার কেউ না?

—তবু।

—তুমিই নাম দাও ধারতি।

—বেশ, দিলাম লাল সিং।

সুন্দর। এত তাড়াতাড়ি এমন সুন্দর নাম কি করে দিলে?

—অনেক দিন দিয়েছি।

—সে কি!

—হ্যাঁ। যেদিন আমাদের বিয়ে হল—সেদিন বাঁশী বাজিয়ে তুমি শেষ রাতে ঘুমিয়ে পড়লে। আমার চোখে ঘুম ছিল না। তোমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ তোমার ছেলের নাম মনে এসে গেল।

ত্রিভন স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে সতেরখানি তরফের রাণীর দিকে।

ধারতির কথাই ঠিক। ছেলে হয় তার। লাল সিং পৃথিবীর আলো দেখতে পায় কিতাগড়ের এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে। সতেরখানিতে আবার আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। প্রায় অর্ধেক পুরুষ সুপুর, ধলভূম আর বরাহভূমের সীমান্তে যুদ্ধ করলেও উৎসবে যেন ভাঁটা পড়ে না। লোকেরা শুনে কিতাগড়ের চারপাশে ভীড় জমে। নাচে তারা, গায় তারা। টামাকতিরিও বাজিয়ে আনন্দ কোলাহল করে।

—দেখুন রাজা, সব দুঃখের মধ্যেও আনন্দকে ভুলি না আমরা। বুধকিসকু জনতার দিকে চেয়ে বলে ওঠে।

—যে রাজা আমাদের গর্ব, সেই রাজার ছেলেকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছে সতেরখানির সবাই। সারিমুর্মু বলে।

—লাল সিংকে দেখাবার ব্যবস্থা করতে হয়। ত্রিভন চিন্তিতভাবে বলে।

—হ্যাঁ। এই কিতাগড়ের ওপর মুংনীর কোলে তাকে দেখাবার ব্যবস্থা করুন। সারিমুর্মু বলে।

—মুংনী পারবে? ফেলে দেবে না তো?

—না রাজা। রাণীকে জিজ্ঞাসা করুন—তিনিও রাজী হবেন। ওর বুদ্ধি আর ব্যবহার সবই পরিণত। সারিমুর্মুর কথায় দৃঢ়তা।

—কি করে এত কথা জানলে সর্দার।

—ও তো আমার ওখানেই ছিল। তখন আরও ছোট ছিল। ছুটকী ওকে কিতাগড়ে দিতে বলেছিল।

রাজপুত্রের দর্শন পেয়ে জনতা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। আরও জোরে বেজে ওঠে টামাক্! জনতার কলরব বৃদ্ধি পায়। গর্বিতা মুংনীর কোলে ঘুমন্ত রাজপুত্র চমকে ওঠে। তার চারদিনের অভিজ্ঞতার মধ্যে এমন কখনো শোনেনি সে।

ঠিক সেই সময়ে একসংগে বহুলোকের চিৎকার ভেসে আসে শালবনের আড়াল থেকে, যার ধার ঘেঁষে প্রধান সড়ক চলে গিয়েছে সতেরখানির সীমার দিকে।

কিতাগড়ের কলরব থেমে যায় সে চিৎকারে। রাজার মুখে কথা নেই। সর্দাররা মূক, জনতা নিশ্চল। কেউ বুঝে উঠতে পারে না, কিসের চিৎকার।

মুংনীর কোলে লাল সিং ঘুমের মধ্যে হেসে ওঠে।

রাঙা ধুলো উড়তে দেখা যায় শালবনের ওপাশে। বিরাট জনতা এগিয়ে আসছে।

সর্দারদের মুখে দুর্ভাবনার রেখা। ত্রিভন লাল সিংএর হাসি দেখছিল।

—রাজা? সারিমুর্মু বলে।

—বল সর্দার।

—কারা এরা?

—শত্রু নয়।

—কি করে বুঝলেন ?

—লাল সিং হাসছে।

চুপ করে থাকে সারিমুর্মু। কপালের ওপর হাত রেখে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলে—আপনার অনুমানই বোধ হয় সত্যি।'

—কেন ? বুধকিস্কুর মনে তখনো অস্বস্তি।

—শত্রু অমন জানান্ দিয়ে আসে না বুধ। বিশেষ করে যখন তারা প্রধান ঘাঁটি দখল করতে আসে।

—তবে কি আমাদেরই লোক ? ফিরে এলো ?

—তাই মনে হচ্ছে।

রাজপুত্রের দর্শনার্থী, জনতা একদৃষ্টে চেয়ে থাকে কিতাগড়ের ওপরের রাজা আর সর্দারদের মুখের দিকে। তারা দেখে—সেসব মুখে কোন আদেশ লেখা নেই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে তারা নিজেরাই সামান্য যে দু'চারখানা অস্ত্র সংগে করে এনেছিল তাই নিয়ে সারিবদ্ধ হ'য়ে দাঁড়ায় কিতাগড়ের সামনে।

ত্রিভন হাত নেড়ে শান্ত হতে বলে তাদের।

দোলায়মান মন নিয়ে তবু তারা দাঁড়িয়ে থাকে। ভাবে রাজা তাদের শক্তিহীন জেনে নিরস্ত হতে বলছেন। কিন্তু তাদের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। শেষ রক্তবিন্দু শরীরে থাকা পর্যন্ত ঠেকাতে হবে শত্রুদের। বিনা বাধায় তারা এসে কিতাগড় দখল করবে সে যে মরণের চেয়েও যন্ত্রণাদায়ক।

বাঁকের মুখে এসে পড়েছে তারা। একটু পরেই দেখা যাবে। বাঁকটা খুবই কাছে। সবার মনে উদ্বেগ আর উত্তেজনা।

সহসা সারিমুর্মু চিৎকার করে ওঠে,—রান্‌কো—। আবেগে থরথর করে কাঁপে তার পরিণত দেহ।

তাইতো ? সবার বিহ্বল চোখের দৃষ্টি আটকে যায় জনতার সামনে রান্‌কোর ওপর। আরও এগিয়ে এলে দেখতে পাওয়া যায় রান্‌কোর মুখে উল্লাসের হাসি। এ-হাসি পরাজয়ের হাসি নয়। ত্রিভনের বুক দুলে দুলে ওঠে। রান্‌কোকে অলিংগনের জন্যে উতলা হয় সে।

কিতাগড়ের জনতা রাজা আর সর্দারের মতই আনন্দিত হয়। প্রথমে

তারা আনন্দে চিৎকার করে ওঠে কিন্তু পরমুহূর্তেই থেমে যায়। তারা দেখতে পায় রান্‌কো হাসতে হাসতে এলেও, যত বড় দল নিয়ে সে বিদায় নিয়েছিল, ঠিক তত বড় দল আর নেই। কে পড়ে থাকল সেই নির্বান্ধব দেশে? সবাই পড়ে থাকলে সান্ত্বনা ছিল। কিন্তু অধিকাংশই ফিরে এল। এলো না কে? এতদিনের বেঁধে রাখা অনেকগুলো বুক একসংগে কেঁপে ওঠে।

রান্‌কোর দল প্রথমে শুধু রাজা আর সর্দারদেরই দেখেছিল। কিতাগড়ে নীচের ভীড় তাদের চোখে পড়েনি, তাই ভীড় দেখে থমকে দাঁড়ায় তারা। কোন দুঃসংবাদ? বাঘরায়ের দলের কোন দুসংবাদ কি এসে পৌঁছেচে তাদের আগে? কিন্তু তাহলে রাজা আর দুই সর্দারের মুখ খুশীতে অমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে কেন? তবে কি কেউ আগে এসে জানিয়ে দিয়েছে তাদের আগমনবার্তা।

একটু পরেই দুইদল মিশে এক হয়ে যায়, আসল খবর পায় রান্‌কোর দল। আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করে ওঠে তারা।

ভীড়ের মধ্যে হুটোপুটি লেগে যায়। ফিরে আসা চোয়াড় বাহিনীর মধ্যে আত্মীয়স্বজনকে খোঁজার তৎপরতা দেখা যায়।

ত্রিভন জানে হাসি আর কান্নার এক দৃশ্য দেখা যাবে এখনি। যুদ্ধে গেলে কি সবাই ফিরতে পারে? কখনো কি হয়েছে এমন পৃথিবীর কোথাও? যা এসেছে তাই যে কল্পনাতীত। এত ফিরবে বলে আশা করেনি কেউ। যারা এখনি ডুক্‌রে কেঁদে উঠবে তারাও নয়।

কিতাগড়ের গোড়ায় দাঁড়িয়ে রান্‌কো গলা চড়িয়ে বলে—রাজপুত্রকে কি আমরা দেখতে পাবনা রাজা?

মুৎনী লালসিংকে কৌশলে একটু ঘুরিয়ে ধরে। কেঁদে ওঠে লাল সিং।

ভীড়ের মধ্যে কান্নার আওয়াজ শোনা যায়। খবর পেয়ে গিয়েছে অনেকেই। মাটিতে গড়িয়ে পড়ে যুবতী, বৃদ্ধ, প্রৌঢ়া। তাদের লোক ফেরেনি। ফিরবেও না কোনদিন। ঘর তাদের কতদিনের জন্যে অন্ধকার হয়ে গেল কেউ বলতে পারে না।

ত্রিভনের চোখে বাষ্প। মনে আবার সংঘাত সৃষ্টি হয়—দেশের সম্মানের জন্যে মৃত্যু বড়, না অপমান সয়ে শান্তিতে থাকাই বড়।

—আসুন রাজা, সারিমুর্ম ডাকে। বাঘরায়ের কথা মনে পড়ে তার।

ছুটকীর স্বামী বাঘরায়। সে কেমন আছে কে জানে। অতদূর থেকে রান্‌কো ফিরে এলো, অথচ সে এলোনা। সে তো প্রায় ঘরের দুয়োরেই যুদ্ধ করছে। আগে তারই ফিরে আসা উচিত ছিল। তবে সে নিশ্চয়ই বেঁচে রয়েছে। বেঁচে না থাকলে, দলের লোক ফিরে আসত।

বাঘরায়ের দলের দুজন মাত্র চোয়াড় একদিন ফিরে এসে দাঁড়াল কিতাগড়ে। সারিমুর্মুর কথা বন্ধ হয়। রান্‌কোর চোখে বিষাদ। বুধ-কিস্‌কু বিচলিত। ত্রিভনের চোখে বিরাট জিজ্ঞাসা।

ধীরে ধীরে রাজার সামনে এগিয়ে যায় দুই চোয়াড়। থমথমে আবহাওয়ার মধ্যে আভূমি নত হয়ে রাজাকে প্রণাম করে।

—বাঘরায়? ত্রিভনের গলার স্বর অস্ফুট।

সারিমুর্মু আপ্রাণ চেষ্টায় সেই কথাটাই জানতে চায়। কিন্তু কে যেন তার টুঁটি চেপে ধরেছে। বুধকিস্‌কু আর রান্‌কোও তাই জানতে চায়, অথচ সাহস পায়নি। সারিমুর্মুর মাথাটা সামনে ঝুঁকে পড়ে। সে উপলব্ধি করে, রাজার প্রশ্নের যে জবাব মিলবে তা সে সহ্য করতে পারবে না—কিছুতেই নয়। বাঘরায় এরই মধ্যে সত্যিই যে তার সত্যি ছেলে হয়ে উঠেছে জানত না সে।

—তিনিই পাঠিয়েছেন রাজা।

—সর্দার? ত্রিভন চিৎকার করে ওঠে সারিমুর্মুর দিকে চেয়ে।

রান্‌কো ছুটে সারিমুর্মুর পাশে গিয়ে তাকে ঝাঁকিয়ে বলে—ওরা কি বলল, শুনেছ সর্দার?

—না। একটু ঘুম পেয়েছিল বোধ হয়।

—বাঘরায় পাঠিয়েছে ওদের।

দুজন চোয়াড়ের একজন বুক ফুলিয়ে বলে—সব যুদ্ধেই জিতেছি আমরা। সুপুর রাজের রাজ্যে এনেছি অশান্তি। আমাদের রুখতে পারেনি কেউ। সর্দার আমাদের সবার বুকে অদ্ভুত সাহস এনে দিয়েছেন।

—বলিনি রাজা? বাঘরায় আপনার সেরা সর্দার? সারিমুর্মু এতক্ষণে আনন্দে ফেটে পড়ে।

—আমি জানি সর্দার।

—আমরাও জানি। রান্‌কো কথাটা বলে বটে, কিন্তু দুর্ভাবনা হয় তার বাঘরায়ের জন্যে। কিতাডুংরির পাহাড়ের ঘটনা মনে পড়ে তার।

ঝাঁপনীর সংগে উন্মত্তের মত নৃত্যের সময় সহসা এক সময় বাঘরায়কে লক্ষ্য করেছিল সে। তার দৃষ্টিতে ছিল শূন্যতা। সে দৃষ্টির অর্থ খুবই পরিষ্কার।

লোক দুটি বলে—সুপুররাজ আমাদের সংগে সন্ধি করেছেন। ব্যবহারও করেছেন খুব ভাল। তাই বেশী কিছু করা গেল না।

—বাঘরায় ফিরল না কেন? তার লোকজন?

—তিনি ফিরবেন না। খবর পাওয়া গিয়েছে যে সন্ধি করলেও সুপুর-রাজ গোপনে বরাহভুমে দূত পাঠিয়েছেন। সব রাজা মিলে একজোট হবার চেষ্টা করছেন। সতেরখানির দিকে এগিয়ে আসবেন তাঁরা। সর্দার তাই দলবল নিয়ে লুকিয়ে রয়েছেন বরাহভূমের কাছাকাছি। সেরকম কিছু দেখলেই আবার আক্রমণ চালাবেন। যদি ঠেকাতে নাও পারেন, সংবাদটা অন্ততঃ পৌঁছে দেবেন কিতাগড়ে।

—তুলনা হয়না বাঘরায়ের। ত্রিভন বলে।

—বাঘরায় আমাদের গর্ব রাজা। বুধকিস্কু বলে ওঠে।

রান্‌কো বলে—সে আর দেশের মাটিতে পা দেবেনা।

—কেন? ত্রিভনের প্রশ্ন।

—সারিমুর্মু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে রান্‌কোর মুখের দিকে।

—পৃথিবীতে তার কেউ নেই।

—আমি আছি—ওর বাবা। সারিমুর্মু আধা-বিশ্বাসের স্বরে বলে।

—ওটা হল কথার কথা। ছুটকী সেদিন থেকে নেই, বাঘরায়ও নেই সেদিন থেকে। এটাই হল আসল সত্যি।

একটা থমথমে আবহাওয়া নেমে আসে কিতাগড়ের দরবারে। রান্‌কোর কথাকে উড়িয়ে দিতে পারে না কেউ। ধ্রুব সত্যকে হৃদয়ংগম করে বোবা হয়ে যায় সবাই। যে লোকটি দেশের জন্যে বিস্ময়কর কাজ করে চলেছে, সে একটি শক্তিমাত্র। বাঘরায় নয়।

চোয়াড় দুজনার একজন বলে—আপনার কথাই ঠিক সর্দার। আমিও যেন এখন বুঝতে পারছি। অনেক আগেই তিনি ফিরতে পারতেন—আপনারও আগে। লুঠ করে আমরা যা পেয়েছিলাম পনেরো দিনে সতেরখানি তা শেষ করতে পারত না। লুঠের মাল নিয়ে দলের সবাইকে ফিরে আসতে বললেন তিনি। সংগে রাখলেন শুধু পাঁচজন

চোয়াড়কে। বললেন, যুদ্ধ তাঁর শেষ হয়েছে—এবার শুধু সংবাদ পাঠাবার পালা। কিন্তু কেউ ছাড়তে চাইল না তাঁকে। অনেক বুঝিয়েও তিনি তাদের রাজী করাতে পারলেন না। তাই লুঠের মাল লুকিয়ে রাখতে হল পাহাড়ের এক গুহায়।

—কেউ আসতে চাইল না? সারিমুর্মু বলে। সে যেন বিশ্বাস করতে পারেনা কথাটা।

—না।

—ঘরের কথা ভুলে গেল তারা? বুধ বলে এবারে।

—সর্দারের চোখের দিকে চাইলে আপনারাও ভুলতেন। তিনি তো মানুষ নন—সাধু। কালাচাঁদ জিউ-এর চোখ দেখেননি? ঠিক তেমনি চাহনি তাঁর। আমরাও আসতে চাইনি। জোর করে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু থাকব না। আবার ফিরে যাব।

সারিমুর্মু শিশুর মত কেঁদে ওঠে।

ত্রিভন ধীরে ধীরে বলে—বরাহভূমরাজ যদি বাঘরায়ের মত একজনকে পেতেন তাহলে হয়ত মুর্শিদাবাদ দখল করতে পারতেন।

সর্দাররা চিন্তিত। তারা ত্রিভনের কথার অর্থ বোঝার চেষ্টা করে। এর মধ্যে হঠাৎ মুর্শিদাবাদের প্রশ্ন ওঠে কেন ভেবে ওঠতে পারে না। মুর্শিদাবাদ নামটা তাদের জানা। রাজার কাছ থেকেই জেনেছে। শুনেছে সেখানকার ওলট-পালটের কথা। সাদা মুখরা নাকি দখল করেছে সে রাজ্য—সমস্ত দেশটাই। কিন্তু অত বড় বড় কথা তারা মাথায় ঢোকাতে চায় না। মুর্শিদাবাদের যা-ই হোক—তাদের কিছু এসে যায় না। সাতেরখানি বাঁচলেই তারা তুষ্ট। তারা জানে, যেখানেই যা ঘটুক না কেন, সতেরখানির দিকে হাত বাড়াবে না কেউ। বাড়িয়েছেন শুধু তাদের খুবই চেনা-জানা বরাহভূমরাজ। তাও আবার সেই ভণ্ড বৈষ্ণবটার প্ররোচনায়।

—সর্দাররা চুপ যে—।

—না, এমনি আপনার কথা শুনছি। রানকো যেন লজ্জিত হয় একটু।

—কেন যেন আমি একটু বেশী ভাবি। তোমরা কান দিওনা। আমাদের স্বার্থ শুধু সতেরখানি।

বাঘরায়ের লোকেরা বিদায় নেয়।

খাঁড়েপাহাড়িতে দাবানল জ্বলে উঠল একরাত্রে। সমস্ত পাহাড়টা যেন জ্বলেপুড়ে খাক্ হয়ে গেল। স্তব্ধ হয়ে চেয়ে দেখল সতেরখানির অধিবাসী। অমাবস্যার সে-রাতে খাঁড়েপাহাড়ির আশেপাশে পূর্ণিমা। সে পূর্ণিমায় স্নিগ্ধতার পরিবর্তে প্রচণ্ড দাহ। বন্য পশুপক্ষীর আর্তনাদে দিগ্বিদিক প্রকম্পিত। বন্যবরাহ, বাঘ, হরিণের ছোটাছুটি গ্রামের রাস্তায়।

বরাহভূমের ইতিহাসে এতবড় দাবানলের কথা কেউ শোনেনি। সামান্য পাহাড়ের বনজ শক্তির পরিচয় যেন সেদিন বুঝতে পারল সবাই।

এরপর থেকে উৎপাত বেড়ে গেল বাঘ-ভালুকের। গরু মোষ খোয়া যেতে লাগল হরদম।

ত্রিভন বিচলিত। সর্দাররা হতভম্ব।

রান্‌কো বলে—ওরা বরাহভূম রাজের পক্ষ নিয়েছে রাজা। আমাকে একদল চোয়াড় দিন।

—যুদ্ধ করবে নাকি? বুধ বলে।

—হ্যাঁ। যুদ্ধই তো। হয় মারতে হবে, না হয় তাড়াতে হবে।

—কি ভাবে তাড়াবে?

—টামাকের সাহায্যে। পঞ্চাশটা টামাক একসাথে বেজে উঠবে—সেই সংগে একশো পুরুষের চিৎকার। টিকতে পারবে না ওরা। গাঁয়ের পর গাঁ তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে সীমান্ত পার করে দিয়ে আসব।

—তুমি সত্যিই বুদ্ধিমান রান্‌কো।

অভিযান চলে বন্য জন্তুর বিরুদ্ধে। একের পর এক গ্রাম এগিয়ে চলে তারা—রাতের অন্ধকারে। একশোটা মশালের আলোয় রহস্যঘন হয়ে ওঠে বন।

সাতদিনের মধ্যে সব অত্যাচার বন্ধ। নিশ্চিন্ত হয় প্রজারা। নিশ্চিন্ত হয় রাজা ত্রিভন।

সাতদিনের একটানা পরিশ্রমের পর ক্লান্ত রান্‌কো এগিয়ে চলে পারাউ মুর্মুর কুঁড়েঘরের দিকে—যেখানে এককালে দেশের রাণীর শৈশব অতিবাহিত হয়েছে।

কিতাগড়ে খবর এসেছে সুপুরের দল বরাহভূমরাজের সংগে মিশতে চেষ্টা করছে। বাঘরায় খবর পাঠিয়েছে। বিশ্রাম নেই—রান্‌কো ভাবে হয়ত আর মিলবে না বিশ্রাম।

রান্কো আঙিনায় এসে দাঁড়ায়। দাওয়ার দিকে চেয়ে চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না। ঝাঁপনী বসে ছিল দাওয়ার ওপর। রান্কোকে দেখে ম্লান হাসি হাসে সে। যুদ্ধ থেকে ফেরার পর ছয়মাস কেটেছে, রান্কো দেখা করেনি তার সংগে। সুযোগ পায়নি।

—সালহাই যদি টের পায়?

—সেজন্যে যাওনি বুঝি এতদিন?

—হাঁ।

—তুমি ভীতু। কাপুরুষ।

—তোমার খুব সাহস।

—হ্যাঁ। তোমাদের চেয়ে। এতদিনে চিনতে পারলেনা?

—খবর কি বল। দেখে তো মনে হচ্ছে—

ঝাঁপনীর মুখ রাঙা হয়ে ওঠে। সে খুঁটি ধরে উঠে দাঁড়ায়। শরীর ভারী। জোর করে হেসে বলে—তাই, কি হয়েছে?

—কিছু না। এমনি।

—চোখ দুটো অমন নিভে গেল কেন?

—তোমার কষ্ট দেখে। এত কষ্ট করে হেঁটে এসেছ দেখে মায়া হচ্ছে।

—আর কিছু না?

—পথ রেখেছ?

ঝাঁপনী নিজের হাত কামড়ায়। সালহাই এর ওপর রাগে তার সর্বাংগ জ্বলতে থাকে। বিধুয়া হেঁড়েলটা শুধু একটা জিনিষই জানে। ঠিক যেন এক ধেড়ে শূয়োর। সারাদিন খায়দায় আর গড়াগড়ি যায়।

—চল ঝাঁপনী পৌঁছে দিয়ে আসি।

কেঁদে ফেলে ঝাঁপনী। প্রথমে আস্তে আস্তে। তারপরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। রান্কো তার পিঠের ওপর হাত রাখে।

—না। ঝাঁপনী হাত সরিয়ে দেয় পিঠ থেকে।

—কেন?

—আমার দোষ? তুমি শুধু আমার দোষ দেখো। পৃথিবীর সবাই তাই দেখে। আমি কি করব বলতে পারো?

—কিছুই করবে না। অন্যায় তো করোনি।

—হ্যাঁ করেছি। কী অন্যায় করেছি জানিনা। তবু মনে হয় করেছি।

—মাথা খারাপ হয়েছে তোমার। চল।

একটু শান্ত হয় ঝাঁপনী। চোখের জল মুছে ফেলে বলে—তুমি আবার যাবে নাকি ?

—হাঁ। আমাদের এখন বিশ্রাম নেই ঝাঁপনী। বাঘরায় খবর পাঠিয়েছে। নতুন খবর।

—সে কি করছে ওখানে ? খবর না পাঠিয়ে নিজে লড়ুক।

—ছিঃ ঝাঁপনী, অমন স্বার্থপরের মত কথা বলনা। আট মাস বনে-জংগলে লুকিয়ে থেকে শত্রুদের বাধা দিয়ে আসছে বাঘরায়। নইলে অনেক আগেই বড় যুদ্ধ বাধত। বাঘরায়ের দলের লোক কমে এসেছে। অসুখ-বিসুখ আর উপোষে পরের জমিতে দাঁড়িয়ে কতদিন বাধা দেওয়া যায় ? তবু সে সময়মত খবর পাঠিয়েছে।

আর কিছু বলতে সাহস পায়না ঝাঁপনী। বলে লাভ নেই। ইচ্ছে হচ্ছিল তার, রান্‌কোকে দুহাত দিয়ে চিরকালের জন্যে বন্দী করে রাখে। মরলে দুজনা একসংগে মরবে। দুজনার বাহুবদ্ধ মৃতদেহ দেখে সবাই বুঝবে কি ছিল তারা। রাজা ত্রিভনের বিচারকে কিভাবে তুচ্ছ করেছে।

রান্‌কো ঝাঁপনীর হাত ধরে বাড়ীর বাইরে নিয়ে আসে। দূরে খাঁড়েপাহাড়িকে দেখা যাচ্ছে—ধূসরবর্ণ। কিছুদিন আগেও ওটা ছিল ঘন সবুজ। মারাংবুরু কি জেগে উঠলেন আবার ?

ধারতি অন্যমনা। সম্মুখে শিশুপুত্র লালসিং হামা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তবু লক্ষ্য নেই। সে বেশ বুঝতে পারে একটা অনিবার্য দুঃসময় এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। খাঁড়েপাহড়ির দাবানলের মত আর একটা ভীষণতম দাবানল গ্রাস করতে ছুটে আসছে সমগ্র সতেরখানি তরফকে। রক্ষা নেই কারও। মানুষ তো পশু নয়। পশুর মত পালিয়ে যেতে পারে না কেউ আগুণের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যে। সেটা ভীরুতা। আর এই দাবানলের প্রথম আহুতি হবে কিতাগড়ের রাজপরিবার। ধারতি ত্রিভনকে চেনে,—নিজেকেও।

লালসিং কেঁদে ওঠে। হাঁ করে কাঁদে সে। দাঁত দিয়ে নিজের জিভ কামড়েছে বোধ হয়। মুংনী পাশে কোথাও ছিল। ছুটে এসে কোলে নেয় তাকে।

মুৎনীর দিকে চেয়ে থাকে ধারতি। আশ্চর্য মেয়ে। দেখতে পাওয়া যায় না তাকে, অথচ তার উপস্থিতি অনুভব করা যায় প্রতিটি মুহূর্তে। ছায়ার মত সংগে সংগে ফেরে। ধারতি অবাক হয়ে দেখে, বেশ বড় হয়েছে মুৎনী। এতদিন চোখেই পড়েনি। সুন্দর ডাগর হয়ে উঠেছে। এই বয়সেই কাঁটারাস্তায় প্রথম ঘোড়ার পিঠে উঠেছিল সে। মুৎনীর কি সে অনুভূতি হয়েছে ?

ত্রিভন এসে সামনে দাঁড়ায়। রাজার মুখ যেন দিন দিনই বিষাদে ভরে উঠছে। এ-বিষাদ অকারণ নয়। তাই কখনো কোন প্রশ্ন করেনি সে।

—তুমিও শেষে ভাবতে সুরু করলে ধারতি।

—না ভেবে থাকতে চেষ্টা করি—পারি না। একটু থেমে ধারতি আবার বলে,—একটা কাজ করলে কেমন হয় রাজা।

—বল।

—ওরা এগিয়ে এলে শুধু তুমি আমি আর লালসিং গিয়ে বাধা দেব ওদের। প্রতিহিংসা গ্রহণের সুযোগ পেয়ে ওরা সতেরখানিকে আর নষ্ট করবে না।

—সেকথা যে আমি ভাবিনি—তা নয়। কিন্তু সে শুধু কল্পনা। সতেরখানিকে তুমিও জান, আমিও জানি। রাজাকে তারা শেষ পর্যন্ত নেপথ্যে রাখার চেষ্টা করবে। দেখলে না, রান্‌কোর কৌশল ? যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েও যেতে পারলাম না। ছুটল সে আগে ভাগে।

ধারতি চুপ করে থাকে। ত্রিভন ঠিক কথাই বলেছে। এতক্ষণ সে শুধু অলস কল্পনাই করে চলেছিল। যা অসম্ভব তা ভাবা বাতুলতা। সতেরখানির একটি প্রাণীও রাজাকে সামনে এগিয়ে দিয়ে ঘরের কোণায় লুকোবে না।

—বাঘরায় কি আর কোন সংবাদ পাঠিয়েছে রাজা ?

—না। বেঁচে আছে কিনা তাও বুঝছি না। একটা বড় রকম ঝুঁকি নেবে বলে জানিয়েছিল। বরাহভূমের রাজধানী আক্রমণ করবে রাতের অন্ধকারে।

—তুমিও কি সর্দারের সংগে সংগে পাগল হলে। এ যে অসম্ভব।

—কিন্তু বাধা দেব কেমন করে ? সে তো কারো কথাই মানবে না।

তা ছাড়া এক জায়গায় তো থাকে না বাঘরায়। রান্‌কো আগেই চলে গিয়েছে। নইলে বলে দিতাম তাকে খুঁজে বার করতে। অবিশ্যি দেখা হলে সে এমনিতেই ধরে রাখবে বাঘরায়কে।

—রান্‌কো সর্দারের এ অভিযানের উদ্দেশ্য কি?

—সে তার চোয়াড়দের ছোট ছোট দলে ভাগ করে ছড়িয়ে দেবে সীমান্তে। তারা তীক্ষ্ণ নজর রাখবে। শত্রুরা এলেই যাতে আমি সংবাদ পাই।

—লাভ হবে কি খুব?

—যতটা হয়। কিতাগড়ের পতন কিছুটা বিলম্বিত হবে।

—কিতাগড়ের পতন কি অনিবার্য?

—হ্যাঁ। মনকে প্রবোধ দিয়ে লাভ নেই। একটু ভুল আমি করেছিলাম। ভেবেছিলাম এই সব রাজারা একজোট হবে না কখনো। ছোটখাট ব্যাপারে তাদের ঝগড়া বেধেই ছিল। এখন দেখছি এরাও একজোট হতে পারে।

—যদি সন্ধি কর?

—বলছ?

—না। এমনি কথার কথা। যদি সন্ধি কর তবে কি তারা শান্ত হবে?

—না। প্রতিশোধ নেবেই তারা। নরহরি আছে ইন্ধন যোগাতে।

—আমারও তাই মনে হয়।

—তুমি কি সন্ধির কথা ভেবেছ?

—মাত্র একবার ভেবেছি। কাল লালসিংকে ইচ্ছে করে না খাইয়ে রেখেছিলাম। প্রথমে সে জেদের কান্না কাঁদল। খেতে পাওয়াটা যেন তার অধিকার। তাও যখন পেলো না, তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে সুরু করল। দেখে বড় কষ্ট হয়েছিল। শুধু সেই সময়ে একবার ভেবেছিলাম সন্ধির কথা।

—তুমি সংঘাতিক মেয়ে লিপুর।

—কী?

—লিপুর।

—হঠাৎ?

—বলতে পারি না।

—কাঁটারাঙ্গার কথা তোমারও মনে পড়ছে তবে!

—হাঁ। সব সময়।

—আমারও। তখন লালসিং ছিল না। তোমার রাজ্যও ছিল না। শুধু ছিল তোমার বাঁশীটা।

—আর? লিপুর ছিল।

মুৎনী ফিরে আসে। লালসিংএর কান্না থেমেছে। তাকে সামনে রেখে আবার মিলিয়ে যায় মুৎনী। অপেক্ষা করে আড়ালে। ঠিক সময়ে আবার আসবে।

সামনে এলো সে কিছুক্ষণ পরেই। ত্রিভনের পায়ের দিকে চেয়ে বলে—সর্দার বুধকিস্‌কু দেখা করতে চান।

—বুধকিস্‌কু? এসময়ে?

—জরুরী দরকার।

বুধকিসকুকে রীতিমত উত্তেজিত বলে বোধ হয়। পিঠের ওপর দুহাত ফেলে সে দ্রুত পায়চারী করছিল।

—কি হয়েছে সর্দার?

—সর্বনাশ।

—এগিয়ে আসছে বরাহভূম? বাঘরায় পারেনি ঠেকাতে?

—বরাহভূম নয়। যারা একা এগোবে বলে কখনো মনে হয়নি—তারাই। শ্যামসুন্দরপুর আর অম্বিকানগরের রাজারা সীমান্তে এসে পড়েছেন। রান্‌কোর দলের সংগে সংঘর্ষ বেধেছে। ঠেকিয়ে রেখেছে রান্‌কো।

—কোথায় খবর পেলে?

—লোক এসেছে। আহত সে। বস্তি রাজু পাঁওলিয়ার বাড়ীতে তাকে পাঠিয়েই আমি চলে এসেছি।

—হুঁ। শ্যামসুন্দরপুর আর অম্বিকানগর বোধ হয় 'সুখনিদির' কথা ভুলে গিয়েছে। বাবা বৈষ্ণব হয়ে বন্ধ করে দিয়েছিলেন বলে আমি চালু করিনি।

—ভাল ব্যবহার করার দিন আর পৃথিবীতে নেই রাজা। কবে দেখবেন হয়ত ধাদ্‌কা, তিনসওয়া আর পঞ্চসর্দারীও এগিয়ে আসছে।

—এ সময়ে অন্ততঃ তারা আসবে না। পঞ্চখুঁটের তিনখুঁট তারা। তারা জানে সতেরখানিকে এভাবে পেছন থেকে ছোরা মারলে, তারাও বাঁচবে না। বরাহভূমরাজ সবকয়টি তরফই কুক্ষিগত করে নেবেন।

—তবে তারা আমাদের সাহায্য করছে না কেন?

—বরাহভূমের বিরুদ্ধে যেতে চায় না তারা। ওদের কেউ আমাদের মত অবস্থায় পড়লে আমরাও হয়ত যেতাম না সাহায্যের জন্যে।

—কিন্তু এখন কি করবেন রাজা।

—যুদ্ধ করব। আমার সংগে তুমি যাবে। সুখনিদির ব্যবস্থা আবার করতে হবে। রান্‌কোর দলে মিলে আমি দুই রাজার সংগে যুদ্ধ করব। তুমি সেই সুযোগে তাদের রাজ্যে ঢুকে পড়বে।

এতক্ষণে বুধকিস্‌কু হেসে ওঠে। তার চোখদুটো চক্‌চক্ করে ওঠে। সে বলে—আমি চলি রাজা। প্রস্তুত হয়ে নি। চোয়াড়দের ডাকতে হবে।

—কত লোক আছে এখন?

—আজই সে হিসেব করেছি। তিনশ সত্তর।

—অনেক আছে। যাও।

ত্রিভন ফিরে আসে আবার ধারতির কাছে। ধারতি তখনো একই ভাবে চুপ করে বসেছিল।

—বিদায় নিতে এলাম রাণী।

—কেন?

—যুদ্ধে যাচ্ছি।

—আমার ওপর কিছু নির্দেশ আছে?

ত্রিভন হেসে ফেলে বলে—না, সেদিন এখনো আসেনি।

—তবে কি বরাহভূমের রাজারা আসছেন না?

—না। ত্রিভন সমস্ত ঘটনা খুলে বলে।

—এই রাজারা কেন আসছেন?

—মনে হয় বাঘরায়ের জন্যে বরাহভূম-রাজ এগোতে পারছেন না। তাই গোপনে শ্যামসুন্দরপুর আর অম্বিকানগরে খবর পাঠিয়েছিলেন। এরা আমাদের আক্রমণ করলে তাঁর সুবিধে হবে।

—এখনি যাচ্ছো নাকি?

—বুধকিসকু ফিরে এলে।

—চল। ধারতি উঠে দাঁড়ায়।

—কোথায় ?

যুদ্ধের সাজে সাজিয়ে দেব। এর পরে নিশ্চয়ই আর সুযোগ পাবো না। এবার তবু একটু সময় আছে।

ত্রিভন রাণীকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলে—আমারও সেই সাধ ছিল মনে মনে।

—নাগা সন্ন্যাসীদের সংগে যুদ্ধে যাবার সময় একটা ফুলের মালা গেঁথেছিলাম।

—দেখেছি আমি।

—সেটা এখনো রয়েছে। শুকিয়ে গিয়েছে।

—আশ্চর্য !

—আশ্চর্য কেন ? ফেলে দেব ?

—না। তা বলিনি।

কিছুক্ষণ নীরব। দুজনের মনে একই স্মৃতি।

—বিয়ের দিনের কথা মনে আছে ? ধারতি বলে।

—হুঁ।

—তীর ছুড়তে ছুড়তে তুমি এগিয়ে যাচ্ছিলে, আর সেই তীর কুড়িয়ে এনে আমি তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছিলাম। আমার মাথায় ছিল কলসী। এতদিনে সার্থক হল। বুড়ো দাদু দেখছে ওপর থেকে।

—আমাকে যুদ্ধে পাঠাতে এত সাধ তোমার সেকথা আগে তো বলনি ধারতি।

—সাধের কথা কখনো মুখ ফুটে বলতে হয় ?

—অনেক আগে আমি চলে যেতাম এমন জানলে।

—তখন তো যাবার প্রয়োজন হয় নি। বাঘরায় আর রান্‌কোর মত সর্দার থাকতে কেনই বা যাবে তুমি ?

—তবু যেতাম।

—পাগলই আছো এখনো।

ত্রিভন হাসে।

সুখনিদি। সুখে নিদ্রা যাবার আশ্বাস পেয়ে শ্যামসুন্দরপুর আর অম্বিকানগরের অধিবাসী ত্রিভনের পিতা হেমৎ সিংকে প্রতি বছরে কিছু টাকা তুলে দিত। সেই টাকা পেতেন বলেই খুব অভাবের সময়ও রাজ্য ছুটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন নি তিনি। তবে তিনিই আবার সুখনিদি কর বন্ধ করে দেন। বৈষ্ণব হয়ে এসবকে নোংরামি বলে মনে হয়েছিল তাঁর। তাঁর মৃত্যুর পর সর্দার সারিমুমু কথাটা তুলেছিল আবার। কিন্তু ত্রিভন চায় নি জিনিষটাকে চালু করতে। প্রতিবেশী রাজ্যের সংগে এমন একটা তিক্ত সম্পর্ক না থাকাই ভাল।

ভুল হয়েছিল ত্রিভনের। বুধকিস্কু ঠিকই বলেছে। ভাল ব্যবহারের দিন আর নেই। লোকে সেটাকে ভাবে দুর্বলতা। ভেবে তার সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা করে। এ পৃথিবী দাপটের। শক্তি যতটুকুই থাক। তার চেয়েও বেশী দেখাতে হবে দাপট। তবেই সমীহ করবে সবাই।

ঘোড়ার পিঠে সীমান্তের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে কথাগুলো ভাবছিল ত্রিভন। সংগের চোয়াড় বাহিনী নিঃশব্দে অনুসরণ করে তাকে।

বুধকিস্কুর দলও সংগে সংগে চলছিল। সর্দারের দিকে চেয়ে বিস্মিত হয় ত্রিভন। প্রৌঢ়ত্বের বিন্দুমাত্র ছাপও উপলব্ধি করা যায় না তার চলায়। নবীন এক যুবক যেন এগিয়ে চলেছে মহা উৎসাহ নিয়ে। কিতাগড়ে তার দিকে চাইলে এতটা নির্ভরশীল বলে কখনই মনে হতো না। ক্ষেত্র না পেয়ে শুকিয়ে যেতে বসেছিল এত বড় একটা শক্তি।

রান্‌কোর উপদলের সংগে দেখা হয়ে যায় সীমান্তের কাছাকাছি এসে। রাজাকে শত্রুদের গতিবিধি জানিয়ে দেয় তারা। আরও জানায় যে, সামান্য সংখ্যক সৈন্য নিয়ে রান্‌কো শত্রুদের সংগে খণ্ডযুদ্ধে ব্যাপৃত হয়েছে। প্রতিটি মুহূর্তে সে সাহায্য আশা করে। কারণ শত্রুরা যদি একবার জানতে পারে যে বিপক্ষে তাদের মুষ্টিমেয় চোয়াড়, তাহলে ঝড়ের মত এগিয়ে আসবে।

বুধকে আরও ডাইনে চলে যেতে বলে ত্রিভন। সেখান থেকে চুপে

চুপে পার হয়ে ঢুকতে হবে তুই রাজার রাজ্যে। বিদায় নেবার আগে রাজার সামনে নতজানু হয় বুধ। কষ্ট হয় ত্রিভনের। নাতির মুখ দেখার বড় সখ সর্দারের। পুত্রবধূ গর্ভবতী। যদি আর না ফেরে। ছেলে তার বাটালুকাতেই রয়েছে সারিমুর্মু'র দলে। বয়সে একেবারে কচি।

কিন্তু বুধ-এর মুখে কোনরকম বিষাদের চিহ্ন দেখা যায় না। সে হেসে বলে—সুখনিদির প্রথম কিস্তি নিয়ে ফিরব রাজা।

—সর্দার বুধকিস্‌কুর কাছে তা মোটেই অসম্ভব নয়।

—এতটা আশা আমার ওপর বরাবরই ছিল রাজা?

—না। মিথ্যে কথা বলে লাভ কি সর্দার। তোমাকে আজ প্রথম চিনলাম।

—আমার সৌভাগ্য। থুরথুরে বুড়ো হয়ে সুবর্ণরেখার ধারে মিলিয়ে গেলে নিজেকেই ঠকাতাম।

ত্রিভন একদৃষ্টে চেয়ে থাকে সর্দারের অভিজ্ঞ-কঠোর মুখের দিকে। বুধকে সব সর্দারের মধ্যে একটু সরল আর মোটা বুদ্ধির বলে ধারণা হত। তার মুখে এমন ভাবগম্ভীর কথা মোটেই প্রত্যাশা করেনি সে।

—তোমার কথা সত্যি।

—চলি রাজা।

—এসো সর্দার।

দলের চোয়াড়দের ইংগিত করে বুধকিস্‌কু ডান দিকে এগিয়ে যায়। ত্রিভনের দল জানে না বুধ কোথায় গেল তার লোকজনদের নিয়ে। সুখনিদির কথা গোপন রাখা হয়েছিল সাধারণ লোকের কাছে। বুধ তার দলের কাছে প্রকাশ করবে সীমান্ত পার হবার পর।

বুধ অদৃশ্য হবার আগে অবধি তার দিকে চেয়ে থাকার লোভ হয় ত্রিভনের। কিন্তু সময় নেই। রান্‌কো তার সাহায্য চায়। সে সামান্য লোক নিয়ে তুই রাজার বিরুদ্ধে লড়ছে। হয়তো সে বিপদে পড়েছে।

বিজলীর লাগামে ঝাঁকি দিয়ে বলে, চলরে বিজলী।

সেদিন গভীর রাতে রান্‌কোর সংগে দেখা করার সুযোগ মেলে

ত্রিভনের। রান্‌কোর চোখে মুখে নিদারুণ ক্লান্তি আর তুর্ভাবনার ছাপ। সে রাজাকে দেখে আনন্দিত হলেও সেটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পেল না।

প্রথম কথাই সে বলে,—কত চোয়াড় রয়েছে আপনার সংগে?

—কত দরকার তোমার?

—দেড়শো জন হলেই হবে, যদি তাদের ধনুক থাকে।

—আছে।

—থাক্। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে রান্‌কো।

—এত চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন তোমাকে সর্দার?

—অম্বিকানগরের রাজা তুটো বন্দুক এনেছেন সংগে। শুনলাম বরাহভূমরাজ দিয়েছেন তাঁকে? ভীষণ শব্দ হয়।

—সত্যি? ত্রিভনের কপাল কুঁচকে ওঠে।

—হ্যাঁ রাজা।

—তাতে কতজন মারা গেল?

—পাঁচ। আরও যেত। মনে হয় বন্দুক ছোঁড়ার হাত নেই ওদের। তার চেয়ে আমার তৈরী ধনুক অনেক ভাল। অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে অতবড় দল। ভয় পেয়েছে। ভেবেছে অনেক চোয়াড় লুকিয়ে রয়েছে বনের মধ্যে।

—শুনলাম সামনা সামনি লড়াই হয়েছে আজ?

—হ্যাঁ। শুধু একবার। তখনই আপনার কথা মনে হয়েছিল। কিন্তু ভুল করেছে ওরা। আমার পুরো দলটাকে দেখে ওরা মনে করেছিল ছিট্‌কে পড়া সামান্য কয়জন চোয়াড় আমরা। আমিও ওদের সেই ধারণা বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। অবহেলার ভাব দেখিয়েছিলাম। পাঁচজন চোয়াড় তখনি পড়ল বন্দুকের গুলিতে।

—সাদামুখদের সংগে বরাহভূমরাজের সাক্ষাৎ হয়েছে বলে মনে হয়।

—কেন রাজা?

—বন্দুকটা তারাই চালু করেছে।

—কামান?

—কামানও তাদের। তবে আগেও ছিল এদেশে। বরাহভূমরাজের রয়েছে তুটো।

—দেখেছি। যদি তাই নিয়ে আসেন তিনি।

—পাহাড় ভেঙে আসতে কামান ভাঙবে। যদিও বা এসে পৌছোয় গোলাগুলো শালগাছের গুঁড়িতে আটকে যাবে।

—এত সব কি করে জানলেন রাজা?

—বাবা বলেছেন। কামানের গল্প বাবাই করতেন। অনেক বার বরাহভূমে গিয়েছেন তিনি।

—যদি ইতিমধ্যে আরও কামান তৈরী করেন বরাহভূমরাজ? ছোট ছোট কামান নিয়ে আসায় অসুবিধা হবেনা।

—সে উপায় আর নেই সর্দার। কারিগরটি অনেক আগে মারা গিয়েছে। এসব কারিগর সহজে মেলেনা।

রান্‌কো ভাবে, রাজার ছেলে রাজা হলে কতকগুলো সুবিধে পাওয়া যায়—যা নিজের রাজ্যের পক্ষে মংগলজনক।

হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে একটা চিৎকার শোনা যায় কোন চোয়াড়ের। অল্প দূরেই রয়েছে লোকটি অথচ ঠাহর পাওয়া যায় না। ত্রিভন আর রান্‌কো সচকিত হয়। গোপনে শত্রুরা আক্রমণ করল নাকি? তাতো সম্ভব নয়। একটি মশালও জ্বালাবার হুকুম নেই। সমস্ত বনভূমি ঘুটঘুটে। শত্রুদের পক্ষে তাদের অবস্থিতি জানবার বিন্দুমাত্র উপায় নেই।

দুইজনে সাবধানে এগিয়ে চলে অন্ধকারে গা মিশিয়ে। চোয়াড়দের মধ্যে অধিকাংশই নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে শুকনো শালপাতা বিছিয়ে। রান্‌কো যাদের সামনে গেল ধাক্কা দিয়ে তুলে দিল, চমকে উঠে পাশের ধনুক আর তীর আঁকড়ে ধরে তারা।

—সর্দার। চিৎকার শোনা যায় একটু দূরে।

—কে? চাপা গলায় জবাব দেয় রান্‌কো।

—এইদিকে। বিজলী—

ত্রিভনের হৃদপিণ্ড লাফাতে থাকে। বিজলীর কথা সে একেবারে ভুলে গিয়েছিল। কোথায় যে তাকে রাখা হয়েছে তাও জানে না। একজন চোয়াড়ের জিম্মায় দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিল সে।

—কি হয়েছে বিজলীর। ত্রিভন উত্তেজিত হয়ে বলে।

সর্বনাশ রাজা। সাপ।

ছুটে যায় দুজনে বিজলীর কাছে। চারটে মশাল জ্বলে ওঠে চক্‌মকির আগুনে।

দৃশ্য দেখে পাথরের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে তারা। কিছু সময়ের জন্যে শরীরের সমস্ত শক্তি অন্তর্হিত হয়।

বিজলীর দুই চোখ ঠিক্‌রে বার হয়ে আসছে। তবু তার চেষ্টার বিরাম নেই। মুক্তির চেষ্টা।

—বিজলী। কোনরকমে উচ্চারণ করে ত্রিভন।

চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে বিজলীর। রাজার ডাক সে শুনেছে। কিন্তু প্রভুকে চেয়ে দেখবার মত শক্তি নেই তার। তবু বোধহয় নিশ্চিন্ত হয় সে। রাজা যখন এসেছে নিশ্চয়ই সে বাঁচবে। আবার ফিরে যাবে কিতাগড়ে। রাণী তাকে আদর করবে। রাজা লুকিয়ে লুকিয়ে রাণীকে সংগে নিয়ে তার পিঠে উঠে বসবে।

অজগরটা তার গলাকে আষ্টেপৃষ্ঠে পেঁচিয়ে ধরে ক্রমাগত চাপ দিয়ে চলেছে।

—সর্দার। রাজার কণ্ঠস্বর আর্তনাদের মত শোনায়।

—রাজা।

—ধনুকে কোন কাজ হবে না সর্দার। বিজলীর গায়ে লাগতে পারে। তোমার তলোয়ারটা দাও।

রান্‌কো কোমর থেকে সেটা নিয়ে রাজার হাতে দিতেই ত্রিভন বিদ্যুৎগতিতে ছুটে যায়। রান্‌কো দেখে অজগরটা মাথাকে সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে লক্‌লকে জিভ বার করছে। তার ঝিমিয়ে পড়া চোখ দুটোয় অপরিসীম হিংস্রতা।

—যাবেন না রাজা।

কিন্তু সেই মুহূর্তেই দেখে সে অজগরের মাথা দেহচ্যুত হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। তার প্রাণহীন দেহ চূড়ান্তভাবে বিজলীকে চাপ দিয়ে ধীরে ধীরে আলগা হয়ে আসছে। এতক্ষণ পর্যন্ত বিজলী নিজের পায়ের ওপরই দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সাপটা মরে যাবার পর সে মাটিতে আছড়ে পড়ে।

ত্রিভন তার মাথা দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে চোখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। সে চোখে কোন ভাষা নেই।

—কষ্ট হচ্ছে রে বিজলী !

বিজলী কোনরকম সাড়া দেয় না। তার শ্বাসও পড়ে না।

—সর্দার, এ তো নিশ্বাস নিচ্ছে না।

—আর নেবে না রাজা। ঘোড়া একবার মাটিতে পড়লে আর ওঠে না।

দৃষ্টি ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে আসে বিজলীর। চোখ দুটো কেমন যেন গাঢ় নীল হয়ে আসে। শেষে বারকয়েক হাত পা ছুঁড়ে নিশ্চল হয়ে যায় বিজলী সতেরখানির মাটির ওপর।

শিশুর মত কেঁদে ওঠে ত্রিভন।

পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নেয় সে। বিজলী তার যত প্রিয়ই হোক না কেন, সবার ওপরে সতেরখানি। বিজলীর জন্যে সে আর ধারতি কিতাগড়ে বসে পরে চোখের জল ফলবে—এই যুদ্ধক্ষেত্রে নয়। সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সর্দারের দিকে চেয়ে বাষ্পহীন কণ্ঠে সে বলে,—ভাল হল রান্‌কো। তোমাদের পাশে এসে দাঁড়ালাম। একই সংগে মাটিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করব আমি। এতদিন উঁচুতে থেকে নিজেকে নীচু করে রেখেছিলাম।

রান্‌কোর দৃষ্টিতে এই অসাধারণ সংযমী পুরুষটির প্রতি অন্তরের সমস্ত শ্রদ্ধা ঝরে পড়ে।

পরদিন ভোরবেলা বনের আড়াল থেকে ত্রিভন দেখে দুই রাজার সৈন্যসামন্ত রান্নাবান্নায় ব্যস্ত। খাওয়া দাওয়া শেষ করে নিশ্চিন্ত হয়ে তারা অভিযান চালাবে। হাসি পায় ত্রিভনের। নিজের চোয়াড়দের মুখের দিকে চায় সে। অনাহারের ছাপ সে মুখে। অথচ কতখানি দৃঢ়তা। দেশকে রক্ষা করার অদম্য স্পৃহা তাদের কষ্টসহিষ্ণু করে তুলেছে। ও-পক্ষের সৈন্যদের সে বালাই নেই। পরের রাজ্যে তারা ঢুকবে—মজা করবে। ঘর সংসারের চিন্তা নেই। বউ ছেলেদের অনেক পেছনে শান্তির রাজ্যে রেখে এসে নিশ্চিন্ত তারা। এদের দৃষ্টি শুধু সামনে। নতুন কিছু করার আনন্দে এরা মশগুল। পেট খালি থাকলে সে আনন্দ মাটি হয়ে যায়। তাই সাত সকালেই রান্নার আয়োজন।

ওদের শান্তির সংসারে এতক্ষণে বোধ হয় আগুন লেগেছে। হনুমানের লংকাকাণ্ড। খবর ওরা আজই পাবে। তখন কি করবে? ফিরে গিয়ে বুধকিসকুর দলকে জব্দ করতে পারবে না। এমনভাবে দলবদ্ধ থাকা আর সম্ভব হবে না তখন। নিজের নিজের ঘরের দুর্ভাবনায় ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে এই দল। হয়ত হাতিয়ার ফেলে রেখেই পাগলের মত ছুটবে। বুধ-এর গায়ে আঁচড়ও পড়বে না।

রানকোকে কাছে ডাকে ত্রিভন।

—ধনুক ছুঁড়তে হবে সর্দার। আমাদের লোক শুকিয়ে থাকবে আর ওরা ভর-পেটে যুদ্ধ করবে—আমি ঠিক সহ্য করতে পারছি না। তাছাড়া এটাই সুযোগ।

—সবাই প্রস্তুত রাজা।

—দুই রাজা কোথায় আছেন?

—পেছনের তাঁবুতে।

—ওরা এত অসাবধান কেন? পাহারার জন্যেও কোন দলকে রাখেনি।

—আমাদের বোধ হয় অবহেলা করছে। বরাভূম ওদের পেছনে।

—তাঁবু তো একটা দেখছি। দুই রাজাই কি ওতে আছেন?

—সেটাই সম্ভব।

—আমি শুধু ওখানে তীর ছুঁড়ব। এগোতে বল। কোনরকম শব্দ না হয়।

এগিয়ে চলে চোয়াড়ের দল—অজগর সাপ যেভাবে এগোয়। খুব ধীরে ধীরে। শব্দ করে না কেউ। কাসি পেলে একমুঠো গাছের পাতা ছিঁড়ে মুখের ওপর চেপে ধরে। বিছুটিতে সারা শরীর ফুলে ওঠে, তবু কোন চাঞ্চল্য নেই।

ধনুকের নাগালের মধ্যে এসে থামতে নির্দেশ দেয় ত্রিভন। তার হুকুমে প্রতিটি চোয়াড়ের ধনুক থেকে একটি করে তীর নির্গত হয়। নাগা সন্ন্যাসীদের কথা মনে পড়ে যায় ত্রিভনের। ঠিক সেই একই অবস্থা। এ ছাড়া অন্য কোন পথও নেই। কামান রাখার মত ক্ষমতা সতেরখানির কোনদিনও হবে না।

নিক্ষিপ্ত তীর সোজা গিয়ে বুকে লাগে যাদের তারা অবাক হবার

অবকাশ পায় না। কিন্তু আহতেরা মুহূর্তের জন্যে যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে হাঁ করে চেয়ে থাকে। আশেপাশের এক গাদা মৃত্যুপথযাত্রীর আর্তনাদ শুনেও তাদের খেয়াল হয় না যে পেছু হটতে হবে। তাই দ্বিতীয় ঝাঁকের তীরে তাদের মধ্যে কিছু কিছু মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে।

ত্রিভনের লক্ষ্য রাজাদের তাঁবু। কিন্তু কেউ-ই বার হয় না সেখান থেকে। নিষ্ফলতা পীড়া দেয় তাকে। রান্‌কোর চোখে চোখ পড়তে ম্লান হাসে সে।

শত্রুসৈন্যেরা রাজার শিবিরের সামনে গিয়ে ভীড় করার চেষ্টা করে। কিন্তু সেখানেও তীর ধাওয়া করায় আরও পেছনে গিয়ে মাটির ওপর শুয়ে পড়ে তারা।

চোয়াড়ের দল হেসে ওঠে নিঃশব্দে।

—চল সর্দার, পরিষ্কার করে দিয়ে আসি। হাসতে হাসতে বলে বৃদ্ধ এক চোয়াড়।

—চুপ। নিজের কাজ কর। ধমক দেয় রান্‌কো।

বৃদ্ধের মুখ ম্লান হয়। অনুতপ্ত রান্‌কো তার পিঠের ওপর হাত রেখে বলে,—সামনে গেলে তোমরাই পরিষ্কার হয়ে যাবে ভাই। ওদের জুটো বন্দুক আছে।

—সেটা আবার কি?

রান্‌কো বুঝিয়ে বলে। আগের দিনের ঘটনার কথাও জানিয়ে দেয় সেই সংগে।

—কোথায় সে জিনিষ?

—বোধ হয় রাজাদের কাছে। তাছাড়া পেছনে ওদের আর একটা দল রয়েছে। এগিয়ে গেলে পেছনের দল হাতিয়ার নিয়ে ছুটে আসবে। তখন? সংখ্যায় ওরা অনেক বেশী।

—ভুল হয়েছিল সর্দার।

ত্রিভন অবাক হয়ে রাজাদের কথা ভাবে। শিবিরের বাইরে তাদের আসতে দেখা গেল না একবারও। ভয় পেয়েছে নাকি? তীরের ভয়?

ভয়টা অমূলক নয়। তৈরী হয়েই ছিল ত্রিভন। তাঁবুর বাইরে একবার এলে ফিরে যেতে হবে না। তবু নিজের দলের দুর্গতি দেখেও বাইরে আসার প্রয়োজন বোধ করল না? এ আবার কেমন রাজা? এদের বাপরাও বোধ হয় এমন ছিল। তাই দিনের পর দিন প্রজারা সুখনিদির কড়ি গুনে এল অথচ সতেরখানির দিকে তেড়ে আসার মত বুকের পাটা হয়নি রাজাদের।

রান্‌কোর দিকে দৃষ্টি ফেলে ত্রিভন। চোয়াড়দের দিকেও তাকায়। তারাও বোধহয় একই কথা ভাবছে। সংকোচে মুখ লাল হয়ে ওঠে তার। সে নিজেও যে রাজা।

—আপনিও তো আমাদের রাজা। রান্‌কো বলে ওঠে।

ত্রিভন চমকায়।

—কত তফাৎ। তাই আমাদের চোয়াড়দের সংগে ওদের লোকের এত তফাৎ। রান্‌কো দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

জবাব দেয় না ত্রিভন।

শত্রুদের পেছনের দলের কাছে সংবাদ পৌঁছেচে। দূর থেকেও একটা আলোড়ন অনুভব করা যায়। প্রস্তুতির আলোড়ন। এগিয়ে আসবে এবারে।

—কি করবেন রাজা?

—দেখব।

—তীর ছুঁড়ে ফল হবে?

—না। কেউ যেন একটা তীরও না ছোঁড়ে।

চোয়াড়েরা রাজার আদেশে গা-ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

রান্‌কো বুঝতে পারে না তাদের পরবর্তী কার্যক্রম। প্রশ্ন করতে সাহস পায় না রাজাকে। গভীর চিন্তার ছাপ রাজার মুখে। সে শুধু পেছনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে।

সে দেখতে পায়। পেছনের দল এগিয়ে আসছে—এগিয়ে আসছে শ্যামসুন্দরপুর আর অম্বিকানগরের রাজার তাঁবুর দিকে। অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে।

—রাজা।

—ধৈর্য হারিও না সর্দার। আরও একটু দেখো।

—ওরা এগিয়ে এলে রাজারা বন্দুক ব্যবহারের সুযোগ পাবেন।

—জানি।

—এ পক্ষ থেকে তখন সাড়া না পেলে আরও এগিয়ে আসবে।

—জানি।

—তখন ? পালিয়ে যাব আমরা ? সতেরখানির চোয়াড়রা ?

—না। পেছু হটে যাবে। সম্মুখ যুদ্ধ যেখানে সম্ভব নয়, সেখানে পিছিয়ে যাওয়াকে কাপুরুষতা বলে না।

—কিন্তু কতদূর ? কিতাগড় পর্যন্ত ?

—না। বেশীদূর নয়। হয়ত এখন্ যেখানে দাঁড়িয়ে আছ, এখান থেকেই দেখবে অত বড় দল পাগলের মত ছুটে চলেছে নিজের রাজ্যের দিকে।

—সে কি করে সম্ভব ?

—হাঁ সর্দার। বিজলী আমাকে ছেড়ে গেল বলে তোমাকে সেকথা বলার অবসর পাই নি। তুমি কি জান, বুধকিস্কু এসেছে আমার সংগে ?

—কোথায় ? না !

—সুখনিদি আদায় করতে গিয়েছে। অনেকদিন আরামে ঘুমিয়েছে অম্বিকানগর আর শ্যামসুন্দরপুরের লোকেরা। এবারে পাওনা দিক।

কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে রানকো। মস্তিষ্ক তার দ্রুত কাজ করে চলে। তার পরই আনন্দে চিৎকার করে ওঠে—রাজা। সত্যিই রাজা। আমার রাজা।

—এ কি সর্দার।

—রাজা।

শান্ত সমুদ্র যেন উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। হাওয়া-ছকের মত মুহূর্তে তা ছড়িয়ে পড়ে প্রতিটি চোয়াড়ের মনে প্রাণে দেহে।

বৃদ্ধ চোয়াড়টি মাথার চুল ছেঁড়ে। বোকা—আকাট বোকা সে। নইলে, রাজার সংগে এসে, কিস্কু সর্দারকে চলে যেতে দেখেও কেন সে বুঝল না ? রাজার এই কৌশল অন্ততঃ তার ধরে ফেলা উচিত ছিল। বৃথাই বৃদ্ধ করেছে বুঝার সিংএর আমল থেকে। বৃথাই তার চুলগুলো দেখতে শণের মত হয়েছে। অন্য চোয়াড়দের কাছে মুখ দেখাবার উপায় রইল না।

গুড়ুম্—গুড়ুম্—

ঢলে পড়ে বৃদ্ধ চোয়াড়। এলোপাথাড়ি গুলির একটি এসে সোজা তার বুকে বেঁধে। অসাবধান ছিল সে। শত্রুদের পেছনের দল কখন যে রাজাদের তাঁবুর সামনে পৌঁছেচে, কখন যে রাজারা নিজেদের নিরাপদ ভেবে সাহসী বীরের মত তাঁবু থেকে বার হয়ে আন্দাজে গুলি ছুঁড়লেন—দেখেনি সে। কারও কাছে আর মুখ দেখাতে হলনা তার। মরে বেঁচে গেল, যুঝারসিংএর আমলের বহু যুদ্ধের যোদ্ধা। ঠোঁট দুটো তার বারকয়েক থর থর করে কেঁপে থেমে যায়।

ত্রিভন আড় চোখে, একবার চেয়ে দেখে। শান্তির কোলে আশ্রয় নিয়েছে চোয়াড়। সবাইকেই হয়ত এভাবে যেতে হবে। আজ না হোক দুদিন পরে।

—রাজা।

—বল সর্দার।

—ওকে চেনেন ?

—না।

—ওর ছেলে নাগাদের সংগে যুদ্ধে মারা গিয়েছিল। ওর নাতি বেঁচে থাকল শুধু।

ত্রিভন আর একবার চায় মৃতের মুখের দিকে। খানিকটা রক্ত বার হয়ে এসেছে ঠোঁটের দুপাশ বেয়ে।

—নাতিটা যুদ্ধে আসেনি তো ?

—না। কোনদিনই পারবে না যুদ্ধ করতে। খোঁড়া—জন্ম থেকেই, আর বোবা।

—আর কেউ নেই ?

—না।

গুড়ুম্ গুড়ুম্—

ত্রিভন হেসে ওঠে। রান্‌কো অর্থ বোঝে না সে হাসির।

—রাজাদের কাণ্ড দেখেছ সর্দার। এক জায়গায় দাঁড়াচ্ছে না। পাছে তীর গিয়ে লক্ষ্যভেদ করে।

—বন্দুক ছোঁড়ার সময় একবার চেষ্টা করুন না রাজা।

—মাথা দুটো আড়ালে থেকে যাচ্ছে। বুকও। সামান্য আহত করে লাভ কি ?

সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়। এক পাও এগিয়ে এল না। শত্রুরা। রাজারা ভরসা পায় না। যাদের তীরের আঘাতে এতগুলো লোক ধরাশায়ী হল তারা হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে না। নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে—অপেক্ষা করছে অতি নিকটে আরও মারাত্মক রকমের আঘাত হানার জন্যে। সামনের বনটা দিনের আলোতেও রাজাদের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করছে।

হঠাৎ তাদের মধ্যে একটা ত্রস্ত ভাব দেখা যায়। উত্তেজিত হয়ে ছুটোছুটি সুরু করে তারা। পেছনের আর একদল সৈন্য তাঁবুর সামনে এগিয়ে আসে। হাত পা নেড়ে চিৎকার করে কি সব বলতে সুরু করে। ভীড়ের মধ্যে দুই রাজা আর তাদের বন্দুককে দেখতে পাওয়া যায় না।

—খবর এসে পৌঁছেচে। ঠোঁট কামড়ায় ত্রিভন।

—হাঁ রাজা। রান্‌কোর চোখদুটো উজ্জ্বল।

—ধনুক নিয়ে তৈরী থাকতে বল সবাইকে। হুকুম পাবার সংগে সংগে প্রত্যেকে যেন কম করে চারটে তীর ছুঁড়তে পারে।

চোয়াড়ের দল প্রস্তুত হয়।

বৃদ্ধ চোয়াড়ের মৃতদেহ তখনো নরম। রান্‌কো তার ধনুক তূণ নিয়ে নিজের পাশে রাখে।

—শত্রুদের পরিষ্কার করার সাধ ছিল এর। দেখে যেতে পারল না মৃতের মাথা স্পর্শ করে আস্তে আস্তে উচ্চারণ করে রান্‌কো।

রাজাদের তাঁবুর খুঁটি টেনে উপ্‌ড়ে ফেলা হয়। সৈন্যরা তাদের জিনিষপত্তর পিঠে বেঁধে নেয়। ঠিক সেই সময়ে চার ঝাঁক তীর গিয়ে বেশ কিছুসংখ্যক লোককে মাটিতে ফেলে দেয়।

আর্তনাদ ওঠে শত্রুদের মধ্যে। কান্নার আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়। আহতদের কান্না। যারা মরেছে, তাদের বলার কিছুই নেই, কিন্তু আহতেরা ফিরে যেতে চায় নিজের দেশে—স্ত্রীপুত্রের কাছে। সুখনিদি দিতে না পেরে তারা হয়ত অপরিসীম অত্যাচার সহ্য করছে।

বিস্মিত চোয়াড়রা দেখে, আহতরা পড়েই রইল। কেউ তাদের তুলে নিয়ে

গেল না। দুই রাজা যে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত সেখানে এই অমানুষিক অবিবেচনা ঘটতে দেখে তারা চমকে ওঠে।

শত্রুরা দৃষ্টির আড়ালে চলে যায় ধীরে ধীরে। আহতেরা হাত পা ছুঁড়ে কাঁদে।

—চল রান্‌কো, দেখে আসি ওদের। যদি কিছু সাহায্য করতে পারি।

—বৃদ্ধের মৃতদেহটা ?

—হ্যাঁ, গাঁয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর এখুনি।

রান্‌কোর আদেশে পাঁচজন বলিষ্ঠ চোয়াড় সামনে এগিয়ে আসে। বৃদ্ধকে তারা চেনে। বিষণ্ণ-মুখে একটি শিশু শালগাছ কেটে নিয়ে বৃদ্ধের মৃতদেহ সযত্নে তার সংগে বেঁধে ফেলে। শালপাতা হাতে নিয়ে তার বুক আর মুখের শুকিয়ে যাওয়া রক্তটুকু মুছে নেয়। চোয়াড়ের দল স্তব্ধ হয়ে চেয়ে দেখে। চোখ তাদের চিক্‌চিক্ করে ওঠে।

—বিজলী ? রান্‌কো প্রশ্ন করে।

—ও এখানেই থাকবে সর্দার। এখানেই ওর সমাধি। যদি কোনদিন সুসময় আসে—পাথর খোদাই করে অমর করে রেখে যাব ওকে। আর যদি সে সুযোগ না পাই, তবে বিস্মৃতির মধ্যে ডুবে যাবে ওর নাম, ওর মৃত্যুস্থান—এমনকি সতেরখানির এতদিনের ইতিহাস।

ধারবতি দু-চোখ ভরা বিস্ময় নিয়ে রাজার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। দুই রাজা যেখানে রাজ্য আক্রমণ করেছে, সেখানে এত তাড়াতাড়ি যুদ্ধ শেষ হওয়া সম্ভব নয়। একটি অমংগলের আশঙ্কায় তার বুকের ভেতর কাঁপতে থাকে।

কিতাগড়ের ওপর থেকে সে চোয়াড়দের সংগে ফিরতে দেখেছে রাজাকে। পায়ে হেঁটে আসছিল রাজা। বিজলী কোথায় ? শত্রুদের বল্লমের খোঁচা বোধ হয় সহ্য করতে পারেনি এই বয়সে। কিন্তু রাজার গায়ে তো কোন আঘাতের চিহ্ন নেই ? ঘোড়াকে মেরে ফেলে, রাজাকে ছেড়ে দিতে পারে না তারা। তবে কি পালিয়ে এল সতেরখানির রাজা ত্রিভন সিং ভুঁইয়া ? চোখ তুলে সোজা দৃষ্টি ফেলে রাজার ওপর। সে মুখে তখনো কোন কথা নেই। শুধু একটা ম্লান হাসি লেগে রয়েছে।

—বিজলী কোথায় ?

—সে নেই। রেখে এলাম। ত্রিভনের চোখ ছল্‌ছল্ করে ওঠে।

—আর তুমি পালিয়ে এলে? চিৎকার করে ওঠে ধারতি।

—ধারতি!

রাজার আর্তনাদে স্তব্ধ হয় রাণী। দেখতে পায় এক অপরিসীম যন্ত্রণায় রাজার মুখ বিকৃত। সে টলছে।

—কি হল তোমার? অমন করছ কেন?

কথা বলতে পারে না ত্রিভন। শুধু ইসারায় জানায়, কিছুই হয় নি তার। ধারতি বিশ্বাস করে না। দুই হাতে জড়িয়ে ধরে ত্রিভনকে।

অনেকক্ষণ চলে যায়। জীবনের সব চাইতে বড় আঘাতকে সামলে নেয় ত্রিভন। ধারতি তাকে কাপুরুষ ভাবে, তাকে অবিশ্বাস করে। এর চাইতে বড় আঘাত আর কি হতে পারে পৃথিবীতে।

—আমি অন্যায় করেছি রাজা। ক্ষমা কর।

—ক্ষমার কথা ওঠে না রাণী।

—আমার মাথার ঠিক নেই। কেমন যেন হয়ে গিয়েছি।

—খুবই স্বাভাবিক। তাছাড়া অতযত্নে যুদ্ধের বেশে সাজিয়ে দিলে—দুদিনের মধ্যে ফিরে আসব বলে নয়। আমি রাণী হলে আমারও মাথার ঠিক থাকত না।

—তুমি অমন ভাবে বলছ কেন?

—লিপুর, এতদিন পরে তুমি আমাকে এইটুকু চিনলে?

চোখের জলের বাঁধ ভাঙে লিপুরের। রাজা চেয়ে থাকে শুধু। কোথায় যেন একটা বিরাট ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে—সে ফাটলকে আগের মত করে তোলা খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার।

ধারতি একসময় ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। রাজার সামনে এসে তাকে প্রণাম করে বলে—বিদায় দাও বাঁশীঅলা।

—কোথায় যাবে?

আঙুল তুলে ওপর দিকে দেখিয়ে দেয় ধারতি।

—আত্মহত্যা করবে তুমি?

—অন্য পথ আছে?

—আমি তো ক্ষমা করেছি তোমাকে।

—ক্ষমা পেয়ে বেঁচে থাকা যায় না। যতদিন ক্ষমার প্রশ্ন ওঠে না ততদিনই শুধু বাঁচা যায়।

—শোন ধারতি, তুমি শুধু লিপুর নও, তুমি রাণীও। তাই একটা অবিশ্বাস

মুহূর্তের জন্যে হলেও তোমার মনে স্থান পেয়েছিল। সেটা সত্যি নয়, শুধু একটা দুঃস্বপ্নের মত। কালই এর প্রভাব হয়ত থাকবে না।

—থাকবে রাজা। যতদিন বাঁচব, ততদিন থাকবে।

—ভুল রাণী। কাঁটারাঙ্গার যে মেয়েটিকে আমি সমস্ত প্রাণ ঢেলে ভালবাসি তার মন নিয়ে জিনিষটা ভাবতে চেষ্টা কর। তোমার ভুল বুঝতে পারবে। রাণীর মন নিয়ে ভেবোনা।

—সে ভাবে না ভেবে তো পারছি না।

—তাই বা ভাবছ কই? তুমি জান, সময় ঘনিয়ে আসছে। অজগরের চাপে বিজলীর অপমৃত্যুই তার ইংগিত দিচ্ছে। অম্বিকানগর আর শ্যামসুন্দরপুরের রাজারা দেশে ফিরে গেলেও, দুদিন পরে সব রাজা একসাথে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে তা তুমি জান। তখন? আমি তো আর ফিরব না। লালসিং-এর দায়িত্ব কে নেবে?

রাণীর চোখ ছাপিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। ত্রিভনের কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে ভাঙা ভাঙা স্বরে বলে—ভুলে যাও বাঁশীওলা। কাঁটারাঙ্গার পাথরের ওপর বসে এমন কত অন্যায়ই তো করেছি। কই, আঘাত তো পাওনি কখনো। সতেরখানির রাণী আমি, কিন্তু তোমার তো লিপুরই।

ত্রিভনের মনে হয় ফাটলটা এর মধ্যেই অনেকখানি জুড়ে গেল। রাণীকে বুকের কাছে টেনে নেয় সে।

সীমান্ত ছেড়ে রান্‌কো একদিন কিতাগড়ে ফিরে আসে। ত্রিভন বিস্মিত হয়। সর্দারহীন চোয়াড়দের একা ছেড়ে আসার মত কি কারণ ঘটল? রান্‌কোর মুখের দিকে চেয়ে কোন বিপদের আভাস পাওয়া যায় না। বরং প্রফুল্লই মনে হয় তাকে।

সারিমুর্মু একা এসে বসে এখন কিতাগড়ে। সব সময়ই বিষণ্ণ সে। নিজের ওপর বিরক্ত। এই বিরক্ত-ভাব বুধকিস্‌কু চলে যাবার পর থেকে বিতৃষ্ণায় পরিণত হয়েছে। রোজই রাজাকে সে একবার করে অনুরোধ করে কোন একটা কাজ দেবার জন্যে। রাজা প্রতিবারই বলেছে তাকে যে তার কাজ একেবারে শেষ সময়ে—কিতাগড় রক্ষার ভার। এ-কথায় সন্তুষ্ট হয়নি সারিমুর্মু। তার ধারণা রাজা তার ওপর নির্ভর করতে পারেনা বলেই ওভাবে ভুলিয়ে রাখছে।

রান্‌কোকে দেখে সারিমুর্মু আনন্দ চেপে রাখতে পারে না। ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরে বলে—সর্দার।

—সর্দার। জবাব দেয় রান্‌কো।

—আমি সর্দার নই। আমি ফালতু। মুর্মু সর্দারের চোখ ছলছল করে ওঠে।

—তুমিই সর্দার। কিতাগড়ের আসল সর্দার।

একটু সন্তুষ্ট হয় যেন সারিমুর্মু। রান্‌কোর চোখে বা কথায় কৃত্রিমতার চিহ্ন নেই। সে আবেগের সংগেই কথাগুলো বলে।

—হাতে ওটা কি? সারিমুর্মু প্রশ্ন করে রান্‌কোর হাতের থলির দিকে চেয়ে।

—এই জন্যেই তো আসতে হল। রান্‌কো রাজার সামনে এগিয়ে গিয়ে সন্তর্পণে থলিটা নামায়। শব্দ হয়।

—টাকা? ত্রিভন প্রশ্ন করে।

—হাঁ রাজা।

—কোথায় পেলে?

—সুখনিদি।

—তার মানে? ত্রিভন আর সারিমুর্মু একসাথে চমকে ওঠে। বুধকিস্‌কু কি তবে মৃত?

—সর্দার বুধকিস্‌কুর কোন বিপদ হয় নি রাজা!

—সে কোথায়?

—সীমান্তে।

—তাকে রেখে তুমি চলে এলে?

—কিছুতেই এলো না। হাতে পায়েও ধরেছি। বলল, নাঃ, এখানেই থাকব। যদি ভাগ্যে থাকে এখানেই মরব।

—হঠাৎ এ পরিবর্তন কেন?

—মনে হয় অম্বিকানগর আর শ্যামসুন্দরপুরের প্রতি ঘরে বাঘরায় সোরেণের নাম শুনেছে। আমরা কিছুই খবর রাখিনা রাজা, কিন্তু বাঘরায় সোরেণ ও-সব অঞ্চলে বিখ্যাত।

সারিমুর্মুর বুক দুলে ওঠে। কেন যেন তার চোখ ঝাপসা হয়। ছুটকীর কথা মনে পড়ে। হতভাগী—সত্যিই হতভাগী।

সুখনিদির টাকা গুণে দেখার সময় কিছুক্ষণের জন্যে বিমর্ষতা ত্রিভনের মনকে আচ্ছন্ন করে। কত অত্যাচার সয়েই না টাকাগুলো দিতে হয়েছিল সাধারণ লোকদের। কিন্তু উপায় কি? সতেরখানির লোকেরাও আনন্দে

নেই। অনেক দুঃখ, অনেক যন্ত্রণা তারা সহ্য করছে দিনের পর দিন। তাদের জন্যেই এই সুখনিদির একান্ত প্রয়োজন। দীর্ঘদিন ধরে কত পুরুষ বাইরে রয়েছে, তাদের পরিবারের ভার রাজাকেই নিতে হবে।

—বুধসর্দারের সব লোক ফিরেছে ?

—দুজন ফেরেনি। বড় বেশী লোভে পড়েছিল তারা।

—হুঁ। অস্বাভাবিক নয়। মানুষ তারা।

কিতাগড় থেকে বিদায় নিয়ে রান্‌কো নিজের কুটিরের দিকে রওনা হয় অনেকদিন অযত্নে পড়ে রয়েছে সর্দার পারাউ মুমুর্ বাস্তুভিটে। যে কয়দিন বাটালুকায় থাকবে সংস্কার করবে সে। কিন্তু আবার তো যেতে হবে। শিগ্‌গিরই ডাক আসবে। সুখনিদির খবর বরাহভূমে পৌছতে বেশী দেরি লাগবে না। এবারে তরফের সবাইকেই হাতিয়ার ধরতে হবে। সালহাই হাঁসদাও বোধ হয় বাদ পড়বে না !

রান্‌কো একসময়ে দেখে নিজের অজান্তে সালহাই হাঁসদার বাড়ীর কাছাকাছি এসে পড়েছে সে। ঝাঁপনীর চিন্তা অবচেতন মনে কাজ করে চলেছিল একথা আগে বোঝেনি। কিন্তু বাড়ীর ভেতরে গিয়ে তো ঢুকতে পারে না। ঝাঁপনী বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে এমন আশা করাও বৃথা।

কয়েকটি ছেলেমেয়ে খেলা করছিল শূয়োরের পালের পাশে। ঝাঁপনীর ছেলে মেয়ে। কতগুলো হয়েছে কে জানে। বোধ হয় প্রতি বছরই হ'য়েছে। কত বছর বিয়ে হ'য়েছে যেন? ত্রিভন সিং যতদিন রাজা হয়েছেন। কিতাডুংরিতে ঝাঁপনী আর তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণই রাজার জীবনের প্রথম বিচার।

ছেলেমেয়েগুলোর একটা হঠাৎ চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। সংগে সংগে বাড়ীর ভেতর থেকে সালহাইএর হুংকার শোনা যায়। বাচ্চাটা তবু কেঁদে চলে। রান্‌কো তাড়াতাড়ি পা চালিফে দেয়। এবারে সালহাই আসবে নিশ্চয়, এসে বাচ্চাগুলোকে ঠেঙাতে সুরু করবে।

কিন্তু না, সালহাই নয়। পেছন ফিরে রান্‌কো চেয়ে দেখে ঝাঁপনীই এসেছে, কাঁদুনে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিয়েছে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে রান্‌কো। ঝাঁপনী দেখুক তাকে। কিন্তু তাকায় না ঝাঁপনী। বাচ্চাটির চোখ মুছিয়ে দিতে ব্যস্ত। ধমক দেয় অন্যগুলোকে। শেষে বাড়ীর ভেতরে চলে যায়।

দীর্ঘশ্বাস বার হয় রান্‌কোর বুক ভেঙে। চলতে শুরু করে সে। অনেকটা পথ ঘুরে যেতে হবে তাকে।

নিজের কুটিরের সামনে এসে অবাক হয় রন্‌কো। এমন সুন্দরভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রেখেছে কে? রাজা কি অন্য কাউকে ব্যবহার করতে দিয়েছেন তার অনুপস্থিতে! তাহলে তো তিনি জানিয়ে দিতেন খবরটা। তবে বোধহয় শুকোলরা দেখাশোনা করে। শত হ'লেও পারাউ সর্দারের ভিটে—সতেরখানির তীর্থস্থান। তার ওপর আবার রাণীর জন্মস্থান এটা।

উঠোনে এসে দাঁড়ায় রান্‌কো। ঝক্‌ঝক্‌ করছে সমস্ত উঠোন—দাওয়া—দেয়াল। কালই যেন গোবর দিয়ে লেপে রেখে গিয়েছে। মনে মনে লজ্জিত হয় রান্‌কো। সে এখানে থেকেও এমন নিখুঁতভাবে রাখতে পারে না। না থাকাই ভাল তার। পারাউমুর্মুর স্মৃতিটুকু দীর্ঘদিন স্থায়ী হবে।

দাওয়ার ওপর উঠে শুয়ে পড়ে রান্‌কো। বড় ক্লান্ত। সীমান্তের দিবারাত্রির সজাগ প্রহরী ছিল সে অন্য চোয়াড়দের পালা করে বিশ্রামের সুযোগ দিলেও, নিজের জন্যে সে বিশ্রামের অবসর খুব কমই খুঁজে পেয়েছে। অতবড় দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে অবসর পাওয়া সম্ভব নয়।

ঘুমিয়ে পড়ে রান্‌কো। ঝাঁপনীর কথা ভাববারও অবসর দেয় না মস্তিষ্ক।

সে ওঠে বেলা গড়িয়ে গেলে। হয়ত আরও ঘুমোতো—রাত্রি এসে ভোরও হয়ে যেতে পারত। কিন্তু প্রচণ্ড তৃষ্ণায় ঘুম যায় ভেঙে। গলা শুকিয়ে উঠেছে।

কলসি নিয়ে এখন ঝর্ণায় যেতে হবে। একথা মনে করতেই অবসাদ অনুভব করে আবার। খাবারেরও ব্যবস্থা করতে হবে একটা কিছু। খাবার না হলে তবু রাত কাটাতে পারবে। কিন্তু জল তার চাই—ই।

দাওয়ার একপাশে মাটি দিয়ে তৈরী উঁচু জায়গাটায় কলসি রয়েছে। ওখানেই থাকে বরাবর। পারাউমুর্মুর আমল থেকে। সে কাছে গিয়ে হাত দিয়ে দেখে, কানায় কানায় ভর্তি কলসি। অবাক হয় একটু। ভেবে পায় না এইরকম জল-ভরে রেখে গিয়েছিল কি না। নিশ্চই তাই। শুকোলরা বাড়ী পরিষ্কার রাখতে পারে, কিন্তু কলসিতে জল তুলে রেখে দেবে না। এতদিনের জল খাওয়া যায় না ভেবে, সে দুহাত দিয়ে তুলে দাওয়ার ওপর নিয়ে আসে কলসিটাকে। উপুড় করে জলটুকু ফেলে দিতে গিয়ে বাধা পায়।

ঝাঁপনী দাঁড়িয়ে রয়েছে উঠোনের মাঝখানে—পাথরের মূর্তির মত।

—ঝাঁপনী!

—তুমি!

কলসি ছেড়ে রান্‌কো দুহাত বাড়িয়ে দেয়। ছুটে এসে ঝাঁপনী আছড়ে পড়ে তার বুকের ওপর।

—জানতে না? অনেক্ষণ পরে রান্‌কো প্রশ্ন করে।

—না।

—তবে কেন এলে।

—আসি তো।

—রোজ?

—প্রায়ই। জল ফেলছ কেন? কালই ভরে রেখে গিয়েছি।

অবাক হয় রান্‌কো। ঝাঁপনীর মুখখানাকে তুলে ধরে চেয়ে থাকে তার চোখের দিকে। চোখ বন্ধ করে ঝাঁপনী।

রান্‌কো অনুভব করে অনেক রোগা হয়ে গিয়েছে ঝাঁপনী। কিতাড়ুংরির নাচের সময়ের কথা ছেড়ে দিলেও, ধলভূম থেকে ফিরে আমার পরেও অদম্য-স্বাস্থ্যের বেয়াড়াপনা অনুভব করত ঝাঁপনীকে জড়িয়ে ধরলে। সে স্বাস্থ্য আর নেই। তার দুহাতের মধ্যে কেমন যেন গলে পড়েছে। শরীরের মাংস ঢিলে। চাপ দিলে হাড়ে ব্যথা লাগবে।

চাপ দেয় না রান্‌কো। আলগোছে ধরে রাখে। ছেড়ে দিলে পড়ে যাবে ঝাঁপনী। মনে হয় ঘুমোচ্ছে। দিনে রাতে বাচ্চাগুলোর আর সালহাই এর জন্যে বিশ্রাম পায় না। চোখের কোলের গভীর কালো রেখাই তার প্রমাণ, নাকের পাশ দিয়ে হাসির ভাজটা কেমন যেন কান্নার ভাজের মত দেখায়। নিজের গালের সংগে তার গালটা চেপে ধরে রান্‌কো।

—আর পারি না। ঝাঁপনীর চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

সান্ত্বনা দিতে পারে না রান্‌কো।

—রাজা এমন বিচার কেন করলেন।

—আমরা মানুষ বলে।

—এবার থেকে ফিরে এসে আমাকে খবর দিও। রোজ রোজ আসতে পারি না। শুকোলরা দেখেছে।

সন্ধ্যা হয়। কাঁটারাঙ্গার ফেউ ডেকে ওঠে। ঝাঁপনীর হাত ধরে রান্‌কো পথে নামে। নিরাপদে পৌঁছে দিতে হবে তাকে।

—কাঠ নেওয়া হল না। বকবে ও।

—বলবে, বেঁধে রেখে এসেছ। ভারী বলে আনতে পারনি।

—ও যদি নিজে আনতে চায় কালকে?

—তবে বলো, পেটে ব্যথা বলে আনতে পারনি আজ।

ঝাঁপনী হাসে। রান্‌কোও হাসে।

—আজ আমাকে দেখতেই পেলে না। রান্‌কো বলে।

—কখন?

—ঘরে ফেরার আগে তোমার বাড়ীর দিকে গিয়েছিলাম।

—সত্যি? আমি কি করছিরাম!

—বাচ্চাটার কান্না থামাচ্ছিলে।

ঝাঁপনী লজ্জা পায়। ধীরে ধীরে বলে,—তুমি তোমার ঝাঁপনীকে দেখোনি তখন। সালহাই হাঁসদার বউকে দেখেছিলে।

রান্‌কোর বুকে সূচ বেঁধে।

রান্‌কোর বিশ্রামলাভের সুযোগ মিলল না বেশীদিন। ত্রিভনেরও নয়। সমস্ত সতেরখানি তরফের প্রতিটি চোয়াড়ের বিশ্রামের সুযোগ নষ্ট হল। চোয়াড় ছাড়াও সাধারণ পুরুষদেরও ঢাউরা শুনে এসে দাঁড়াতে হল কিতাগড়ের সামনের মাঠে।

একটি মাত্র দুসংবাদের জন্যে এতখানি ওলট পালট ঘটে গেল খাড়ে পাথরের বংশধর ত্রিতনসিং ভুইয়ার সতেরখানি তরফে।

সর্দার বাঘরায় সোরেন মৃত।

বীরের মত যুদ্ধ করতে করতে নিহত হয়নি বাঘরায়। মৃত্যু এসেছে ধীরে ধীরে এক পা এক পা করে। ঠিক বাটালুকায় নিজের কুটিরে ছুটকীর পাতা শয্যায় শুয়ে যে ভাবে মৃত্যুর কল্পনা করত সে একসময়ে। পার্থক্যের মধ্যে কুটিরের চালের পরিবর্তে ওপরে ছিল উন্মুক্ত আকাশ। আর ছুটকীর অশ্রুসিক্ত মুখের বদলে চোয়াড়দের ঝুঁকে পড়া মুখের অবাধ জলরাশি। শিশুর মতই কেঁদেছিল চোয়াড়রা বাঘরায়ের শেষ সময়ে। রাজাকেও তারা এমনভাবে ভালবাসতে পারেনি। সর্দারকে ভালবেসে নিজেদের ঘর সংসার ভুলতে বসেছিল তারা।

অসুখে ভুগে মৃত্যু হল বাঘরায়ের। অসুখ নিয়েই দিনের পর দিন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল সে বরাহভূম-রাজকে। শেষে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। খড়ের বিছানায় আশ্রয় নিয়ে শেষ দিনের জন্যে অপেক্ষা করতে হল তাকে।

রাজা কাঁদল, রাণী কাঁদল, রানকো কাঁদল। কিন্তু সারিমুর্মুর চোখে জল দেখা গেল না। সোজা কিতাগড়ে এসে বুক ফুলিয়ে বলল—এবারে কাজের ভার দিন রাজা।

—কি কাজ?

—বাঘরায়ের কাজ—আমার ছেলের ফেলে রাখা কাজ।

—বড় দেরি হয়ে গিয়েছে সর্দার।

—কেন রাজা?

—বরাহভূমে আর কোনদিনও যেতে পারবে না চোয়াড়রা। বাঘরায়ের মৃত্যুতে পথ পরিষ্কার হয়েছে বরাহভূমের রাজার। তিনি এগিয়ে আসছেন—দল বেঁধে এগিয়ে আসছেন।

—এখনো আমাকে ভুলোতে চেষ্টা করছেন রাজা? আমি কি এতই অপদার্থ? সারিমুর্মু উন্মত্তের মত চেঁচিয়ে ওঠে। তার বার্ধক্যের শিরা-ওঠা হাত থরথর করে কাঁপে।

—মিথ্যা বলছি না সর্দার। মিথ্যা বলার সময় নেই। সংবাদ পেয়েছি আমি। ধলভূম, সুপুর আর বরাহভূম—প্রস্তুত তারা। অম্বিকানগর আর শ্যামসুন্দরপুর পথে যোগ দেবে।

—তবে আমি কি করব? আমার কি কোন কাজ নেই?

—যে কাজের জন্যে রেখেছি তোমাকে, সেই কাজই করবে। সে-দিন খুবই কাছে। হ্যাঁ, এখন আমি স্পষ্ট করেই বলতে পারি সে-দিনের আর দেরি নেই।

লালসিং হাঁটতে শিখছে। কিতাগড়ের অন্তঃপুর তোলপাড় করে ঘুরে বেড়ায়। কথায় কথায় হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে। মুংনী প্রথম প্রথম ছুটে এসে ধরে ফেলত। এখন আর ধরে না। রাণীর হুকুম। লালসিং পড়ে যাক্, মুখ কাটুক, মাথা ফাটুক—ধরতে পারবে না মুংনী। অত আগলে রাখলে কষ্টসহিষ্ণু হতে পারবে না। কষ্টসহিষ্ণু না হলে, বরাহভূম, ধলভূম আর সুপুরের রাজা হওয়া যায়—সতেরখানির নয়। রাজার ছেলে হয়ে জন্মালেই রাজা হওয়া যায় না এখানে। পরীক্ষা দিতে হয়—কঠোর পরীক্ষা।

প্রথম প্রথম পড়ে গিয়ে কাঁদত লালসিং। এখন আর কাঁদে না। শিশুমনেও বোধ হয় উপলব্ধি জেগেছে যে, হাঁটতে গেলে পড়তে হয়। আর পড়ে গেলে ব্যথাও পেতে হয়। কিন্তু তার জন্যে আকুল হবার কিছু নেই। ব্যথা আপনা থেকেই সেরে যায়।

ডান হাতের আঙুল কেটে ফেলেছিল লালসিং একদিন। বাবার অসাবধানে রাখা তরবারি নিয়ে খেলা করতে গিয়ে। রক্ত দেখে চম্‌কে উঠেছিল মুৎনী। ছুটে গিয়ে রাণীকে ডেকে এনেছিল। কোথায় কেটেছে প্রশ্ন করা হলে সে ডান হাতখানা পেছনে লুকিয়ে রেখে ভাল মানুষের মত বাঁ হাতখানা বাড়িয়ে দিয়েছিল মায়ের দিকে। আনন্দে ভরে উঠেছিল মায়ের বুক। জড়িয়ে ধরেছিল লালসিংকে।

কিন্তু সে ঘটনার পর বেশ কিছুদিন চলে গিয়েছে। প্রায় দুমাস হতে চলল। এই দুমাসে অনেক পরিবর্তন হয়েছে ধারতির। পরিবর্তন হয়েছে সতেরখানির। এখন আর লালসিংএর দিকে চাইবার সময় নেই ধারতির। তার মাথায় অনেক চিন্তা। শত্রুরা এক নতুন কৌশল সুরু করেছে। খণ্ড খণ্ড দলে এসে মাঝে মাঝে সীমান্তে হানা দিচ্ছে। বুধকিস্‌কু অনেকদিন একা ঠেকিয়েছে। কিন্তু এখন সে অক্ষম। দিনের পর দিন না খেয়ে না ঘুমিয়ে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে তার। ফিরে এসেছে বাটালুকায়। না আসতেই চেয়েছিল সে। বাঘরায়ের মত সে-ও খড়ের বিছানা বিছিয়ে নিয়েছিল এক পাহাড়ের গুহায়। ত্রিভন জোর করে ধরে এনেছে তাকে—তিরস্কারও করেছে। বিপদ যতই এগিয়ে আসছে ততই বজ্রকঠিন হয়ে উঠছে ত্রিভন। ভাবাবেগকে সে পছন্দ করত এককালে—এখন আর বরদাস্ত করতে পারে না। প্রৌঢ় বুধকিস্‌কু জীবনে অনেক আঘাতই হয়ত পেয়েছে, তবু ভাবাবেগকে কেন যে মনে স্থান দিল বুঝতে চেষ্টা করেনি ত্রিভন। সে শুধু বুঝেছিল সতেরখানির জনবল নগণ্য। বুধকিস্‌কু বাটালুকায় ফিরে এসে বিশ্রাম নিলে, স্বাস্থ্য তার ফিরে পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। আর সে সুস্থ হলে চরমতম দিনে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যাবে তার কাছ থেকে। তাই উগ্র ভাষা প্রয়োগ করেছিল সে বুধ-এর ছেলেমানুষীতে।

শত্রুদের কৌশল ব্যর্থ হয়নি। লোক কমে আসছে সতেরখানি তরফের। প্রতিদিন সীমান্তের দিকে পাড়ি দিচ্ছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চোয়াড়ের দল, আর প্রতিদিনই এ-বাড়ী ও-বাড়ী থেকে হাহাকার উঠছে। কান্নার আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয় সব কয়টি পাহাড়ে।

ত্রিভনের বুকে চাপা ব্যথার গুমড়ানি। সে ব্যথা সঞ্চারিত হয়েছে ধারতির বুকেও। লালসিংকে দেখার সময় কোথায় তার?

—ভুলই করেছি ধারতি। ত্রিভন একদিন সীমান্ত থেকে ফিরে এসে বলে। এখন সে সীমান্তেই থাকে। মাঝে মাঝে সময় করে কয়েকদণ্ডের জন্যে ফিরে আসে বাটালুকায়।

—না।

—রাজ্য জনশূন্য হতে চলল।

—হোক্।

—লিপুর!

—আমি রাণী, রাজা।

—হাঁ, রাণী। রাণী কি ভেবেচিন্তে আমার কথার জবাব দিচ্ছ? না, লিপুরের মত খেয়ালের বশে কথা বলে চলেছ?

—রাণী আর লিপুরের তফাৎ আছে রাজা। কিন্তু মন তাদের একই। দুজনেই বাটালুকার মেয়ে—দুজনেই ভালবাসে সতেরখানিকে।

—সে ভালবাসা কি শুধু এখানকার বন-জংগল পাহাড় আর মাটির জন্যে?

—না, রাজা। মানুষদেরই ভালবাসি আমি। জানি, এ-যুদ্ধে সব সংসারেই বিধবা আর অনাথের সংখ্যা বাড়বে—না খেয়ে মরবে কত, তবু তুমি ভুল করনি।

—রাণী।

—শুধু বেঁচে থাকাটাই কি সব রাজা? আমি জানি, তুমি সব বোঝ। তবু এমন দুর্বল হয়ে পড় কেন মাঝে মাঝে? ধারতি কয়েক পা এগিয়ে এসে ত্রিভনের গলা বেষ্টন করে দুহাতে।

—একি! নিজের হাতের দিকে চেয়ে চমকে ওঠে ধারতি।

—রক্ত।

—কোথা থেকে লাগল?

—গলা থেকে। তীরটা গলার চামড়া উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল। বুকেও লাগতে পারত। আমি হলে ঠিক লাগাতে পারতাম।

—ও। আহত স্থানটি এক ঝলক চেয়ে দেখে নেয় ধারতি। মুখে তার হাসি ফোটে। সতেরখানির বীর রাজা। তবু একান্তভাবে তারই। যুদ্ধের সাজে এখন আর সাজিয়ে দিতে পারে না সে। সময় থাকে না।

এমনিভাবে ধূমকেতুর মত এসে বিদায় নিয়ে আর হয়ত ফিরবে না ত্রিভন। ভাবতে গিয়ে শিউরে ওঠে ধারতি—অথচ কতবার ভেবেছে একথা।

যদি সত্যিই ত্রিভন না ফেরে একদিন—মনকে ভাবাবেগবর্জিত করে ভাবতে চেষ্টা করে ধারতি। তেমন দিন আসতে পারে বৈকি। তেমন দিন এলে নিজের জন্যে ব্যস্ত হবার বিশেষ কারণ নেই। শত্রুর সামনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে করতে সে মরতে পারবে। কিংবা আত্মহত্যা।

কিন্তু লালসিং? সে কোথায় যাবে?

ত্রিভন একদৃষ্টে চেয়ে ছিল ধারতির মুখের দিকে। ধারতির চোখের পাতায় আর মুখের রেখায় বোধ হয় স্পন্দিত হচ্ছিল তার চিন্তাধারা। অনুমান করতে পারে ত্রিভন।

—আমি মরলেও তোমার মরা চলবে না রাণী।

কেঁপে ওঠে ধারতি,—কেন?

—লালসিংএর জন্যেই তোমায় বাঁচতে হবে। তোমার তত্ত্বাবধানে থাকলে একদিন সে সতেরখানি তরফের উপযুক্ত রাজা হয়ে উঠবে—এ আমি জানি। সব শিখিও তাকে।

ধারতি স্তব্ধ।

—পারবে তো রাণী?

অনেক চেষ্টার পর রাণী মুখ খোলে,—পারব রাজা। সাধ্যমত চেষ্টা করব তোমার কথা মেনে চলতে।

কেঁদে ফেলে রাণী। কাঁটারাঙ্গার কালো পাথরের পাশে সেদিনের লিপুর একবার যেমন কেঁদেছিল ঠিক তেমনি।

ত্রিভন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। একটুও নড়ে না। সে শুধু ভাবে। কতখানি শক্তির অধিকারিণী হতে পারলে অনাগত সত্যকে এভাবে মেনে নিতে পারে মেয়েরা।

—আর একটা কথা। লালসিং-এর জীবনের জন্যে হয়ত তোমাকে সবার অলক্ষ্যে চোরের মত পালাতে হবে।

—না। চোরের মত পালাতে আমি পারব না।

—অবুঝ হয়ো না রাণী। সকলের সামনে দিয়ে রাণীর সম্মান নিয়ে চলে যাবার সুযোগ তোমার নাও আসতে পারে।

—তাই বলে চোরের মত?

—হাঁ। ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে দিয়ে, শালবনের অন্ধকার ভেদ করে, পাহাড় পেরিয়ে যাবে তুমি। কোলে থাকবে লালসিং—তোমার আর আমার লালসিং। তোমার শিক্ষায় আমাদের লালসিং একদিন হয়ে উঠবে সারা সত্তেরখানির লালসিং।

—রাজা। আর্তনাদ করে ওঠে ধারতি।

—রাণী।

—বল, তোমার কি হয়েছে।

—কিছু নয় তো।

—তবে আসল ঘটনা খুলে বল। লুকিও না রাজা। তুমি যা বলবে অক্ষরে অক্ষরে মেনে নেব। শুধু সত্যি কথা আমাকে খুলে বল। সে-দিন কি খুবই কাছে যার জন্যে আজই তোমাকে এত কথা বলতে হচ্ছে ?

—হাঁ। লিপুর। আমার কাঁটারাঙ্গার কালো পাথরের লিপুরের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় হয়ে এসেছে। এগিয়ে আসছে তারা। দল বেঁধে এগিয়ে আসছে। সাধ্য নেই যে ঠেকিয়ে রাখি। জনবল নেই, ওদের সিকিও যদি থাকত আমার, প্রচণ্ড আঘাত দিয়ে ফিরিয়ে দিতে পারতাম।

—আমি লুকিয়েই যাব রাজা। তুমি নিশ্চিন্ত হও। তোমার লালসিংকে সার্থক করে গড়ে তুলব। সে প্রতিশোধ নেবে—দারুণ প্রতিশোধ। তার জন্যে সত্তেরখানির শেষ পুরুষটিও যদি প্রাণ দেয়, পেছপা হবে না সে। আমি প্রতিজ্ঞা করছি রাজা, এইভাবেই তাকে গড়ে তুলব।

একটু থেমে কি যেন ভাবে রাণী। তার চোখের দৃষ্টি স্থির, ওষ্ঠ দৃঢ়। শেষে বলে,—আর যদি দেখি, তেমন করে তুলতে পারলাম না তাকে, যদি সে অন্যরকম হয়ে ওঠে, তবে নিজের হাতে বিষ দেব তোমার লালসিংকে।

ত্রিভন চেয়ে থাকে। এই রাণীকে সে চেনেনা—যেন নতুন দেখছে। কিতাপাটকে নিঃস্ব করে দিয়ে সমস্ত শক্তিটুকু যেন মূর্তি ধরে এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে।

—বিজলী আজ নেই ধারতি। সে থাকলে ভাবতে হতো না। নিরাপদে তোমাদের পৌঁছে দিত সারিগ্রামে।

—সারিগ্রাম ?

—হঁা। রান্‌কো তোমাদের জন্যে ব্যবস্থা করে রেখেছে সেখানে। শত্রুদের দৃষ্টি অতদূর যাবে না। লালসিংকে খুঁজে পাবে না তারা।

—এতদূর এগিয়েছ, অথচ আমাকে জানাওনি রাজা।

—খুবই তাড়াতাড়ি সব হ'য়েছে। সীমান্ত থেকেই রান্‌কোকে পাঠিয়েছিলাম। তাছাড়া তোমাকে সত্যিই এতদিন চিনতে পারিনি। আমার লিপুর যে এতবড় তা জানতাম না।

ত্রিভন কথা শেষ করে হাসে। ধারতির মুখেও হাসি। সব বিপদের কথা ভুলে যায় তারা। মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে থাকে উভয়ে উভয়ের দিকে।

সে রাতে কিতাগড় থেকে বাঁশের বাঁশীর বিষাদ সুর ভেসে বেড়িয়ে বাটালুকার আকাশবাতাসকে অভিভূত করে। আশেপাশের প্রতিটি কুঁড়েঘরের বিরহিনী সে সুরের মূর্ছনায় পাগল হ'য়ে ওঠে। তাদের চোখ দিয়ে তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়েছিল বাহুল্যহীন শয্যায়। শয্যার ওপর ঘুমন্ত শিশুদের কথা ভুলে যায় তারা।

ঝাঁপনী সাল্‌হাই হাঁস্‌দার ডানহাতখানা শরীরের ওপর থেকে সরিয়ে দিয়ে উঠে বসে। দেহ ক্লান্ত তার—অথচ মন বুভুক্ষু। শয্যা ছেড়ে মাটিতে নামে সে। অনেকটা দূর হলেও বাঁশীর সুর তার কানেও পৌছেচে।

—কোথায় যাচ্ছ? সাল্‌হাই জেগে উঠেছে। এটা তার নিয়মের ঘোরতর ব্যতিক্রম। ঝাঁপনী পাশে শুলে, একটা নিয়মিত সময়ের পরেই তার আর জ্ঞান থাকে না। গভীর ঘুমে অচেতন হয় সে। ঘুম ভাঙে একেবারে ভোর বেলা। কিন্তু দু'চারদিন থেকে সে আর ঠিকমত ঘুমোতে পারছে না। মাঝে মাঝে এইভাবে জেগে ওঠে। সীমান্তের ঘটনা তাকে আতংকিত করেছে। রাজার লোক হয়ত বাড়ীতে এসে হানা দেবে—তার সাহায্য চাইবে। সে ভাল রকম জানে, এই রাতে দু'চারজন বৃদ্ধ আর অক্ষম পুরুষ ছাড়া খুব কম লোকই ঘরে রয়েছে। সবাই জড়ো হয়েছে সীমান্তে আর কিতাগড়ে। কিতাগড়ের পাশে চোয়াড়দের আস্তানা উঠেছে—সারিমুর্মু তাদের সর্দার। সীমান্তের সর্দার রাজা নিজে আর রান্‌কো। অদ্ভুত কৌশলে রাজা নাকি এগিয়ে আসা শত্রুদের থামিয়ে দিয়েছেন কয়েকদিনের জন্যে। কি সে কৌশল সাল্‌হাই জানে না। যে চোয়াড় খবর দিয়েছিল সেও বলতে পারেনি। তবে রাজার এই কৌশল ক্ষণস্থায়ী।

হুদিন পরেই আবার এগোতে সুরু করবে তারা। ভাবতেও গায়ে কাঁটা দেয় সাল্হাইএর।

ঝাঁপনী সাল্হাইএর দিকে হিংস্রদৃষ্টিতে চেয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

—বললে না কোথায় যাচ্ছো? সাল্হাই তাড়াতাড়ি উঠে বসে।

—বাইরে। ঝাঁপনী দরজা খোলে।

—এই রাতে? পাগল হয়েছ নাকি?

ঝাঁপনী কথা বলে না। বাইরে পা বাড়ায় সে।

—আরে! সত্যিই যাচ্ছো? ভালুকের ভয় নেই?

—না।

—ঝাঁপনী! চাটাই ছেড়ে ছুটে আসে সালহাই দরজার দিকে।

উন্মত্তের মত ছুটে চলে ঝাঁপনী। মুহূর্তের মধ্যে রাশি রাশি অন্ধকার গ্রাস করে তাকে।

সাল্হাই ঘরের বাইরে কিছুক্ষণ থ' হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শেষে ভালুকের কথা মনে পড়তেই কাঁপতে কাঁপতে এসে দরজায় খিল লাগায়। মনকে সান্ত্বনা দেয়, পাগলের পেছনে ছুটে প্রাণ হারিয়ে লাভ নেই। সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। এভাবে বাইরে ছুটে যাবার কি কারণ থাকতে পারে ঝাঁপনীর।

অনেকটা পথ দৌড়ে এসে এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়ায় ঝাঁপনী। নানান্ ফুলের মেশানো গন্ধ নাকে এসে লাগে। সে বুক ভরে টেনে নেয়।

বাঁশীর সুর তখনো কেঁপে কেঁপে বেজে চলেছে। ঝাঁপনী জানে কে ওই বাঁশীওলা! সবাই না জানলেও অনেকেই জানে।

কিতাগড়ের একটু দূরে চোয়াড়দের আস্তানা। সর্দার সারিমুর্র হুকুমে এদের নড়া বসা। রাজা ত্রিভনেরও এদের ব্যাপারে কিছু বলার নেই।

ঝাঁপনী অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে আস্তানার দিকে চেয়ে। মনে ক্ষীণ দুরাশা রান্কোকে হয়ত দেখতে পাবে এখানে। সে-ও তো এক সর্দার।

একটি মশালও জ্বলছে না চোয়াড়দের আড্ডায়। একটি লোকও জেগে আছে বলে মনে হয় না! বৃদ্ধ সারিমুর্র কথা ভেবে মনে মনে হাসে ঝাঁপনী। বয়স যখন নেই, রাজার কাছে নিজেকে ওভাবে জাহির না করলেই ভাল করত সর্দার। নিজে অক্ষম হয়ে পড়লে দলের ওপরও দখল রাখা যায় না। শত্রুরা এই রাতের অন্ধকারে যদি এগিয়ে আসে বিনা বাধায় প্রবেশ করবে তারা

কিতাগড়ে। সর্দারের ওপর নির্ভর করার ফল হাতে-নাতে পাবেন রাজা। অমন মন-কাঁদানো বাঁশী মুহূর্তে স্তব্ধ হবে।

ঝাঁপনী লক্ষ্য করেছে রান্‌কোরও অগাধ বিশ্বাস এই বৃদ্ধের ওপর। তার কাছ থেকেই তো সব শোনা। নইলে কিতাগড়ের এত সব খবর সতেরখানির এক কাপুরুষের স্ত্রীর কাছে এসে পৌঁছবে কি ভাবে?

নাঃ। রান্‌কো এখানে থাকতে পারে না। তার কাজ সীমান্তে। নিরাশ হয় ঝাঁপনী। ভাবে, বাঁশীর সুর শুনে এভাবে ছুটে আসা ঠিক হয় নি। সাল্‌হাইকে একটা ভাল রকম কৈফিয়ৎ দিতে না পারলে ঝঞ্ঝাট বাড়বে।

তবু, একবার যখন ঘর ছেড়েছে, শেষ দেখে যাবে। কাঁটারাঞ্জায় যাবে সে— পারাউমুর্মুর বাড়ী। হয়ত আজই রান্‌কো রয়েছে সেখানে। অসম্ভবও তো সম্ভব হয় কখনো কখনো।

পেছন ফিরতে গিয়ে আর্তনাদ করে ওঠে ঝাঁপনী। দুজন পুরুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে তার দুই পাশে।

—ভয় নেই।

—কে তোমরা?

—চোয়াড়। কিতাগড়ের রক্ষী। এখানে কেন এসেছ?

—তোমরা কোথায় ছিলে? আগে তো দেখিনি।

—সব জায়গাতেই আছি আমরা। একটা ছুঁচোও আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে কিতাগড়ের দিকে যেতে পারবে না।

সারিমুর্মুর কাছে মনে মনে ক্ষমা প্রার্থনা করে ঝাঁপনী। যাকে সে চেনেনা, নিজের কাঁচা বুদ্ধি নিয়ে তার সম্বন্ধে মনে অশ্রদ্ধা পোষণ করা উচিত নয়। সেটা ধৃষ্টতা।

চোয়াড় দুজন একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে। সন্তোষজনক জবাব চায় তারা। এত রাত্রে একজন নারীর কিতাগড়ের আশেপাশে ঘুরে বেড়ানকে তারা সহজ চোখে দেখেনি।

ঝাঁপনী বুঝতে পারে, এরা বাটালুকার লোক নয়। তাই চেনেনা তাকে। আশেপাশের গ্রামেরও নয়, তাহলে কিতাডুংরির উৎসবে অন্ততঃ একবার দেখা হত। জবাব এদের দিতেই হবে।

—রান্‌কো সর্দার নেই?

—সে এখানে থাকবে কেন? আমরা সারিমুর্মুর লোক।

—তা তো আমি জানিনা। অত বুঝিও না। কিতাপাটের প্রসাদ রয়েছে। তাকে দেবো।

—সেখান থেকেই আসছো ?

—হ্যাঁ।

—মিথ্যে কথা। দৃঢ় স্বর ঝংকৃত হয় একজন পুরুষের।

ঝাঁপনী কেঁপে ওঠে। শেষে প্রায় সত্যি কথাই বলতে হয় তাকে। সে স্বীকার করে যে, সে সাল্‌হাই হাঁসদার স্ত্রী। রাজার বাঁশী শুনে উঠে এসেছে। কেন এসেছে সে নিজেই জানে না।

—চল বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি।

—না। বাড়ী যাব না।

—তবে চল সর্দার সারিমুর্মুর কাছে।

ঝাঁপনী বুঝতে পারে, এরা বোকা নয়। ছলনাতেও ভোলানো যাবে না এদের। মরিয়া হ'য়ে সে বলে—পারাউ মুর্মুর বাড়ী পৌঁছে দাও।

—সেখানে কি করবে ?

—তাতে তোমাদের দরকার নেই।

—সেখানে কেউ থাকে না।

—তোমাদের চেয়ে তা আমি ভালভাবে জানি। যদি পৌঁছে দিতে হয়—সেখানে নিয়ে চল। নইলে আমাকে যেতে দাও। তোমাদের সংগে দাঁড়িয়ে কথা বলার সময় নেই আমার। আমারও কাজ আছে।

পুরুষ দু'জন অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে ঝাঁপনীর মুখের দিকে। অন্ধকারের মধ্যেও তন্নতন্ন করে খোঁজে তার মনের অভিসন্ধিকে। শেষে বিশ্বাস করে। যেতে দেয় তাকে।

অন্ধকারে কাঁটারাঙ্গার দিকে এগিয়ে যায় ঝাঁপনী। শেষ চেষ্টা।

হাণ্ডির হাঁড়িটা নিয়ে বসতেই দরজায় ধাক্কা শুনতে পায় রান্‌কো। এত রাত্রে এভাবে লোক আসা কাঁটারাঙ্গার মতন জায়গায় একটু অস্বাভাবিক। মুহূর্তের মধ্যে তার মস্তিষ্ক সবটুকু কাজই করল, অথচ কোন মীমাংসায় আসতে পারে না সে। হয়ত রাজাই লোক পাঠিয়েছেন অনুমানের ওপর নির্ভর করে। সীমান্ত থেকে ত্রিভন চলে আসার কিছুক্ষণ পরে সেও চলে এসেছিল। এসে রাজার সংগে দেখা করতে পারেনি। বড় পরিশ্রান্ত বোধ করছিল।

শত্রুরা দুদিন আর এগোবে না। রাজার চমকপ্রদ কৌশলের জন্যে তারা বিপর্যস্ত। অবশ্য এই কৌশলের জন্য পাঁচ জন লোক জখম হয়েছে। চোয়াড়দের হাণ্ডির ভাঁড়গুলো নিয়ে একদল অসমসাহসী লোক শত্রুসেনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের পাশ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। ঝাঁপিয়ে পড়েছিল শত্রুরা। সেই প্রথম চোটেই পাঁচ জন জখম হয়। বাকী বিশ জন হাত জোড় করে বলে, তারা নিরীহ মানুষ। ত্রিভন সিংএর চোয়াড়দের জন্যে হাণ্ডি নিয়ে যাচ্ছিল। পথ ভুল করেছে।

শত্রুদের উল্লাসের বাঁধ ভেঙেছিল। তাদের অধিকাংশই হাণ্ডির পাত্র থেকে চুমুক দিয়ে কিছু না কিছু খেয়েছে। জানত না অমৃতের মধ্যেও কালকূট থাকে। ফলে মরেছে অনেক, অসুস্থ হয়েছে তার চেয়েও বেশী। এই সব অক্ষম সৈন্যদের ব্যবস্থা করে নতুন উদ্যমে এগিয়ে আসতে সময় লাগবে ওদের। সেই অবসরে নিজেদের হাণ্ডির সংগ্রহ করতে হবে আবার। নইলে চোয়াড়দের মনোবল নষ্ট হবে। খালি পেটে তারা দিন কাটাতে পারে। হাণ্ডি ছাড়া নয়। একদিনেই অনেকে যেন ঝিমিয়ে পড়েছে বলে বোধ হল। তাই রাজা চলে আসার পরই নিজের দায়িত্বে দশজন লোক নিয়ে ফিরে এসেছে রান্‌কো বাটালুকায়—আরও দশজনকে পাঠিয়েছে তরফের অন্যান্য দিকে। তারা কতদূর সফল হবে জানে না সে। তবে বাটালুকা থেকে বেশ কিছু পাওয়া যাবে এবিষয়ে সে নিশ্চিন্ত। কারণ শুকোলদের মত অনেকেই রয়েছে এখানে, যাদের হাণ্ডি তৈরী করা ব্যবসা।

শুকোলদের বাড়ীতে দশ হাঁড়ি পাওয়া গিয়েছে। তার থেকে নিজের জন্যে চেয়ে নিয়েছে সে। তারও প্রয়োজন রয়েছে হাণ্ডিতে। সে-ও ক্লান্ত। প্রথম প্রহরেই খেত সে। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়েছিল হঠাৎ। ঘুম ভাঙতেই হাণ্ডি নিয়ে বসেছে। ও-জিনিষ পেটে না পড়লে ভোর রাতে তার পক্ষে পথ চলাই হয়ত মুশকিল হবে। পেট খালি রেখে কতদিন আর শরীরকে মজবুত রাখা সম্ভব।

সংগে যারা এসেছে হাণ্ডি নিতে, তাদেরই কারও কাছ থেকে বোধ হয় খবর পৌঁছেচে রাজার কাছে। তাই মাঝরাতে এই তলব।

দরজাটা আবার ঝন্‌ঝন্ করে ওঠে। মরিয়া হয়ে কেউ ধাক্কা দিচ্ছে। হয়ত এর মধ্যেই কোন বিপদ ঘটেছে। রান্‌কো ছুটে গিয়ে খুলে দেয়।

একী ঝলক আগুণ যেন এসে গায়ের ওপর পড়ে। না না, অমৃত। রান্‌কো

ঠিক বুঝতে পারে না। শুধু সে ঝাঁপনীর মুদিত চোখ দুটির দিকে চেয়ে থাকে। মাটিতে ঝরে পড়া মহুয়া ফুল। গন্ধে ভরপুর—অথচ শুকিয়ে যাবে।

কোন কথাই বলে না তারা। শুধু দু'জনের বুকের ধুকধুকানি অনুভব করে দু'জনে—আনন্দের, উত্তেজনার, বিষাদের। সারিগ্রাম থেকে যেদিন প্রথম ঝাঁপনীকে নিয়ে আসে রান্‌কো সে-রাতে এমনিই অনুভব করেছিল। শত চেষ্টাতেও বহুক্ষণ কথা বলতে পারেনি।

এক হাতে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে রান্‌কো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে,—বল ঝাঁপনী।

—তুমি বল।

—আজ আমি শুনব।

—রোজই তো তুমি শোনো।

—তোমার আর আমার মধ্যে এটাই বোধ হয় নিয়ম।

—আমাকে নিয়ে চল।

—কোথায়?

—তোমার সংগে।

—আর একবার এই কথা বলেছিলে। মনে আছে?

—হুঁ।

—বলতো কোথায়?

—কিতাডুংরিতে।

—তবু বলছ?

—বলব—চিরকাল বলব। না বলে যে পারিনা গো।

ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়ে ঝাঁপনীর দু'চোখ বেয়ে।

—চিরকালেরও শেষ আছে ঝাঁপনী।

—জানি। খুব তাড়াতাড়ি।

—কে বলল তোমাকে? রান্‌কো অবাক হয়!

—কিতাগড়ের পাশে রাতের অন্ধকারে চোয়াড় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবু বুঝব না?

—তুমি বুদ্ধিমতী।

—তোমার জন্যে। এত সব ভাবি, শুধু তোমার কথা ভেবেই। নইলে সাল্‌হাই হাঁসদার বউএর দরকার ছিল না কোন এতে মাথা ঘামানোর।

দমকা হাওয়ায় ভেজানো দরজা খুলে যায়।

—রাত ভোর হতে দেরি নেই ঝাঁপনী। ভোরেই রওনা হব আমি।

ফ্যাকাসে হয়ে যায় ঝাঁপনীর মুখ। সে কোন জবাব দিতে পারেনা। শুধু দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রান্‌কোকে।

—এসো ঝাঁপনী। আজকের মত আনন্দ করে নি। হাণ্ডি রয়েছে ঘরে। দুঃখের দিনের কথা ভেবে লাভ কি?

—রাজাও বুঝি সেইজন্যেই বাঁশী বাজাচ্ছেন?

—রাজা বাঁশী বাজাচ্ছেন?

—হ্যাঁ। সেই বাঁশীর সুর স্বপ্নের মধ্যে আমাকে জাগিয়ে দিল। তোমাকে দেখার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলাম। অসম্ভব জেনেও ঘর থেকে বাইরে এলাম। কিন্তু বাধা দিল ও।

—কে?

—তোমাদের সাল্‌হাই হাঁসদা।

—সে তোমার পেছনে ছোটেনি তো?

—না। বড্ড ভীতু। ভালুকের ভয়। ওর ঠাকুর্দাকে ভালুকে মেরেছিল। রান্‌কো হেসে ওঠে।

ঝাঁপনী বলে—রাজার বাঁশীর সুরে অত দুঃখ কেন?

—সতেরখানির দুঃখ ঝরছে ওতে। অনেক স্বপ্ন দেখতেন রাজা। এখনো দেখেন। কিন্তু স্বপ্ন সত্যি হওয়া বড় কঠিন। তাই স্বপ্ন ভাঙার দুঃখ তার বাঁশীর সুরে।

হাণ্ডি খেয়ে দুজনে নাচতে সুরু করে। কিতাডুংরির নাচের মত উদ্দাম। রান্‌কোর নিজের বাড়ীতেও এমন নাচত তারা। পাড়ার বুড়োরা এসে গালাগালি দিত কত। নাচতে কেউ-ই মানা করে না। কিন্তু এদের সময়ের জ্ঞান ছিল কম। রাত বে-রাতে খেয়াল মত হাণ্ডি খেয়ে নাচতে সুরু করত।

আজও তেমনি নেচে চলে।

শেষে এক সময় ভোরের পাখী ডেকে ওঠে। বাতাসে শিশির-ভেজা লতাপাতার গন্ধ।

খেয়াল হয় রান্‌কোর। নাচ থামায় সে। অবসন্ন ঝাঁপনী এলিয়ে পড়ে তার বুকের ওপর। অনেক আগের পরিচিত বুক। ঠিক কোন্‌খানে মাথা রাখলে আরাম হয়, সে জানে। সাল্‌হাই-এর বুক অমন নয়।

—এখনি ওরা আসবে ঝাঁপনী।

কারা ?

—সীমান্তে হাণ্ডি বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে দশজন লোক এসেছে আমার সংগে।

—তবে সে হলোনা। উতলা হয় ঝাঁপনী।

—কি হলো না ?

চুপ করে থাকে ঝাঁপনী।

—বল ঝাঁপনী।

তবু কথা বলে না সে। হাণ্ডির গুণে—তার অনেক লজ্জা খসে গিয়েছে। কিন্তু চরম জিনিষ কি অত সহজে বলা যায় ? সে যে মেয়ে। রান্‌কোকে সে চেনে—ভালভাবেই চেনে। দেহে ও মনে। তবু কতদিন হয়ে গিয়েছে— অনেকদূরে সরে গিয়েছে রান্‌কো। দেহের দিক থেকেই সাল্‌হাই তার কাছে অনেক বেশী পরিচিত। রান্‌কো নতুনই—বহুদিনের অব্যবহার্য জিনিষ এমন নতুন বলেই মনে হয়।

—বলবে না ঝাঁপনী ?

—হ্যাঁ বলব ! বলবই তো। কতদিন আর মনের মধ্যে পুষে রাখব ? ঝাঁপনী আবার থামে। তার মন মাথা ঠোকে কথাটা বলে ফেলার জন্যে।

শেষে ভাষা খুঁজে পায়। বলে,—এত যে বাচ্চা হল আমার, সবাই হবে বাপের মত ভীতু।

ঝাঁপনী চুপ করে। সে রান্‌কোর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চায়।

—বল ঝাঁপনী। থামলে কেন ?

—একজনও কি তোমার মত হবে না ?

—হবে হয় তো।

—না। দৃঢ় স্বর ঝাঁপনীর।

—এখন কি করে বুঝবে ?

—বুঝতে পারি আমি।

—তবে, সে তোমার ভাগ্য।

—মানব কেন ভাগ্য ? তোমার মত ছেলে আমার চাই-ই। কি নিয়ে বাঁচব ?

—কি করে সম্ভব ?

—তুমি দেবে।

চমকে ওঠে রান্‌কো।

—বল, দেবে আমাকে ?

—বড় দেরিতে বললে ঝাঁপনী।

—না দেরি হয়নি।

—কি করে বুঝলে ?

—এতগুলোর মা হলাম, আমি বুঝিনে ?

—কিন্তু— !

—কিন্তু নয়।

—আমার একবিন্দু অবসর বোধ হয় মিলবে না আর। হয়ত আর দেখাই হবে না।

—আমিও জানি তুমি আর ফিরবে না। কয়েক দিন থেকে যাও।

—অসম্ভব। এখনি ওরা আসবে। বাটালুকা ছাড়তেই হবে আমাকে। চোয়াড়রা ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করছে আমার জন্যে—হাণ্ডির জন্যে।

রান্‌কো ভেবে পায় না ঝাঁপনী কি করে বুঝল যে সে আর ফিরবে না। মরতে তাকে হবেই। রাজাও বাঁচবেন না। সম্মানের জন্যে যেখানে যুদ্ধ সেখানে রাজা আর সর্দারেরা যুদ্ধের পরে বেঁচে থাকতে পারে না। বাঁচতে হলেও শত শত পিতৃহীন অনাথ আর বিধবাদের ফেলে রেখে অন্য রাজ্যে পালিয়ে যেতে হয়—যা এক্ষেত্রে অসম্ভব।

রান্‌কোর চোখদুটো ভিজে ওঠে, কিতাডুংরির পাহাড়ের বিচারের দিনে কাঁদতে গিয়ে সর্দারদের ধমক খেয়ে সে চোখের জল মুছে ফেলেছিল। তারপর এই প্রথম।

ঠিক সেই সময়ে ওরা এসে পড়ে। বাইরে থেকে ডাক দেয় রান্‌কোকে। অনেক হাণ্ডি সংগ্রহ করেছে, সারা রাত ঘুরে। শুকোলদের বাড়ী থেকে বাকীটুকু নিয়ে যাবে।

ঝাঁপনী আছড়ে পড়ে রান্‌কোর পায়ের ওপর,—কি নিয়ে থাকব বল। বলে যাও কি নিয়ে থাকব।

—তোমাকে একটু লুকোতে হবে ঝাঁপনী। ওরা দেখলে ফল খুব ভাল হবে না।

—কি নিয়ে থাকব আমি ?

—স্মৃতি। পথে ঘাটে অনেক মেয়েই দেখতে পাবে তখন। তাদেরও ছেলে-পুলে নেই। নতুন বিয়ের পর স্বামীকে যুদ্ধে পাঠিয়েছিল। স্মৃতি নিয়ে তারাও

বাঁচবে।. বাঁচতে হবে। নতুন করে ঘর গড়া সম্ভব হবে না সকলের পক্ষে! পুরুষ কমে যাবে সত্তেরখানির। তোমার তবু কাজ আছে। তাদের কিছুই নেই।

ঝাঁপনী স্তব্ধ হয়ে যায়।

লালসিংকে বুকে আঁকড়ে ধরে ধারতি কিতাডুংরির দিক চেয়ে থেকে এক সময়ে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। পাশে মুংনী দাঁড়িয়ে। রাণীর কাছ-ছাড়া এক দণ্ড হয় না সে। কারণ সে জানে তাদের পালাতে হবে। রাজা এসে একবার বললেই ছুটবে তারা বন জংগল পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে। রাস্তাঘাট সব দেখে এসেছে সে সারিমুর্মুর সংগে গিয়ে। রাণীকে সেই পথ দিয়ে নিয়ে যেতে হবে। নিয়ে যাবার ভার তার ওপর—সম্পূর্ণ তার ওপর। কোন সর্দার বা চোয়াড় যাবে না সংগে। মনে মনে গর্ব অনুভব করে মুংনী। সেই সংগে এক দুঃসহ ব্যথা তার বুকের মধ্যে বাসা বাঁধে। রাজাকে ছাড়তে হবে। প্রথম অনুভব করে মুংনী, রাজাকে দেখে তার বড় আনন্দ হত।

ধারতিকে দেখে মুংনী অস্বস্তি অনুভব করে। সময় যত এগিয়ে আসছে ততই যেন রাণী কেমন হয়ে যাচ্ছে। যাবার জন্যে পা বাড়িয়েই আছে, অথচ মনটা যেন বেশী করে বাঁধা পড়েছে এখানে। মুংনী জানেনা যে এ যুদ্ধে ত্রিভনকে মরতেই হবে, তার ধারণা তারা সারিগ্রামে যাবার কিছুদিন পরে রাজাও গিয়ে মিলবেন তাদের সংগে।

ধারতি চেয়ে থাকে।

কিতাপাটের ঠাঁই। মন্দিরটা চোখে না পড়লেও মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। কয়েক বছর আগের সেই বিচারের দিন অসংখ্য নরনারীর মধ্যে সেও সেদিন ছিল সামান্য এক কিশোরী। কারও নজরে পড়েনি সে। রাজার প্রথম বিচার দেখে সবাই যখন আনন্দে মেতে উঠেছিল, তার ছোট্ট বুকখানাও খুশীতে ভরে উঠেছিল সে সময়। কিন্তু তার পরই এক সহ্যাতিরিক্ত বিষাদে আচ্ছন্ন হয়েছিল সে। তার বাঁশীওলা রাজা—একথা ভাবতে চোখদুটো ভরে উঠেছিল জলে। বাঁশীওলা যেমন আপন হতে পারে রাজা তো তা পারেনা। রাজারা ক-ত দূরে —তাদের শুধু দেখা যায়, ছোঁয়া যায় না। সেদিন বাড়ী ফেরার পথে ঝাপসা দৃষ্টি নিয়ে হোঁচট খেতে হয়েছিল কতবার। কতবার শুকোলের দিদির গালাগালি বর্ষিত হয়েছিল তার ওপর।

তারপর।

দ্রুত পরিবর্তন ঘটল জীবনে। লিপুর থেকে ধারতি। ধারতি থেকে রাণী। বাঁশীওলার বাঁশীর সুর শুনতে পেল রাজার কথায়। সে সুরের ঝংকার শয়নে স্বপনে জাগরণে। এমনি সময়ে আর একবার গিয়েছিল কিতাডুংরিতে। নতুন রাজার অধীনে সতেরখানির বীরত্ব সুপুর, ধলভূম আর বরাহভূমকে দেখাবার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছিল প্রতিটি অধিবাসী। সেই উৎসবে যে ছন্দপতন ঘটেনি তা নয়। বাঘরায়ের দীর্ঘশ্বাস সবার মনে বিষাদের ছোঁয়াচ লাগিয়েছিল। তবু তারই মধ্যে রান্‌কো সর্দার ফিরে পেয়েছিল হারানো সোনার কাঠি। পেয়ে পাগল হয়েছিল।

এছাড়া শ্রাবণের উৎসবে প্রতিবারই সে গিয়েছে কিতাডুংরিতে—ত্রিভনের পাশে পাশে। আবার হয়ত যাবে সে কোন এক সুদূর ভবিষ্যতে। কিন্তু তখন ত্রিভন থাকবে না। শুধু ত্রিভন কেন, আজ যারা সতেরখানির গর্ব, তারা কেউ-ই থাকবে না সেদিন। থাকবে এই লালসিং। বড় হবে সে। মস্ত বড়—দেহে, মনে নামে। যে অনুপ্রেরণায় উত্তরাধিকারী হবার সৌভাগ্য হল তার, সে অনুপ্রেরণা অনেক উঁচুতে তুলবে তাকে। নিশ্চয়ই তুলবে। সেই সংগে সতেরখানি উঠবে—তার রোগ শোক আর ক্ষিদে নিয়েও কাঁপিয়ে দেবে বরাহভূমরাজ বিবেকনারায়ণ কিংবা তাঁর বংশধরকে।

—পারবি তো লাল? ধারতি শিশু লালসিং-এর মাথাটা নিজের কাঁধের ওপর চেপে ধরে।

মুংনী চঞ্চল হয়ে ওঠে। রাণীর রকম-সকম তার ভাল লাগে না।

ধারতি লালসিংকে কোল থেকে নামিয়ে তার দুহাত ধরে মুখের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চায়। মুখের প্রতিটি রেখা কঠোর হয়ে ওঠে।

—তোকে পারতেই হবে লাল। নইলে আমি কথা দিয়েছি তোর বাবাকে—বিষ দেব। বিষ মিশিয়ে দেব তোর খাবারে। দুধের মধ্যে মহুয়ার ফুল সেদ্ধ করে যে ক্ষীর তৈরী হবে সে ক্ষীর খেয়ে লুটিয়ে পড়বি তুই।

—রাণী। চিৎকার করে ওঠে মুংনী। ভয়ে কাঁপে সে।

—কে? মুংনী? কি হয়েছে তোর?

—কি বলছেন রাণী?

—ঠিক বলছি। তোকেও বলে রাখি মুংনী। মন দিয়ে শোন্। লাল

বড় হবার আগেই যদি মরি আমি, তুই মানুষ করবি ওকে। ওর বাবাকে দেখছিস্? ঠিক অমনি ভাবে। যদি মানুষ না হয়—বিষ দিবি।

—রাণী!

—ভয় পাচ্ছিস্? সতেরখানির মেয়ে হয়ে ভয় পাস্?

—না। কিছুতেই ভয় পাই না। কিন্তু লালের মুখের দিকে চেয়ে দেখুন তো একবার। কী সুন্দর। মুৎনী কেঁদে ফেলে।

—ফুলের মধ্যে পোকা থাকে মুৎনী। দেখিস্ নি কখনো?

—দেখেছি রাণী। কিন্তু লালকে অমন ভাবতে পারেন? মুৎনী কখনো এভাবে কথা বলে না। সে কথাই বলে না কোনদিন। শুধু হুকুম তালিম করাই তার কাজ। ধারতি আজ প্রথম দেখল মুৎনী ঠিক বালিকা নয়। সবার অলক্ষ্যে এরই মধ্যে কৈশোরের সীমা অতিক্রম করেছে। মুখ তার বুদ্ধিদীপ্ত। মনে মনে খুশী হয় ধারতি। ভাবে, সারিগ্রামে গেলে মুৎনীই হবে তার একমাত্র সান্ত্বনা—তার বন্ধু, তার সাথী।

—লালসিংকে অমন ভাবি না মুৎনী। কিন্তু সবচেয়ে যা খারাপ হতে পারে তার জন্যেও মনে মনে প্রস্তুত থাকতে হয়।

—কিন্তু এত ভাবছেন কেন রাণী। রাজা নিজেই তাঁর ছেলেকে মনের মত গড়ে নেবেন।

ধারতি বুঝতে পারে বুদ্ধিমতী হয়েও আসল জিনিষটিই ধারণা করতে পারেনি মুৎনী। রাজার সংগে তার অনেক আলোচনাই মুৎনীর কানে যায় হয়ত। কিন্তু এই বিষয়ে আলোচনা কোনদিন সে শোনেনি।

ধীরে ধীরে বলে ধারতি—রাজা আর ফিরবেন না।

—কেন? ধারতি স্পষ্ট দেখতে পায় মুৎনীর মুখ একেবারে রক্তশূন্য।

—ফিরতে নেই তাঁকে!

—উনি যে বলে গেলেন আবার আসবেন।

—আসবে। এখানে আসবে। কিন্তু সারিগ্রামে যাবে না কোনদিনও। সেখানে লাল থাকবে, তুই থাকবি, আর আমি—

মুৎনী ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে রাণীর দিকে চেয়ে থাকে। মস্তিষ্ক যেন তার কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে সহসা।

বাটালুকায় সূর্য ডোবে। সন্ধ্যা ঘনায়। শেষে রাত হয় এমন অন্ধকার

রাত বুঝি কখনো নামেনি সতেরখানির বুকে। অংগের সমস্তটুকু কালিমা ঢেলে দিয়ে রিক্ত হতে চাইছে রাত্রিদেবী।

স্তব্ধ কিতাগড়। সে স্তব্ধতার সাক্ষী আরও অসংখ্য ঘটনার সাক্ষ্যবহনকারী কিতাডুংরি পাহাড়। সাক্ষী শাল-মহুয়ার বন—আকাওনা, ছুধিলোটার অসংখ্য ঝোপ।

মাঝে মাঝে শুকনো শালের পাতায় সারিমুর্মুর চোয়াড়দলের সজাগ প্রহরীর পা পড়ে খস্‌খস্ আওয়াজ উঠছে। সে আওয়াজে প্রহরী নিজে চমকায়।

শিয়াল ডাকে না আজ। ফেউএর ডাকও শোনা যায় না। সজারু, ছুঁচো আর সরীসৃপরাও বুঝি বিবর থেকে বার হয় নি।

এক অখণ্ড বিভীষিকা বিরাজ করছে। প্রতিটি নরনারীর বুক জোনাকীর আলোর মত দপ্‌দপ্ করছে—এক এগিয়ে আসা বিপদের আশংকায়।

ধারতি তখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে জানালার ধারে। মুৎনী ছায়ার মত তার পাশে। লালসিংকে একটু আগে রাণীর কোল থেকে নিয়ে মেঝের ওপর শুইয়ে দিয়েছে মুৎনী। সে ঘুমোচ্ছে। ভুঁইয়া বংশের অবশিষ্ট ও-ই থাকবে হয়ত। কিংবা নাও থাকতে পারে। যেমন থাকবে না হয়ত কিতাগড়। বহু বছর পরে লোকে যখন শ্রাবণের বারিধারার মধ্যে এপথ দিয়ে এগিয়ে যাবে কিতাপাটের ঠাঁইএর দিকে তখন এর ধ্বংসস্তূপ তাদের মনে এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি জাগাবে মাত্র। ইতিহাস জানবে যারা—তারা শুধু কিতাগড়ের শ্রেষ্ঠ রাজা ত্রিভনের বিক্রমের কথা ভেবে শ্রদ্ধায় মাথা নত করবে।

আর যদি লালসিং বেঁচে থাকে—সাহস, বিক্রম আর আত্মসম্মানে সে যদি সার্থক হয়ে ওঠে, তবে হয়ত কিতাগড়ের ধ্বংসস্তূপ দেখার দুর্ভাগ্য হবে না কারও। পরিবর্তে তারা দেখবে বরাহভূমরাজের প্রাসাদের চেয়েও বিশালতর এক প্রাসাদ। আর সেই প্রাসাদের আশেপাশে সতেরখানির অসংখ্য সুখী প্রজাদের আনাগোনা—খালি-পেটে দিন কাটানোর ক্লিষ্টতায় বিন্দুমাত্র ছাপ যাদের মুখে নেই।

—রাণী? রাজা—মুৎনী এক অপূর্ব দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ত্রিভনের দিকে।

—কই? ধারতির সমস্ত তন্ময়তা মুহূর্তে চূর্ণবিচূর্ণ হয়।

ত্রিভন এগিয়ে আসে তড়িৎপদে।

—এখনি যাও লিপুর। লাল কই? ঘুমোচ্ছে? তুলে নাও। সময় নেই।

মুৎনী কোলে তুলে নেয় লালকে। কেঁদে ওঠে শিশু।

—আর দেখা হবে না ? ধারতির চোখের কোলে দুফোঁটা অশ্রু টল্‌টল্‌ করে।

—না লিপুর।

মুৎনীর কোল থেকে ঘুমন্ত শিশুকে নিয়ে আদর করে আবার ফিরিয়ে দেয় ত্রিভন। মুৎনীর সামনেই রাণীর চিবুক তুলে ধরে বলে—আমার লিপুর। জানি তোমার মনের অবস্থা কি। আমারটাও তুমি বুঝছ। কিন্তু সবার ওপরে সতেরখানির সম্মান। সময় নষ্ট করতে পারিনা। লালসিং যেন আমার সাধ পূর্ণ করে। যদি দেখ, ওর চেয়েও যোগ্য কেউ দেখা দিয়েছে সতেরখানির মাটিতে—তবে তাকেই এনে রাজা করো। বংশের দোহাই দিয়ে রাজা হয় বরাহভূম, অম্বিকানগর, সুপুর আর ধলভূম রাজ্যে—যারা কথায় কথায় আমাদের বিদ্রূপ করে। এখানে তা চলতে দিওনা। এই আমার শেষ দাবী।

মূর্ছিত হলনা ধারতি। বাটালুকার মেয়ে সে। ত্রিভনের কাছে শিক্ষা পাওয়া মেয়ে। মুৎনীর কোল থেকে লালসিংকে নিয়ে ত্রিভনের চোখের দিকে সোজা দৃষ্টিতে চেয়ে বলে,—তোমার দাবী জীবন দিয়ে রাখতে চেষ্টা করব বাঁশীওলা।

রাতের অন্ধকারে কিতাগড়ের বাইরে আসে তারা। চোয়াড়বাহিনীর মধ্যে একটা ত্রস্তভাব লক্ষ্য করে ধারতি।

—ওরা এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে কেন রাজা ?

—ওই দেখ। আঙুল দিয়ে দেখায় ত্রিভন।

দেখতে পায় ধারতি বহুদূরে শালবনের ফাঁকে ফাঁকে অসংখ্য মশালের আলো। এগিয়ে আসছে সে আলো। রান্‌কোর দল পরাস্ত হয়েছে শেষপর্যন্ত।

—রাজা।

—কে ?

সারিমুর্মুর আবির্ভাব ঘটে অন্ধকারের ভেতর থেকে।

—কি সর্দার ?

—ওই যে আলো দেখছেন, ওর অনেক কয়টাই এসে পৌছতে পারবে না। আর একটু দাঁড়ালে দেখবেন একটার পর একটা মশাল কেমন মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। চমৎকার দেখতে লাগবে।

—তবু আসবে ওরা।

—হ্যাঁ আসবে। আসবেই। আমাদের লোক নেই।

—রাজা! মুৎনীর কণ্ঠস্বর। বিস্মিত হয় ত্রিভন। জীবনে এই প্রথম মুৎনী তাকে নিজে থেকে সম্বোধন করল।

—বল মুৎনী।

—আমাকে কোন আদেশ করলেন না।

—রাণীর আদেশই আমার আদেশ। রাণীর কথা মেনে চলো।

—রাজা, এতদিন যে বোবার মত মুখ বুঁজে কাজ করে এসেছি সে কি শুধু রাণীর দিকে চেয়ে?

—তবে?

—পৃথিবীতে অন্য পুরুষকে তো চিনিনা—চিনতেও চাই না।

—মুৎনী? চিৎকার করে ওঠে ধারতি।

—যত পারেন আমাকে ভৎর্সনা করবেন রাণী। দিন তো পড়েই রয়েছে। ইচ্ছে হলে আমাকে হত্যা করবেন—ভালুকের সামনে ফেলে দেবেন। সহ্য করব। কিন্তু রাজাকে যে আজ বলতেই হবে। তিনি তো ফিরবেন না।

—মুৎনী, তুই বড় হয়েছিস! সারিমুর্র কথায় বিস্ময়।

—বয়সের চেয়ে ও অনেক বড়। ধারতির স্বর বিষণ্ন।

ত্রিভন গম্ভীর হয়ে বলে—শোন মুৎনী, তুমি যা দিয়েছ, তার বদলে তো আমি কিছু দিতে পারি না। দেবার নেই কিছু। তবে যেটুকু সময় আর অবশিষ্ট আছে আমার জীবনে এর মধ্যে ধারতি আর লালের সংগে সংগে তোমাকেও মনে রাখব।

মুৎনী কেঁদে ওঠে। কিতাগড়ের স্বাভাবিক অবস্থা থাকলে জীবনেও যা বলতে সাহস পেত না, এই সংকট মুহূর্তে তা বলে ফেলে পরিবর্তে যা পেল তাও অভাবনীয়। সহ্য করতে পারে না সে।

—চলি ধারতি। কেঁদোনা মুৎনী।

সারিমুর্কে নিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যায় ত্রিভন শেষবারের মত।

যুদ্ধের সাজে সাজিয়ে দেবার সময় পাওয়া গেল না। ভালভাবে একটু কথাও বলা গেল না। থ' হয়ে একটু দাঁড়িয়ে থাকে ধারতি। চোখ দুটো মুছে ফেলে। শেষে মুৎনীর পিঠে আলগোছে হাত রেখে বলে—চল্ মুৎনী।

দু'দিন দু'রাত বনজংগলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলে ওরা। সোজা পথে

যাবার উপায় নেই, ধরা পড়ার সম্ভাবনা। নইলে সারিগ্রামে পৌঁছতে এতটা দেরি লাগে না।

অসংখ্য সিকৃড়িঁর কামড়ে গা ফুলে উঠেছে ওদের। লালসিং প্রথম দিন খুব কেঁদেছিল। তারপর থেকে আর কাঁদছে না। কেমন যেন নেতিয়ে পড়েছে। মুৎনী সংগে করে যে খাবার এনেছিল তার জন্যে সেটা ফুরিয়েছে। আজ সারিগ্রামে না পৌঁছতে পারলে তাদের সংগে শিশুকেও অনাহারে থাকতে হবে।

একটা ফাঁকা জায়গায় এসে হাজির হয় তারা। চারদিকে ঝোপ। সহসা কারও দৃষ্টিতে পড়ার সম্ভাবনা নেই। ঘাসের ওপর লালসিংকে সন্তর্পণে শুইয়ে দেয় মুৎনী।

—রাণী।

—বল্ মুৎনী।

—এতক্ষণে বোধহয় সব শেষ হয়ে গিয়েছে। মুৎনীর চোখের পাতা ভিজে ওঠে।

—হ্যাঁ। কেউ নেই আর আমাদের। ধারতির চোখ শুকনো। কিসের এক কঠোর প্রতিজ্ঞায় জ্বল্জ্বল্ করে।

—রাণী।

—বল্ মুৎনী।

—যদি শত্রুরা হেরে যায়।

—তাহলে রাজাকে তোর হাতে তুলে দেব আমি।

কেঁপে ওঠে মুৎনী। রাণীর মুখে এমন কথা সে কল্পনাও করেনি। অবশ শরীর নিয়ে স্থির হয়ে বসে থাকে কিছুক্ষণ। শেষে বুঝতে পারে রাণীর মনোভাব। রাণীর প্রতি শ্রদ্ধায় তার মন কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। রাজার জীবন যে তার কাছে কতখানি সে উপলব্ধি করে।

মুৎনী বলে—ভুল বুঝবেন না রাণী। রাজা এলে আমিই চলে যাব।

মুৎনীর ছোট্ট মাথাকে বুকের কাছে টেনে আনে ধারতি। দু'চোখের জল ফোঁটা ফোঁটা করে ঝরে পড়ে তার মাথায়।

সেই সময় একটু দূরে এক ঝোপের আড়ালে একজনের কান্না শুনতে পায় তারা। গুমড়ে কেঁদে চলেছে কোন স্ত্রীলোক।

মুৎনী উঠে যায়। উঁকি দিয়ে দেখে উত্তেজিত হয়ে চাপা গলায় বলে—ঝাঁপনী কাঁদছে রাণী।

—সে কি! এখানে?

—বোধ হয় পালিয়ে এসেছে। ডাকবো ?

—আর কেউ নেই ? ছেলেপেলে ?

—না।

—ডাক্ তবে।

মুংনী আড়ালে চলে যায়।

কিতাডুংরি পাহাড়ের সেই উৎসবের দৃশ্য ধারতির চোখের সামনে ভেসে ওঠে ! রান্‌কো ধলভূম আক্রমণ করার আগে তাকে পেয়ে পাগল হয়ে উঠেছিল এই ঝাঁপনী। কিতাডুংরির নায়ক রান্‌কো। রাজার প্রথম বিচারের বলিও সে। সেদিন বালিকা লিপুর ছিল রাজার পক্ষে। তাই রান্‌কোর প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতিও জাগেনি। আজ এতদিন বাদে সার কথা বুঝেছে ধারতি। ভুল ভেঙেছে তার। তাই মুংনী রাজাকে ভালবেসেছে জেনেও সে তার প্রতি অসন্তুষ্ট হতে পারে নি। ভালবাসার দোষ কোথায় ? মুংনীর হাতই বা কতটুকু এতে। ভালবাসার কাছে সবাই অসহায়। অন্তর থেকে তাই মুংনীর অসহায়তাকে আশ্রয় দিতে ইচ্ছে করছে তার।

লালসিংকে খাঁটি বিচার করা শিখিয়ে দিতে হবে। মনে মনে ইচ্ছে থাকলেও ত্রিভন যা বাইরে দেখাতে পারে নি—লালসিং তাই দেখাবে।

ধারতি দেখে মুংনীকে পেছনে ফেলে পাগলের মত ছুটে আসছে ঝাঁপনী। কিছু বলার অবসর দেবার আগেই সে আছড়ে পড়ে রাণীর পায়ের ওপর। স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে ধারতি। কে কাকে সান্ত্বনা দেবে ? অমন যে কেঁপে কেঁপে উঠছে ঝাঁপনীর শরীর, তাও আপনিই শান্ত হবে একটু পরে। মনও সান্ত্বনা খুঁজে নেবার চেষ্টা করবে কালক্রমে। যদি তা না পারে তবে এক কঠিন সহিষ্ণুতার আবরণে শেষদিন পর্যন্ত ঢেকে রাখবে অশান্ত মনকে।

লালসিং একটু কেঁদে ওঠে ঘুমের ঘোরে। মুংনী তার গায়ে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দেয়। একভাবে মুখের দিকে চেয়ে থাকে অতটুকু শিশুর। ধারতি বুঝতে পারে অত মনোযোগ দিয়ে কি দেখছে মুংনী। এতদিন দেখবার প্রয়োজন হয় নি—এখন ওই দেখেই বাঁচতে হবে তাকে। যদি তার কচিমনের প্রথম ক্ষত ভরাট না হয়ে ওঠে—তবে লালসিংএর মধ্যে ত্রিভনের সাদৃশ্য মিলিয়ে মিলিয়ে দেখবে চিরটা কাল।

—সব শেষ হয়ে গেল রাণী। আচমকা আর্তনাদ করে ওঠে ঝাঁপনী। লালসিং পর্যন্ত জেগে ওঠে সে আর্তনাদে।

ধারতি ঠোঁট চেপে ধরে দাঁত দিয়ে। সে বুঝতে পারে এরপর কি বলবে ঝাঁপনি। তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করে,—তোমার ছেলেপেলে কোথায় ঝাঁপনি?

—জানিনা। বাপের সংগে পালিয়েছে তারা। ভীতুর ঝাড় সব।

—তুমি যাওনি?

—না। যেতে বলেছিল বিধুয়া হেঁড়েল। ঝাঁটা তুলেছিলাম মুখের সামনে। ভয় পেয়ে আমাকে ফেলেই পালালো। ঝাপনীর নাক-মুখ এত দুঃখেও ঘৃণায় কুঁচকে ওঠে।

—এদিকে কোথায় যাচ্ছো তুমি?

—সারিগ্রামে। সর্দার বলল, আপনারাও যাবেন ওখানে। সারিগ্রাম থেকেই সে একদিন আদর করে নিয়ে গিয়েছিল নিজের বাড়ীতে। তাই এখানেই ফিরে আসতে বলেছে।

সারিগ্রাম আর কতদূরে?

—ওই তো দেখা যাচ্ছে।

কিছুদূরে পাতায় ছাওয়া এক কুঁড়েঘর থেকে কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া ওপর দিকে উঠছে। আঙুল দিয়ে সেদিকে দেখায় ঝাপনী।

—ওখানেই তোমার বাড়ী?

—হ্যাঁ রাণী। কিন্তু এখন বাড়ীও নেই—কেউ নেই। কেউ ছিল না বলেই ওর সংগে চলে গিয়েছিলাম। আজ কেউ নেই বলেই আবার ফিরে এসেছি। ওর শেষ আদেশ।

—শেষ আদেশ?

—হ্যাঁ রাণী। পেছন থেকে শত্রু মারতে মারতে বাটালুকাতেই ফিরে এসেছিল ও সীমান্ত থেকে।

—দেখা হয়েছিল?

—হ্যাঁ। ঝাঁপনী কেঁদে ওঠে।

—এখানে কখন এলে?

—একটু আগেই। কিতাগড়ের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে পেতনীর মত অন্ধকারে ঘুরে বেড়িয়েছি ওকে পাবার আশায়।

মুৎনীর মাথা ঘুরতে থাকে। ধারতির শরীর শক্ত হয়ে ওঠে। সব জানে ঝাঁপনী। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনতে হবে তার কাছে। সহ্য করা কঠিন হলেও শুনতে হবে।

—সারিগ্রামে আসতে বলেই কি রান্‌কো সর্দার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল?

—না—না—না। ওই তার শেষ কথা। সতেরখানির মাটিতে, পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়িয়ে সে আর কিছু বলবে না কোনদিনও। কিতাগড়ের নীচে সারিমুর্মুর দেহের পাশে জমে উঠেছিল পঁচিশজন শত্রুর মৃতদেহ। ঠিক তারই পরে দেখতে পেলাম ওকে। বুকে বল্লমের গভীর ক্ষত—আমি শেষ দেখা দেখতে পাব বলেই হয়ত বেঁচেছিল। আমাকে এখানে আসতে বলবে বলেই হয়ত। তারপরই—

হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায় ঝাঁপনী। দৃশ্যটা নিশ্চয় তার চোখের সামনে ভাসতে থাকে। সে পাথরের মত বসে থাকে।

—বল, বল ঝাঁপনী! থামলে কেন? ধারতি অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। মুৎনী ছুটে কাছে এসে ঝাঁপনীকে ধরে পাগলের মত ঝাঁকি দিয়ে বলে—রাজা —রাজা কোথায়?

—তিনি কোথায় পড়ে আছেন জানিনা। অনেক খুঁজেছি আমি। পাইনি। তবে তাঁর কথা শুনেছি প্রতিটি আহত চোয়াড়ের মুখে—আহত শত্রুর মুখেও।

—শত্রুরাও বলল? তুমি সত্যি বলছ ঝাঁপনী? ধারতি উৎসুক হয়ে ওঠে। ব্যথার পরিবর্তে যেন আনন্দ ঝরে পড়ে তার কথায়।

—হ্যাঁ রাণী। বরাহভূমের এক সৈনিক মরার আগে জল চাইল। দেখে কেমন কষ্ট হল। জল এনে মুখে দিতেই সে শুধু বলল,—তোমাদের রাজাকে যদি আমরা পেতাম—

ধারত্তির মনের ভেতরটা তোলপাড় করে। পৃথিবীসুদ্ধ লোককে ডেকে শুনোতে ইচ্ছে করে তার কথা কয়টি।

—রাজাকে পেলেনা? মুৎনী বলে ওঠে।

—না।

—আমি যাব।

—কোথায়? ঝাঁপনীর স্বরে বিস্ময়।

—রাজাকে খুঁজতে।

—পাওয়া যাবে না তাঁকে।

—আমি পাবোই। রাণী, আমি যাই।

—ছিঃ মুৎনী। আমি তো অমন করছি না। ওর দেহখানার ওপর আমার টান কি হঠাৎ কমে গেল?

—রাণী। ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে মুৎনী।

—জানি রে। তবু এখন যাওয়া হবে না তোর। আরও বড় কর্তব্য রয়েছে যে সামনে। সামান্য ভুলের জন্যে সব নষ্ট করবি শেষে। লালকে যদি খুঁজে পায় ওরা ?

মুংনী নিষ্পলকদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

—শোন্ মুংনী। রাজার দেহখানা সতেরখানির সবার কাছেই অতি আদরের। মনে হয় কোন চোয়াড় লুকিয়ে রেখেছে। শত্রুরা চলে গেলে ভালভাবে সৎকারের জন্যে।

লালসিং কাঁদতে সুরু করে। তিনজনকেই উঠে দাঁড়াতে হয়। সারিগ্রামে না পৌছলে লালসিংকে খেতে দেওয়া যাবে না। লালসিং—সারা সতেরখানির ভবিষ্যতের আশা-ভরসা।

রান্‌কো সারিগ্রামে এসে নতুন ঘর তৈরীর ব্যবস্থা করে গিয়েছিল লালসিং-এর জন্যে। সাধারণ কুঁড়েঘর—ধারতি অবাক হয়ে দেখে পারাউমুর্র কুঁড়ে ঘরের সংগে আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে। হয়ত তার কথাই মনে হয়েছিল রান্‌কোর—কারণ সে-ই থাকবে লালসিং-এর সংগে। চেয়ে চেয়ে দেখে ধারতি।

রাত্রির জন্য অপেক্ষা করে সে। আকুল হয়ে তখন সে নিশ্চিন্ত মনে কাঁদতে পারবে। ঠোঁট দুটো যদিও বারবার কেঁপে উঠছে—বুকে জমে রয়েছে অফুরন্ত বাষ্প। তবু অপেক্ষা করতে হবে।

আর একটু। সন্ধ্যে হয়ে এল। আর একটু রাজা। এখনো শেষ হয় নি আজকের কর্তব্য। লাল ঘুমোক্—মুংনী আর ঝাঁপনীকে ঘুমোতে দাও আগে—তারপর।

রাজা—কাঁটারাঙ্গার কালোপাথরের রাজা। মায়াভরা সেই আয়ত চোখদুটোর স্বপ্ন যে স্বপ্নই থেকে গেল শুধু। ধাদ্‌কা, পঞ্চসর্দারী, তিন সওয়া চেয়ে চেয়ে দেখছে আজ বিধ্বস্ত সতেরখানিকে। তাদের মনে আজ কী প্রতিফলিত হচ্ছে কেউ জানে না। হয়ত দুঃখই পাচ্ছে তারা। তারা তো বরাহভূমের লোক নয়, সুপুর ধলভূমেরও নয়। সতেরখানির অধিবাসীদের মত তারাও মহুল, জোনার আর কদুয়া খেয়ে অর্ধেক পেট ভরিয়ে দিনের পর দিন অমানুষিক পরিশ্রম করে চলেছে। তাদের ছেলেমেয়েরাও কথায় কথায় রোগে ভোগে—মারা যায়। সতেরখানির ব্যথা তারা মর্মে মর্মে বুঝবে। মুখে কিছু না বললেও মন থেকে তারা সবটুকু সহানুভূতি ঢেলে দেবে কিজাগড়ের ওপর।

আর আফশোর করবে এই ভেবে—সম্মানের জন্যে আজ যে বিপর্যয় ঘটল ঠিক তার বিপরীত কিছু ঘটতে পারত, যদি সময়মত পাকখুঁটের চারখুঁট শক্ত-ভাবে হাত মেলাতে পারত।

ধারতি দীর্ঘঃশ্বাস ফেলে।

রাজা—এখনো সময় হয় নি। ঝাঁপনীর চোখে ঘুম নেই। শুয়ে শুয়ে এপাশ ওপাশ করছে সে। তারও বুকে যে একই জ্বালা। সব জ্বালাটুকু তো সহজে যাবে না তার। হতভাগী মুৎনীও রাস্তার দিকে চেয়ে বসে রয়েছে এই ভর সন্ধ্যেবেলায়। সে বিশ্বাস করেনা, তুমি নেই! তার কচি মন হতাশার মধ্যেও আশা দেখতে চায়—কাঁটাঝাড়ার লিপুর যেমন দেখতে চাইত একসময়ে। যদি পার সান্ত্বনা দিও ওকে।

আর যদি পার প্রতি রাত্রে একবার করে অন্ততঃ দেখা দিও তোমার লিপুরকে। শুনিও তাকে তোমার বাঁশের বাঁশী—যেমন শোনাতে শালবনের ছায়ায় বসে—যেমন শুনিয়েছিলে বিয়ের নিস্তব্ধরাতে রাশি রাশি ফুলের মধ্যে বসে। নইলে লালসিংকে দেখেও বুক বাঁধতে পারবে না সে।

সারিগ্রামের এক চোয়াড় ফিরে আসে দুদিন পর। সর্বাংগে তার আঘাতের চিহ্ন। সেই আঘাত নিয়ে সে স্ত্রীর কাঁধে ভর দিয়ে অনেক কষ্টে রাণীর সামনে এসে উপস্থিত হয়।

—তুমি যুদ্ধ করেছ? কিতাগড়ে ছিলে? বলতে পার রাজা কোথায়? একদমে মুৎনী আকুল হয়ে প্রশ্ন ক'রে চেয়ে থাকে আহত চোয়াড়ের মুখের দিকে।

লোকটি মুৎনীর দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টি ফেলে ক্লান্ত শরীরে কোনরকমে হাতখানা উঠিয়ে আকাশের দিকে দেখায়।

—নেই! রাজা নেই?

চোয়াড়টি চুপ করে থাকে।

মূর্ছিত হয়ে পড়ে যায় মুৎনী। ঝাঁপনী ছুটে এসে তার মাথাটা কোলে তুলে নেয়। নিজে মেয়ে হয়ে সে বালিকার অন্তরের গোপন ব্যথার সন্ধান পেয়েছে অতি সহজেই।

চোয়াড়টি ধীরে ধীরে ধারতিকে বলে,—রাণীমা, রাজা মিশে রয়েছেন সতেরখানির আকাশে বাতাসে, পাহাড়ে, মাটিতে আর সুবর্ণরেখার জলে।

—পেয়েছিলে তাঁকে? সন্ধান পেয়েছিলে?

—আমি পাইনি, কিন্তু আর একদল চোয়াড় পেয়েছিল তাঁর দেহ। শত্রুরা